সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

তৃতীয় ভাগ।
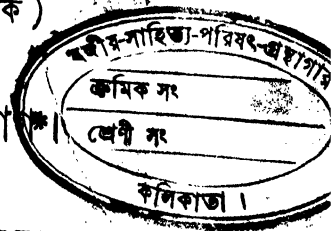
১০৬। ১ নং গ্রে-ষ্ট্রীট।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, বিভাবতী প্রেসে

শ্রীসন্ন্যাসীচরণ বৈরাগী দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ/ ১৩১[illegible]

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

৩য় ভাগ।] [১ম সংখ্যা।
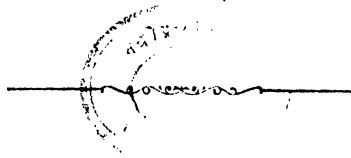
দুর্গাপঞ্চরাত্র।

নবমীসমালোচনা।

হিন্দুজাতির ইতিহাস, পুরাণ, গণিত, বিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন, আয়ুর্ব্বেদপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রই শ্রুতিসুখকর-শব্দ-রচিত পদ্যমালায় অভিব্যক্ত। নীরস বিষয়ও যথাসম্ভব কবিত্বরসে অভিষিক্ত। সেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুই বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালী হইয়াছেন—সেই আর্য্যভাব প্রাচীন বাঙ্গালীর হৃদয়েও পরিস্ফুট ছিল। সুতরাং ছন্দোময়ী কবিতা যে, প্রাচীন বাঙ্গালীর সমধিক প্রিয় হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু বঙ্গের বিলাসময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় পদ্যময়ভাবে পরিপূর্ণ। এখনও সুকুমারমতি, বিদ্যার্থী বালক বোধোদয় সমাপ্ত করিতে না করিতেই কবিতারচনায় অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহা প্রশংসার্হ না হইলেও বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কাব্যানুরাগের পরিচায়ক। এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গে পদ্য সাহিত্যই সকলের নিকট প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইত; এবং প্রাচীন বঙ্গে অনেক পদ্যরচনাকুশল সুকবিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম এ পর্য্যন্ত সাহিত্যজগতে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। অনেক গ্রন্থ এখনও মুদ্রাযন্ত্রের সংস্রবে আইসে নাই। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় জগদ্রামপ্রণীত রামায়ণের সৌন্দর্য্যসমালোচনাত্মক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জগদ্রাম আর একখানি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া, গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার ভার স্বীয় তনয় রামপ্রসাদের উপর অর্পণ করেন। রামপ্রসাদও বাঁকুড়া জেলার একটি উজ্জ্বল রত্ন। অদ্য আমরা ইঁহার রচনারই সমালোচনা করিব। আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম 'দুর্গাপঞ্চরাত্র'। বিধিবর-দৃপ্ত দুরাত্মা রাক্ষসরাজের হস্ত হইতে অশোককানন-বাসিনী সীতার উদ্ধার-কামনায় শ্রীরামচন্দ্র অকালে যে দেবীপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন, তদবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত

হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটি পালা আছে। ষষ্ঠ্যাদি পঞ্চরাত্রিতে যথাক্রমে এই পাঁচটি পালা পঠিত হইত। নবমী ও দশমীর পালা তরুণ কবি রামপ্রসাদকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। সুতরাং নবমী ও দশমী আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা অদ্য নবমীরই গুণ পরীক্ষা করিব। সুধীগণের অগ্নি-পরীক্ষায় ইহার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্ণয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহার ভাষা সুমার্জ্জিত না হইলেও শ্রুতিকঠোর নহে; প্রতি-পত্রে কবির সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সঞ্চারিণী প্রতিভার বিকাশ না থাকিলেও ইহাতে কল্পনাদুর্ভিক্ষ লক্ষিত হইবে না; ইহাতে মানবের মনোভাবনিচয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দৃষ্ট না হইলেও ভাবদৈন্য প্রকাশিত হইবে না; ইহাতে চিন্তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস না থাকিলেও ইহা অন্তঃসারশূন্য শব্দাড়ম্বর নহে; ইহা দ্বারা ভাষার অপর কোন উপকার না হইলেও ইহাতে বঙ্গভাষার প্রাচীন স্তর পরীক্ষা করিবার উপযোগী উপাদান আছে।

রামপ্রসাদ আনন্দোৎফুল্ল অন্তঃকরণে পিতার নিকট গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। গ্রন্থের বিষয়গৌরব ও নিজের সামর্থ্যস্বল্পতা স্মরণ করিয়া, তরুণ কবি মঙ্গলাচরণে যথোচিত দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন—

আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হ'য়ে কৈনু অঙ্গীকার। মূষিক মস্তকে লৈল মন্দারের ভার ॥
বামনবাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরুশিখরে ॥

নবীন কবি জানিতেন—

সুছন্দ সুশব্দভার সরস সাগর। অমৃত অধিক কাব্য অতি মনোহর ॥

এইরূপ কাব্যরচনা সুসাধ্য নহে, তথাপি যে সাহসে তিনি 'চাপলায় প্রণোদিতঃ' হইয়াছিলেন, তাহা—

শিশুর অস্ফুট বাক্য মিষ্ট লাগে সভে। এমত জানিয়ে সভে সন্তোষ হইবে ॥

ইহার পর তিনি পূর্ব্বকবিগণের নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া, বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ করিলেন—

রবিতুল্য কবিগণে অসংখ্য প্রণাম। কৃ[illegible]শ দিয়ে পূর্ণ কর মনস্কাম ॥
অজ্ঞানসাগর মোর অপার পাথার। সভে কৃপারূপ তরি দিয়ে কর পার ॥

বামনের বিধুস্পর্শবাসনা বা পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনে অভিলাষ প্রভৃতি উপমার বহুল ব্যবহার হেতু নূতনত্ব এবং মনোহারিত্ব এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শৈশব সময়ে এই সকল উপমার প্রয়োগ বিরসত্ব-দোষে দুষ্ট হয় নাই। সে সময়ে এই সকল উপমা শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিকর হইত, এইরূপ অনুমান করা যায়। মূষিকের মন্দারভার গ্রহণ উপমাটিতে কবির একটু উদ্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। "হর্ষ হয়ে", "সন্তোষ হইবে" প্রভৃতি ব্যাকরণদুষ্ট পদগুলি "আর্ষপ্রয়োগ" তুল্য বুঝিতে হইবে।

মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থারম্ভ হইল। কপিগণের সমাহৃত কমলকাঞ্চন-কুন্দ, মল্লিকা, মালতী, জাতি প্রভৃতি পুষ্পসম্ভারে শ্রীরামচন্দ্র যথাবিধি পূজারম্ভ করিলেন—

আধার শক্তিরে পূজি অঙ্গন্যাস করি।　　করন্যাস মাতৃকাদি ন্যাস করি হরি॥
ভূতশুদ্ধি বিধিমত করি শুদ্ধ হৈলা।　　প্রাণায়াম প্রভু রাম করিতে লাগিলা॥

এইরূপে যথাক্রমে গণেষাদি পঞ্চ দেবতার ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের পূজা করিয়া, রামচন্দ্র পার্ব্বতীর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলেন—

কূর্ম্ম মুদ্রা করি হরি,　　করেতে কুসুম পুরি,　　নয়ন মুদিয়া ধ্যান ধ্যৈলা।
অন্তরে বাক্যেতে তার,　　তারা নাম একাকার,　　মূর্ত্তি হেরি চিত্ত মগ্ন হৈলা॥
জটাজূট শিরে শোভা,　　মুনির মুকুট প্রভা　　তাহে কিবা মাল্যদাম সাজে।
ভালে ভাল অর্দ্ধ ইন্দু,　　শোভিত সিন্দূর বিন্দু　　অলকা ঝলকে ভুরু মাঝে॥
মুখ পূর্ণশশধরে,　　মদনমানস হরে,　　বিম্বাধরে অমৃত সঞ্চারে।
সুচারু দশন ভাতি,　　যেমতি কুমুতা পাঁতি,　　মৃদুহাসে হর মন হরে॥
অতসী পুষ্পের বর্ণ,　　আভা কিবা জিত স্বর্ণ,　　ত্রিশূলাদি অস্ত্র দশভুজে।
টাড় শঙ্খ কঙ্কণাদি,　　শোভে ভুজে নানাবিধি,　　বনমালা শোভে হৃদিমাঝে॥
কমলকলিকাবর,　　পীনোন্নত পয়োধর,　　কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
জিতরম্ভা তরু উরু,　　নিতম্ব ললিত চারু,　　সুন্দর সংবৃত নীলবাস॥
প্রফুল্লিত রক্ত জবা,　　যুগ্ম পাদপদ্মে প্রভা,　　কনকের নূপুর তাহাতে।
দশ নখ পূর্ণচন্দ্র,　　সংসারের নাশে অন্ধ　　স্থির হয়্যা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গেতে॥

ইত্যাদি।

শ্রীরামচন্দ্র মানসে মহামায়ার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া আবার যথাবিধি অষ্টশক্তি, অষ্টনায়িকা এবং যোগিনী প্রভৃতির পূজা সমাপন পূর্ব্বক দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন—

'প্রণমামি——

শঙ্করঘরণি　　সংসারতারিণি　　ভবভয় হারিণি।
সত্বরজস্তম　　আদি অনুপম　　ত্বমসি গুণত্রয়কারিণী।
জয়তি জয় জয়　　জগত জননী　　জনমমরণনিবারিণী,
তাপিত তনয়ে তার ত্রিলোকতারিণী॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম　　ক্রিয়া আদি মর্ম্ম,　　যতেক ভবসারেতে।
সর্গমার্গ　　সুনিত্য সম্পদ—　　দায়িনী তুমি ভারতে।
নাস্তি অন্ত　　অনন্ত জগতে　　তুমি চরাচরগামিনী,
ভকতের ভবভয় হর ভবভাবিনী॥

গৌর অঙ্গ,　　অনঙ্গ মোহিনী,　　জয়তি গিরিবরনন্দিনী।
গুহ গজা—　　নম জননী দুর্গে　　নিত্য ত্রিভুবনবন্দিনী।
দুরিত দুর্গতে　　দেহ পূর্ণিত,　　দৈবাধীন কত যে দুর্দ্দশা—
পতিতপাবনী নামে কেবল ভরসা॥

চিত্ত ভ্রান্ত কৃতান্ত ভয়েতে, নিতান্ত আশ্বস্ত তব পদে।
সহিত শঙ্কর শঙ্করী যুগ— রূপে বিরাজ উভয় হৃদে।
বেদ অবিদিতে বিভব তব— নিজে ভক্ত প্রেম বিবর্দ্ধিনী—
মোর মনে জাগে রূপ মহিষমর্দ্দিনী ॥

শম্ভু উরূ— পর বাসিনী রিপুনাশিনী জয় জয় শিবে।
দক্ষতনয়ে দেহি অভয়ে মুক্তিদায়িনী তুমি ভবে॥
কায়মন বচ ঐক্য করি তব পায়ে যে জন করে পূজা
দাসের দুর্গতি নাশ কর দশ ভূজা॥

উদ্ধৃত অংশে যদিও পদ্যবন্ধনের তাদৃশ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই, তথাপি উহাতে কবিসুলভ শব্দবিন্যাসচাতুরী দৃষ্ট হইবে। উহা যতিমাত্রায় সুমার্জ্জিত ও সুখোচ্চারণীয় হয় নাই বটে, কিন্তু উহাতে অমার্জ্জিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ আছে।

দামামা দুন্দুভি প্রভৃতি বহু বাদ্যনিনাদে নবমী পূজা সম্পন্ন হইল। শ্রীরামচন্দ্র বানরবৃন্দকে নবমীর রাত্রি আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিতে আদেশ করিলেন। সুহৃদ্বর সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের পাদবন্দনা করিয়া মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার পূজার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মিত্রবর সুগ্রীবের নিকট মহিষাসুরের জন্ম, দেবতাগণের উপর তাহার উপদ্রব, উপদ্রুত দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন ও মানব-শরীর পরিগ্রহ প্রভৃতি পৌরাণিক কথা বিবৃত করিলেন। এই সকল ঘটনার বর্ণনায় তাদৃশ লিপিকুশলতা না থাকিলেও রসাভাব ঘটে নাই। দুই এক স্থলে দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কপিলের সহিত সুর মিশাইয়া কবি গাহিয়াছেন——

প্রকৃতি পুরুষ দুঁহে অচিন্ত্য আকার। দুঁহার সংযোগে জন্মে জগতসংসার॥
প্রধান পুরুষ পিতা প্রকৃতি জননী। জগতের জীব যত সুত বলি মানি॥

দেবগণ মর্ত্ত্যবাসের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, পদ্মযোনির পদপান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন হইলেন। অবশেষে আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তবস্তুতি করিলেন। এদিকে কৈলাসবাসিনী শৈলসুতা চঞ্চলা হইয়া দাসীকে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী দানবনিপীড়িত দেবতার দুর্দ্দশার কথা কহিল। জগজ্জননী দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। আদ্যাশক্তির প্রকাশে দেবমণ্ডলীর মুখমণ্ডলে শক্তির তরলজ্যোতিঃ তরঙ্গায়িত হইল—

যেন পঞ্চ স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলে ভাই। সকলের ধূম উর্দ্ধে হয় এক ঠাঁই॥
তেমনেতে নানাস্থানে তেজ উপজিল। সর্ব্বতেজ একস্থানে একত্র হইল॥
একযোগে হৈল তেজ সুমেরুসমান। কোটি কোটি সূর্য্য যেন হৈল একস্থান॥
জ্যোতিরূপে তেজ যেন অনন্ত পর্ব্বত। অতুলন তেজছটা প্রকাশ মহত॥
গগন ব্যাপত জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল। দশদিক তেজের জ্বালাতে ব্যাপ্ত হৈল॥

সেই জ্যোতি মধ্যে চেয়্যা দেখে দেবগণ।　　আবির্ভূত হৈল নারী এক জন॥
কলেবর কান্তিতে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে।　　রামা জ্যোতির ভিতরে॥
কোটি চন্দ্র নিন্দি মুখ অধর সুন্দর।　　মদনমথন মন মোহে নিরন্তর॥

এই রূপে প্রত্যেক দেবতার শক্তি একত্র হইয়া, এক মহাশক্তির বিকাশ করিল। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের তেজ হইতে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর বাহুরক্ত, বক্ষনাসা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইল। এ কল্পনার চিত্রটি অতীব মনোহর। ইহাতে কবির উদ্ভাবনা যদিও অল্প আছে, তথাপি কবি প্রশংসার্হ। মার্কণ্ডেয় মুনি নিষ্প্রতিবন্ধক জ্ঞানদৃষ্টিতে শক্তিপূজার এই মহত্তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহাই কল্পনার ঐন্দ্রজালিক তুলিতে চিত্রিত করিয়া যে সুন্দর চিত্রপটখানি রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা-ভাষার উত্তরচ্ছদে আবৃত করিয়া, কবি সেই চিত্রপটখানি বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহাতে শক্তিপূজার গূঢ়তত্ত্ব সাধারণের গোচর হইয়াছে। একতাই যে, আপদুদ্ধারের মহামন্ত্র, শক্তির সমবায়ই যে, জাতীয় অধঃপতননিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়, একীভূত শক্তির বিনিয়োগই যে, পরাক্রান্ত শত্রুশাসনের প্রধান অস্ত্র, এই সকল মহতী শিক্ষা, উক্ত কল্পনাপটখানি পাঠকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত করিয়া দিবে। এরূপ কল্পনা, এরূপ চিন্তা, এরূপ উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষার কবিতার অমৃতাক্ষরে সন্নিবেশিত করিয়া, কবি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রে মহাশক্তি সজ্জিতা হইলেন। দেবগণ বহুপ্রকারে স্তবস্তুতি করিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতিকা, দেবগণকে সান্ত্বনা করিয়া, বলিলেন—

ভক্ত খেলে আমি খাই,　ভক্ত গেলে আমি যাই,　ভক্তের শয়নে আমি শুই।
ভক্ত করে যত কর্ম্ম,　সে করিয়া বুঝি মর্ম্ম,　একদেহ বাহিরেতে দুই॥
ভক্ত মোর মাতা পিতা,　ভক্ত মোর সুত ভ্রাতা,　মোর ধন জন বন্ধু দাস।
ভক্ত যদি নাহি থাকে,　মোরে কেও নাই ডাকে,　ত্রিভুবন সকল উদাস॥

মহিষাসুরমথনে দেবী অগ্রসর হইলেন। অট্টহাস্যে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত হইল। দর্পোদ্ধত দানব, পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিল, "সংসার সংক্ষুব্ধ আজ দেখি কি কারণ"। তার পর যে দিক হইতে ভীমার অট্টহাস্যের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চতুরঙ্গদলে মহিষাসুর যাত্রা করিল—

শব্দ অনুসারে সভে সেই দিগে যায়।　　সসৈন্যে মহিষাসুর মহারোষে ধায়॥
কাল জলধর তুল্য গজেন্দ্র গর্জ্জিছে।　　তুরঙ্গ কুরঙ্গ জিনি চঞ্চল ফিরিছে॥
লাল নীল শ্বেত পীত উড়য়ে পতাকা।　　ঘর্ঘর শব্দে ঘন ঘুরে রথ চাকা॥
বীরগণ সঘনে করয়ে সিংহনাদ।　　শুনি শব্দ সভে স্তব্ধ গণিল প্রমাদ॥
ব্যালিস বাজনা নানা বাজে নিরন্তর।　　দামামা ধমকে যেন নব জলধর॥

মহিষাসুরের একদূত—

শঙ্কর প্রিয়ার গিয়ে চরণেতে কয়।　　কে বট কামিনী মোরে দেহ পরিচয়॥

হয়ে নারী অস্ত্র ধরি কি করিয়া ফির। পুরুষ দরশে কিছু লজ্জা নাহি কর ॥
ত্রিজগতে অদ্বিতীয় অসুর রাজন। বিধি বিষ্ণু শিব তার সমতুল নন ॥
তাঁর অরি দেব সভে তব সঙ্গে দেখি। হেন কর্ম্ম কেন কৈলে কহ চন্দ্রমুখি ॥
কিন্তু তোরে দেখি রাজা মনে আছে হর্ষ। তার কাছে চল শুন মোর পরামর্শ ॥
দেবগণ ত্যাজি দূরে চল ভূপস্থানে। যখন যা চাবে তাহা পাবে সেই ক্ষণে ॥
মোর কথা অন্যথা করিয়া নাহি যাবে। জীবন যৌবন তব সব বৃথা যাবে ॥

দৈত্যদূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া "মন্দ হাসে মৃদুভাষে কন কাত্যায়নী"—

দাস চিত্তধামে নিত্য বাস করি আমি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি চরাচরগামী ॥
নারী হয়ে অস্ত্র ধরি শুন তার মর্ম্ম। দাস অরি নাশ করি এই মোর কর্ম্ম ॥
ভক্ত কাজ হেতু লাজ না বহে আমার। বাসনার কথা মোর শুন সারোদ্ধার ॥
মহিষাসুরেকে আজি বিনাশ করিব। মহিষমর্দ্দিনী নাম জগতে ধরিব ॥

অতঃপর সংগ্রাম—ঘোর সাংঘাতিক সংগ্রাম—

অগণন দৈত্যচয় সমুদ্রের প্রায়। তার মাঝে বিরাজিত অসুরের রায় ॥
দৈত্যবর্গ ধরি খড়্গ স্বর্গমার্গে ধায়। চমকে চিক্কন অসি চপলার প্রায় ॥
খেটক পরিঘ জাঠা করে বরষণ। দম্ভে বিশ্ব থরহর কম্পিত সঘন ॥
কলে মেঘজালসম সভার শরীর। শরত মেঘের সম গর্জ্জয়ে গভীর ॥
অতিবড় বহে ঝড় নাকের নিশ্বাসে। পর্ব্বত উড়িয়া গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥
শ্রাবণে সঘনে যেন বর্ষে জলধর। তেনমত মারে অস্ত্র দৈত্যধুরন্ধর ॥
বজ্রাঘাত ন্যায় সে ত্রিশূল পাত করে। এক কালে সভে মিলে ঘেরিল মায়েরে ॥
জলস্থল গগনমণ্ডল একাকার। নবমেঘে যেন ধরা কৈল অন্ধকার ॥
পূর্ণ চন্দ্রে মেঘ বৃন্দে আচ্ছাদয়ে যেন। অভয়ায় অসুরে বেষ্টিত কৈল তেন ॥

সংগ্রামবর্ণনায়, কবি ভয়ানক রসের অবতারণা করিয়াছেন; তাহাও মন্দ হয় নাই। অসুরমণ্ডলী কর্ত্তৃক আক্রান্তা কাত্যায়নী যখন কোপাবিষ্টা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তখন শতসহস্র যোগিনী সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিকট রণতাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিল; সেই সময়—

কারো করকায়ে কণ্ঠচ্ছেদ কৈল। মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো মধ্য বিদারিল ॥
দৈত্যঅঙ্গ ছিন্ন জংঘা রণাঙ্গনে পড়ে। অরিকুল আকুল বিকলে ভূমে গড়ে ॥
একচক্ষু ক্ষত কার ছিন্ন এক পদ। রক্তের অদ্ভুত যেন হৈল মহাহ্রদ ॥
অস্থিমাংস রাশি রাশি পর্ব্বত আকার। রক্তমহাহ্রদ লক্ষ যোজন বিস্তার ॥

এইরূপে যোগিনীপরিবৃতা, রণরঙ্গিণী অভয়া দৈত্যসৈন্যসংহারে প্রমত্তা। মহিষাসুর আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; ভীষণ মহিষমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল—

মহাকোপ করি মহিষাসুরে। শঙ্করী সম্মুখে আসে সমরে ॥
দানব শরীর গোপন কৈল। মহাঘোরতর মহিষ হৈল ॥
সুমেরু শিখর সদৃশ মুণ্ড। গিরিগুহা সম নাসা প্রচণ্ড ॥
তালতরু সম রোম সকল। শরীরে ব্যাপত নভোমণ্ডল ॥

ধরা থরহরা চরণভরে। মহী খণ্ড খণ্ড চরণক্ষুরে॥
ইস সম তার দশন পাতি। আরক্ত লোচন ঘূর্ণিত অতি॥
মেঘখণ্ডে শৃঙ্গেতে করি। খণ্ড খণ্ড করে নভ উপরি॥
নিশ্বাসপবনে পর্ব্বত বেগে। উড়ি উড়ি গিয়া অম্বরে লাগে॥
ঘোর নাদ করি সম্মুখে ধায়। দেখি দেবগণ তরাস পায়॥
মুণ্ডাঘাতে কার মুণ্ড ভাঙ্গিল ক্ষুরে খণ্ড খণ্ড কাহারে কৈল॥
লাঙ্গুল বাড়ীতে তাড়িছে সভে। রণমদে মত্ত হইল যবে॥
বেগেতে যেতে অঙ্গের বায়। কত জন যমসদনে যায়॥
গমনে ভ্রমণে অরি মারিছে। কেহ নাসাশ্বাসে ভূমে পড়িছে॥

* * * * * *

দ্রুতগতি দেবী নিকটে আসি। সিংহ বধিবারে যাইছে রোষি॥
ঘন ঘন করে সে ঘোর নাদ। সকল সংসার গণে প্রমাদ॥
উপাড়ে শিখর শৃঙ্গেতে করি। গিরিজা উপরে মারয়ে গিরি॥
উচ্চ পুচ্ছ করি সঘনে নাচে। চরণরেণুতে সূর্য্য ঢাকিছে॥
ধূলাতে ধূসর হইল অঙ্গ। দেখি দেবগণ দিলেন ভঙ্গ॥
শরতমেঘের গর্জ্জন যেন। ঘন ঘোর শব্দ করয়ে তেন॥
লাঙ্গুলতাড়ন সাদা করয়। শতসিন্ধুজল একত্র হয়॥
হেন মতে কত অরি নাশিয়া। সমর মাঝে ফিরে মাতিয়া॥

এই বর্ণনাটি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। ইহার ছন্দঃ সুমার্জ্জিত এবং বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী। ইহাতে রৌদ্ররসের বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। উপমাগুলিও ব্যবহারজীর্ণ নহে।

আমরা এ স্থলে আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বর্ণনাটি সুমিষ্ট এবং কবিশক্তির সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

অমর কাজে, সমর সাজে, শঙ্করী বিরাজে।
নিরখি সকল, দানবারি দল, হৃদয়বিষাদে ত্যজে॥ ধুয়া॥
বাজত কত শত মৃদঙ্গ, যোগিনীগণ নাচত সঙ্গ, চলিত ললিত গৌর অঙ্গ,
দামিনী জনু দমকে।
কোটী কিঙ্কিণী রণ রণ রণ, করকঙ্কণ ঝন ঝন ঝন, বোলয় আসি ঠন ঠন ঠন,
সঘনে অসি চমকে॥
দুলকর্ণ কুণ্ডল অতি, গলিত গণ্ডমণ্ডল প্রতি, সঘন সহশ্রমজল তথি
কলিত সকল দেহা।
মাদল ঘন ঘোর নাদ, বাদল জনু অতি পরমাদ অরিদল মানত বিষাদ,
জগজন মনমোহা॥
চঞ্চল ঘন পট্টবাস সতত অট্ট অট্ট হাস বিনিপ্রয়াস দাসত্রাস
নাশ করত মগনে।

জলধরবর গভীর হাক গণত জগজন বিপাক দক্ষে লক্ষে ধরা বিকম্পাক
হানত রিপু সঘনে ॥
উর বিশাল উপরিভাল লোলমান মালজাল, অতি রসাল দেওত তাল ;
কামিনী করকমলে।
রুণু রুণু রুণু রুণুর রুণুর, ঝুণু ঝুণু ঝুণু ঝুণুর ঝুণুর স্বর্ণ নূপুর সুমধুর স্বর,
বাজত পদ বিমলে ॥
ইত্যাদি।

শ্রীবলীন্দ্র সিংহ দেব।

শব্দ-রহস্য।

(শব্দ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
ও
ভাষার প্রাধান্য)।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, গ্রন্থ অপ্রমেয় জ্ঞানভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত বহুতর জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত আছে, এবং প্রধানতঃ এই ভাণ্ডার হইতেই তৎসমুদয় পুরুষপরম্পরায় লোকের হস্তগত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সমগ্র পুস্তক ব্যতীত জ্ঞানের আরও এক অতি গভীর আকর আছে; সে আকর শব্দ। পৃথক্‌ভাবে এক একটি শব্দেও নানারূপ জ্ঞানরত্ন নিহিত আছে। চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিলে তৎসমুদয় হস্তগত করিতে পারা যায়। সাধারণ শব্দসমূহে মানবহৃদয়ের সরস ভাব-লহরী এবং সংসারের সূক্ষ্ম ঘটনাপরম্পরা অতি বিচিত্ররূপে সম্বদ্ধ আছে; এবং এইরূপে শব্দগ্রথিত হইয়া উহা কালস্রোতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। সময়ের সংহারিণী শক্তি গ্রন্থাদির লোপ করিতে ও মনুষ্যের কল্পিত ভাবসমূহকে বিকৃত করিতে পারে, কিন্তু শব্দনিহিত জ্ঞানরহস্যের সেরূপ বিকার বা বিনাশের সম্ভাবনা নাই। উহারা শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ আছে যে, শব্দের উচ্ছেদ না হইলে উহাদিগের উচ্ছেদ কদাচ সম্ভবপর নহে। অনেক সময়ে, গ্রন্থাদিতে যাহার কোন উল্লেখ নাই, জনশ্রুতি বা প্রবাদবাক্যে যাহার কোন আভাস নাই, এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব কেবল শব্দ হইতে শিক্ষা করিতে পারা যায়। অনেক সময়ে, যাহাতে জাতীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের লেখনীনিঃসৃত প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, জাতীয় ভাষা তাহাতে বিশ্বস্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া শব্দ শিক্ষা করিলে অনেক বিষয়ের প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। শব্দনিহিত সেই সকল জ্ঞানের কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাখ্যা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্থলে কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

ভাষা কবিত্বের পরিচায়ক। অনেক শব্দে মনুষ্যহৃদয়ের সাধারণ ও প্রয়োজনীয় ভাব সকল বিশদরূপে উজ্জ্বল উপমায় গ্রথিত রহিয়াছে। আমরা সচরাচর 'চূড়ান্ত' কথার ব্যবহার করিয়া থাকি; 'এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে,' 'শান্তির চূড়ান্ত হইয়াছে,' এইরূপ প্রয়োগ লোকে প্রায়ই করিয়া থাকে। এই 'চূড়ান্ত' (চূড়া+অন্ত) কথায় কি এক উজ্জ্বল উপমা বর্ত্তমান রহিয়াছে! যেমন কোন গিরিশিখরের বা কোন ঊর্দ্ধস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিল তাহার শেষ সীমা অতিক্রম করা হইল, আরোহণের শেষ হইল, তাহার 'চূড়ান্ত' হইল। তাহার 'চূড়ান্ত' হইয়াছে বলাতে কেমন স্পষ্টরূপে ঐ ভাবটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অনেক শব্দে কবিত্ব বিদ্যমান আছে।

কবিত্বের ন্যায় নীতিও অনেক শব্দে গ্রথিত আছে। আমরা সেই সকল শব্দ হইতে সূক্ষ্ম

বিদ্যাপতি।

(গতবারের পর)

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
দেহ	দাও	কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।	১৩০—৭
দোখ	দোষ	সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি।	১৮০—৬
দোতী (দোতি)	দূতী	দোতী মিলায়ল কামুক সঙ্গ।	৬৭—১০
দোসর	দ্বিতীয়, সঙ্গী	দোসর জন নাহি সঙ্গ।	১৬৬—২
দোসর	সদৃশ	তন্তুক দোসর দেহা।	১৯৮—৪
দোহাই	দিব্য	শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।	৩৮—১
দোহাইব †	দোহণ করিব	সখা সঞে দোহি দোহাইব।	২০৮ নং ৫
দোহি †	দুগ্ধ (?)	" " "	"
দ্বন্দ্ব	যুগ্ম	জলধর বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।	১৪—৪
দ্বন্দ্ব	বিবাদ, সন্দেহ	পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব।	৯৪—১৪
ধনি	ধন্যে	এ ধনি কর অবধান।	৫১—৩
ধনি	ধন্য	ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।	৪৭—৭
ধন্দ	ধাঁদা, সন্দেহ	মঝু মনে লাগল ধন্দা।	৪৮—৪
ধন্দ	বিস্ময়কর ব্যাপার	নিকুঞ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।	১৪৭—২
ধন্দ	বিস্মিত	নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।	১৩৬—১
ধম্মিল্ল (ধামিল্লী)	বেণী	ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।	[illegible]—৭
ধয়ল	ধরিল	বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে।	[illegible]—৬
ধর	ধরে, গণ্য করে	হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা।	১৯১—৬
ধরই	ধরিতে	ধরই না পারই কেহ।	৫১—১০
ধরইতে	ধরিতে	করে ধরইতে কত করু না কোটি।	৬০—৪
ধরব	ধরিবে, ধরিব	ঐছন কবচ ধরব যব হাত।	১৫১—১১
ধরবে	ধরিবে	আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।	২০৬—১৫
ধরল (ধয়ল)*	ধরিল	কুন্দ বল্লী তরু ধরল নিশান।	৪১ নং ১৩
ধরসি	ধরিতেছ	সে ফুলে ধরসি বাণ।	১০৬—১৩
ধরু	ধরে	কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ।	৯৫—৮
ধরম †	ধর্ম্ম	ধরম কর সাথী।	৭৯ নং ৮
ধসধস	ধড়ফড় (?)	চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।	১২৬—১৫
ধাই	ধাইয়া	আইতে পড়লহুঁ ধাই।	১৫৬—২

সেই জ্যোতি মধ্যে চেয়া দেখে দেবগণ। তাহে আবির্ভূত হৈল নারী এক জন॥
কলেবর কান্তিতে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে। নবীনযৌবনা রামা জ্যোতির ভিতরে॥
কোটি চন্দ্র নিন্দি মুখ অধর সুন্দর। মদনমথন মন মোহে নিরন্তর॥

এই রূপে প্রত্যেক দেবতার শক্তি একত্র হইয়া, এক মহাশক্তির বিকাশ করিল। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের তেজ হইতে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর বাহুরক্ত বক্ষনাসা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইল। এ কল্পনার চিত্রটি অতীব মনোহর। ইহাতে কবির উদ্ভাবনা যদিও অল্প আছে, তথাপি কবি প্রশংসার্হ। মার্কণ্ডেয় মুনি নিষ্প্রতিবন্ধক হৃদয়ে শক্তিপূজার এই মহত্তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহাই কল্পনার ঐন্দ্রজালিক তুলিতে চিত্রিত করিয়া যে সুন্দর চিত্রপটখানি রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা-ভাষার উত্তরচ্ছদে আবৃত করিয়া, কবি সেই চিত্রপটখানি বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহাতে শক্তিপূজার গূঢ়তত্ত্ব সাধারণের গোচর হইয়াছে। একতাই যে, আপদুদ্ধারের মহামন্ত্র, শক্তির সমবায়ই যে, জাতীয় অধঃপতননিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়, একীভূত শক্তির বিনিয়োগই যে, পরাক্রান্ত শত্রুশাসনের প্রধান অস্ত্র, এই সকল মহতী শিক্ষা, উক্ত কল্পনাপটখানি পাঠকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত করিয়া দিবে। এরূপ কল্পনা, এরূপ চিন্তা, এরূপ উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষার কবিতার অমৃতাক্ষরে সন্নিবেশিত করিয়া, কবি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রে মহাশক্তি সজ্জিতা হইলেন। দেবগণ বহুপ্রকারে স্তবস্তুতি করিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতিকা, দেবগণকে সান্ত্বনা করিয়া, বলিলেন—

ভক্ত খেলে আমি খাই, ভক্ত গেলে আমি যাই, ভক্তের শয়নে আমি শুই।
ভক্ত করে যত কর্ম্ম, সে করিয়া বুঝি মর্ম্ম, একদেহ বাহিরেতে দুই॥
ভক্ত মোর মাতা পিতা, ভক্ত মোর সুত ভ্রাতা, মোর ধন জন বন্ধু দাস।
ভক্ত যদি নাহি থাকে, মোরে কেও নাই ডাকে, ত্রিভুবন সকল উদাস॥

মহিষাসুরমথনে দেবী অগ্রসর হইলেন। অট্টহাস্যে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত হইল। দর্পোদ্ধত দানব, পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিল, "সংসার সংক্ষুব্ধ আজ দেখি কি কারণ"। তার পর যে দিক হইতে ভীমার অট্টহাস্যের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চতুরঙ্গদলে মহিষাসুর যাত্রা করিল—

শব্দ অনুসারে সভে সেই দিগে যায়। সসৈন্যে মহিষাসুর মহারোষে ধায়॥
কাল জলধর তুল্য গজেন্দ্র গর্জ্জিছে। তুরঙ্গ কুরঙ্গ জিনি চঞ্চল ফিরিছে॥
লাল নীল শ্বেত পীত উড়য়ে পতাকা। ঘর্ঘর শব্দে ঘন ঘুরে রথ চাকা॥
বীরগণ সঘনে করয়ে সিংহনাদ। শুনি শব্দ সভে স্তব্ধ গণিল প্রমাদ॥
ব্যাগিস বাজনা নানা বাজে নিরন্তর। দামামা ধমকে যেন নব জলধর॥

মহিষাসুরের একদূত—

শঙ্কর প্রিয়ার গিয়ে চরণেতে কয়। কে বট কামিনী মোরে দেহ পরিচয়॥

হয়ে নারী অস্ত্র ধরি কি করিয়া ফির। পুরুষ দরশে কিছু লজ্জা নাহি কর ॥
ত্রিজগতে অদ্বিতীয় অসুর রাজন। বিধি বিষ্ণু শিব তার সমতুল নন ॥
তাঁর অরি দেব সভে তব সঙ্গে দেখি। হেন কর্ম্ম কেন কৈলে কহ চন্দ্রমুখি ॥
কিন্তু তোরে দেখি রাজা মনে আছে হর্ষ। তার কাছে চল শুন মোর পরামর্শ ॥
দেবগণ ত্যাজি দূরে চল ভূপস্থানে। যখন যা চাবে তাহা পাবে সেই ক্ষণে ॥
মোর কথা অন্যথা করিয়া নাহি যাবে। জীবন যৌবন তব সব বৃথা যাবে ॥

দৈত্যদূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া "মন্দ হাসে মৃদুভাষে কন কাত্যায়নী"—

দাস চিত্তধামে নিত্য বাস করি আমি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি চরাচরগামী ॥
নারী হয়ে অস্ত্র ধরি শুন তার মর্ম্ম। দাস অরি নাশ করি এই মোর কর্ম্ম ॥
ভক্ত কাজ হেতু লাজ না বহে আমার। বাসনার কথা মোর শুন সারোদ্ধার ॥
মহিষাসুরেকে আজি বিনাশ করিব। মহিষমর্দ্দিনী নাম জগতে ধরিব ॥

অতঃপর সংগ্রাম—ঘোর সাংঘাতিক সংগ্রাম—

অগণন দৈত্যচয় সমুদ্রের প্রায়। তার মাঝে বিরাজিত অসুরের রায় ॥
দৈত্যবর্গ ধরি খড়্গ স্বর্গমার্গে ধায়। চমকে চিক্কন অসি চপলার প্রায় ॥
খেটক পরিঘ জাঠা করে বরষণ। দম্ভে বিশ্ব থরহর কম্পিত সঘন ॥
কলে মেঘজালসম সভার শরীর। শরত মেঘের সম গর্জ্জয়ে গভীর ॥
অতিবড় বহে ঝড় নাকের নিশ্বাসে। পর্ব্বত উড়িয়া গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥
শ্রাবণে সঘনে যেন বর্ষে জলধর। তেনমত মারে অস্ত্র দৈত্যধুরন্ধর ॥
ব্রহ্মাস্ত্র ন্যায় সে ত্রিশূল পাত করে। এক কালে সভে মিলে ঘেরিল মায়েরে ॥
জলস্থল গগনমণ্ডল একাকার। নবমেঘে যেন ধরা কৈল অন্ধকার ॥
পূর্ণ চন্দ্রে মেঘ বৃন্দে আচ্ছাদয়ে যেন। অভয়ায় অসুরে বেষ্টিত কৈল তেন ॥

সংগ্রামবর্ণনায়, কবি ভয়ানক রসের অবতারণা করিয়াছেন; তাহাও মন্দ হয় নাই। অসুরমণ্ডলী কর্ত্তৃক আক্রান্তা কাত্যায়নী যখন কোপাবিষ্টা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তখন শতসহস্র যোগিনী সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বিকট রণতাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিল; সেই সময়—

কারো করকায়ে কণ্ঠচ্ছেদ কৈল। মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো মধ্য বিদারিল ॥
দৈত্যঅঙ্গ ছিন্ন জংঘা রণাঙ্গনে পড়ে। অরিকুল আকুল বিকলে ভূমে গড়ে ॥
একচক্ষু ক্ষত কার ছিন্ন এক পদ। রক্তের অদ্ভুত যেন হৈল মহাহ্রদ ॥
অস্থিমাংস রাশি রাশি পর্ব্বত আকার। রক্তমহাহ্রদ লক্ষ যোজন বিস্তার ॥

এইরূপে যোগিনীপরিবৃতা, রণরঙ্গিণী অভয়া দৈত্যসৈন্যসংহারে প্রমত্তা। মহিষাসুর আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; ভীষণ মহিষমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল—

মহাকোপ করি মহিষাসুরে। শঙ্করী সম্মুখে আসে সমরে ॥
দানব শরীর গোপন কৈল। মহাঘোরতর মহিষ হৈল ॥
সুমেরু শিখর সদৃশ মুণ্ড। গিরিগুহা সম নাসা প্রচণ্ড ॥
তালতরু সম রোম সকল। শরীরে ব্যাপত নভোমণ্ডল ॥

ধরা থরহরা চরণভরে। মহী খণ্ড খণ্ড চরণক্ষুরে॥
ইস সম তার দশন পাতি। আরক্ত লোচন ঘূর্ণিত অতি॥
মেঘখণ্ডে শৃঙ্গেতে করি। খণ্ড খণ্ড করে নভ উপরি॥
নিশ্বাসপবনে পর্ব্বত বেগে। উড়ি উড়ি গিয়া অম্বরে লাগে॥
ঘোর নাদ করি সম্মুখে ধায়। দেখি দেবগণ তরাস পায়॥
মুণ্ডাঘাতে কার মুণ্ড ভাঙ্গিল ক্ষুরে খণ্ড খণ্ড কাহারে কৈল॥
লাঙ্গুল বাড়ীতে তাড়িছে সভে। রণমদে মত্ত হইল যবে॥
বেগেতে যেতে অঙ্গের বায়। কত জন যমসদনে যায়॥
গমনে ভ্রমণে অরি মারিছে। কেহ নাসাশ্বাসে ভূমে পড়িছে॥

দ্রুতগতি দেবী নিকটে আসি। সিংহ বধিবারে যাইছে রোষি॥
ঘন ঘন করে সে ঘোর নাদ। সকল সংসার গণে প্রমাদ॥
উপাড়ে শিখর শৃঙ্গেতে করি। গিরিজা উপরে মারয়ে গিরি॥
উচ্চ পুচ্ছ করি সঘনে নাচে। চরণরেণুতে সূর্য্য ঢাকিছে॥
ধূলাতে ধূসর হইল অঙ্গ। দেখি দেবগণ দিলেন ভঙ্গ॥
শরতমেঘের গর্জ্জন যেন। ঘন ঘোর শব্দ করয়ে তেন॥
লাঙ্গুলতাড়ন সাদা করয়। শতসিন্ধুজল একত্র হয়॥
হেন মতে কত অরি নাশিয়া। সমর মাঝে ফিরে মাতিয়া॥

এই বর্ণনাটি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। ইহার ছন্দঃ সুমার্জ্জিত উপযোগী। ইহাতে রৌদ্ররসের বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। উপমাগুলিও ব্যবহারজীর্ণ নহে। আমরা এ স্থলে আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বর্ণনাটি সুমিষ্ট এবং কবিশক্তির সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

অমর কাজে, সমর সাজে, শঙ্করী বিরাজে।
নিরখি সকল, দানববরি দল, হৃদয়বিষাদে ত্যজে॥ ধুয়া॥
বাজত কত শত মৃদঙ্গ, যোগিনীগণ নাচত সঙ্গ, চলিত ললিত গৌর অঙ্গ, দামিনী জনু দমকে।
কাটী কিঙ্কিণী রণ রণ রণ, করকঙ্কণ ঝন ঝন ঝন, বোলয় আসি ঠন ঠন ঠন, সঘনে অসি চমকে॥
শ্রবণ কুণ্ডল অতি, গলিত গণ্ডমণ্ডল প্রতি, সঘন সহশ্রমজল তথি কলিত সকল দেহা।
মাদল ঘন ঘোর নাদ, বাদল জনু অতি পরমাদ অরিদল মানত বিষাদ, জগজন মনমোহা॥
চঞ্চল ঘন পট্টবাস সতত অট্ট অট্ট হাস বিনিপ্রয়াস দাসত্রাস নাশ করত সগনে।

জলধরবর গভীর হাক গণত জগজন বিপাক দক্ষে লক্ষে ধরা বিকম্পক
হানত রিপু সঘনে ॥
উর বিশাল উপরিভাল লোলমান মালজাল, অতি রসাল দেওত তাল ;
কামিনী করকমলে।
রুণু রুণু রুণু রুণুর রুণুর, ঝুণু ঝুণু ঝুণু ঝুণুর ঝুণুর স্বর্ণ নূপুর সুমধুর সুর,
বাজত পদ বিমলে ॥
ইত্যাদি।

শ্রীবলীন্দ্র সিংহ দেব।

শব্দ-রহস্য।

(শব্দ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ও

ভাষার প্রাধান্য)।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, গ্রন্থ অপ্রমেয় জ্ঞানভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত বহুতর জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত আছে, এবং প্রধানতঃ এই ভাণ্ডার হইতেই তৎসমুদয় পুরুষপরম্পরায় লোকের হস্তগত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সমগ্র পুস্তক ব্যতীত জ্ঞানের আরও এক অতি গভীর আকর আছে; সে আকর শব্দ। পৃথক্‌ভাবে এক একটি শব্দেও নানারূপ জ্ঞানরত্ন নিহিত আছে। চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিলে তৎসমুদয় হস্তগত করিতে পারা যায়। সাধারণ শব্দসমূহে মানবহৃদয়ের সরস ভাব-লহরী এবং সংসারের সূক্ষ্ম ঘটনাপরম্পরা অতি বিচিত্ররূপে সম্বদ্ধ আছে; এবং এইরূপে শব্দগ্রথিত হইয়া উহা কালস্রোতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। সময়ের সংহারিণী শক্তি গ্রন্থাদির লোপ করিতে ও মনুষ্যের কল্পিত ভাবসমূহকে বিকৃত করিতে পারে, কিন্তু শব্দনিহিত জ্ঞানরহস্যের সেরূপ বিকার বা বিনাশের সম্ভাবনা নাই। উহারা শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত এরূপ দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ আছে যে, শব্দের উচ্ছেদ না হইলে উহাদিগের উচ্ছেদ কদাচ সম্ভবপর নহে। অনেক সময়ে, গ্রন্থাদিতে যাহার কোন উল্লেখ নাই, জনশ্রুতি বা প্রবাদবাক্যে যাহার কোন আভাস নাই, এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব কেবল শব্দ হইতে শিক্ষা করিতে পারা যায়। অনেক সময়ে, যাহাতে জাতীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের লেখনীনিঃসৃত প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, জাতীয় ভাষা তাহাতে বিশ্বস্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া শব্দ শিক্ষা করিলে অনেক বিষয়ের প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। শব্দনিহিত সেই সকল জ্ঞানের কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাখ্যা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্থলে কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

ভাষা কবিত্বের পরিচায়ক। অনেক শব্দে মনুষ্যহৃদয়ের সাধারণ ও প্রয়োজনীয় ভাব সকল বিশদরূপে উজ্জ্বল উপমায় গ্রথিত রহিয়াছে। আমরা সচরাচর 'চূড়ান্ত' কথার ব্যবহার করিয়া থাকি; 'এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে,' 'শাস্তির চূড়ান্ত হইয়াছে,' এইরূপ প্রয়োগ লোকে প্রায়ই করিয়া থাকে। এই 'চূড়ান্ত' (চূড়া+অন্ত) কথায় কি এক উজ্জ্বল উপমা বর্ত্তমান রহিয়াছে! যেমন কোন গিরিশিখরের বা কোন ঊর্দ্ধস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিল তাহার শেষ সীমা অতিক্রম করা হইল, আরোহণের শেষ হইল, তাহার 'চূড়ান্ত' হইল। তাহার 'চূড়ান্ত' হইয়াছে বলাতে কেমন স্পষ্টরূপে ঐ ভাবটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অনেক শব্দে কবিত্ব বিদ্যমান আছে।

কবিত্বের ন্যায় নীতিও অনেক শব্দে গ্রথিত আছে। আমরা সেই সকল শব্দ হইতে সূক্ষ্ম

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
নাচত	নাচে	শিখী কুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।	৯৬—১
নায়রী (নায়র)	নাগরী (নাগর)	হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে।	১১০—৮
নারিল	পারিল না	লখিতে নারিল ওই ওই করি কান্দে।	৫৪—১১
নালিম	রক্তিম	উরজ উদয় থল নালিম দেল।	৩৭—৪
নাশই	নাশ করে	ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই।	১২১—৬
নাশা (নাসা)	নাসিকা	নাসা মোতিম সীমক হার।	১৩৪—৩
নাহ	নাথ	হঠ করি নাহ করল যত কাজ।	৬৮—১
নাহই *	স্নান করে	যাইতে পেখনু নাহই গোরী।	১২ নং ১
নাহই	স্নান করিয়া	নাহই উঠনু হাম কালিন্দী তীর।	১৩৯—৭
নাহলি	স্নান করিল	নাহলি গোরী।	১৮—৫
নাহি	স্নান করিয়া	নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী।	২৩—১
নাহি	না, নহে	কণক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।	২৫—২
নিকরুণ	করুণাহীন	মাধব নিকরুণ অন্ত।	১৬৯—১৬
নিকসউ	নির্গত হউক	শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।	১৮৫—৫
নিকসব	বাহির হইবে	জীউ নিকসব যব রাখব কোই।	৫৬—১২
নিকসয়ে	বহির্গত হয়	অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ।	১৫২—৬
নিকসল	বাহির হইল	মন্দির সঞে নিকসল।	১৪৩—৫
নিচয়	নিশ্চয়	মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।	১৬০—৭
নিচল	নিশ্চল	নিচল লোচন না শুনে বচন।	২০১—১৪
নিছিয়া	ছাঁকিয়া	পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।	২১৩—২
নিঠুর †	নিষ্ঠুর	কানু নিঠুর ভৈ গেল।	১৪০ নং ৬
নিতি	নিত্য	অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।	৭৭—৩
নিদ	নিদ্রা	মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল।	১৩৩—২
নিন্দ	নিদ্রা	নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।	১৬৪—১৩
নিদান	শেষ	বুঝনু আপন নিদান।	১৬৮—৯
নিদান	কারণ	এ সখি রঙ্গিনী কহ নিদান।	৪৫—১
নিদেশ	সংবাদ	এতহু নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরী।	৪৯—১
নিধান	নিধি	তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান।	১৮০—১০
নিবসই	বসে, রহে	নিবসই শয়নক সুখে।	১৩১—২
নিবাসে	বস্ত্রহীন স্থানে	নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।	১৪৫—৫

* নাহই—কাব্যবিশারদে "নাহলি" আছে।

হইলে বাক্যদ্বারা পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোগত ভাব সকল নিয়ত ব্যক্ত করাতে সাধারণের অবগতিক্রমে সামাজিক ভাষার উৎপত্তি হয়। সাধারণ ভাষার এই প্রথম অবতারণা স্বাভাবিক; কারণ বস্তু বা ব্যক্তির সহিত উহার সংজ্ঞার এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, শব্দের উচ্চারণেই শব্দসূচিত পদার্থের সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। শব্দ সকল যদৃচ্ছাক্রমে গঠিত হয় নাই, বস্তুগত বা ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহাদিগের নামকরণ হইয়াছে এবং এইরূপে শব্দের সহিত শব্দার্থের বিশেষ সম্বন্ধ যোজিত আছে। পাঁচ জন একত্র হইয়া ইচ্ছা করিলেই অশ্বকে করী বা করীকে অশ্ব নাম প্রদান করিতে পারে না। 'অশ্ব' এই শব্দের সহিত সেই 'দ্রুতগামী' জন্তুর এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহা ধীরগামী, শুণ্ডবিশিষ্ট 'করী'র কখনই নামান্তর হইতে পারে না। সংজ্ঞা সকল সার্থক এবং তদভিহিত বস্তু বা ব্যক্তির সহিত বিশেষরূপে সম্বদ্ধ। এই সম্বন্ধ রক্ষা করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যদি কেহ অন্ধপুত্রের নাম 'পদ্মলোচন' রাখে, বা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে গৌরাঙ্গ আখ্যা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারা প্রায়ই লোকের উপহাসের পাত্র হয়। কেন না ব্যক্তির সহিত নামার্থের বিপরীত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যখন মনুষ্য প্রথমে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং সকলেই যখন উক্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া স্ব স্ব ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, তখন পরস্পরের ব্যবহৃত শব্দের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য নিবন্ধন সহজেই যে, এক সাধারণ ভাষার অবতারণা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ বোধ হয়।

ভাষা, বুদ্ধি বিবেক প্রভৃতি আন্তরিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্তরের ভাব সকল বাহিরে প্রকাশ হইলেই ভাষা নাম ধারণ করিয়া থাকে; এই কারণেই গ্রীকেরা বিবেক এবং ভাষাকে একই নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভাষা যখন মনের বহিঃপ্রকাশ, তখন মনুষ্যের মানসিক উন্নতি ও অবনতির সহিত ভাষারও উন্নতি ও অবনতির সংশ্রব আছে। মনুষ্যের মানসিক অবস্থা যখন মার্জ্জিত এবং উন্নতিশীল হয়, ভাষাও তখন ক্রমশঃ বিকসিত এবং সুগঠিত হইতে থাকে। মনুষ্যমণ্ডলি যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবনীপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, এবং নানা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, তখন সামাজিক অবস্থানুসারে ভাষারও তারতম্য হয়; এবং বহুদিন যাবৎ বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকিতে থাকিতে ভাষারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়া আইসে। এইরূপে পৃথিবীতে নানা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ন্যূনাধিক চারি সহস্র ভাষা প্রচলিত আছে। ভাষার উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ করা হইল; এক্ষণে ভাষার প্রাধান্য এবং তদালোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উপস্থিত প্রস্তাবের শেষ করা যাইতেছে। মনুষ্যপ্রকৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, স্বীয় উন্নতি এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তৎসমুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় ভাষা। মনুষ্য বুদ্ধি-বিবেক বলে যে জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহা প্রকাশ এবং প্রচার করিয়া সাধারণের উপকার

এবং উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। মনুষ্য যদি আপনার অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রচার করিতে না পারিত, তাহা হইলে জলধিগর্ভস্থিত রত্নরাজির ন্যায় তাহার জ্ঞানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। প্রকাশের ক্ষমতা ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি সকলের কোন কার্য্যকারিতা থাকিত না। তাহা হইলে বিবেকী মানব নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষা কখনও উচ্চতর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। এক ভাষার ক্ষমতার উপরেই অন্যান্য বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ নির্ভর করিতেছে। এক ভাষাই মানবের মনোভাবনিচয়ের বিকাশদ্বার। মনুষ্যহৃদয়ের চিন্তা উপযুক্ত ভাষায় গ্রথিত না হইলে সাধারণের বোধগম্য হয় না। যুগ যুগান্তের পরিশ্রমে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণ যে সকল আবিষ্ক্রিয়া এবং উদ্ভাবনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত বাক্যবদ্ধ না হইলে কখনই পুরুষপরম্পরাগত হইয়া সংসারের জ্ঞানালোক বৃদ্ধি করিতে পারিত না। ভাষারূপ প্রশস্ত প্রণালী ব্যতিরেকে মনের চিন্তাপ্রবাহ মনেই লয় হইত, বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিত না। তাহা হইলে সংসারের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য থাকিত, এবং জ্ঞানদরিদ্র মনুষ্য নিকৃষ্ট পশুর সহিত সমান পদবীতে বিচরণ করিত। অতএব ভাষার প্রাধান্য বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। ভাষারূপ জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণের অমূল্য সম্পত্তি। পূর্ব্বপুরুষগণ বহুযত্নে ও পরিশ্রমে যে জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে; অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করিলে কিয়দংশ হস্তগত হইতে পারে। প্রাচীন আচার ব্যবহার, জাতীয় উন্নতি বা অবনতি, দার্শনিকের গভীর দর্শনজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মতত্ব, নীতিবেত্তার ধর্ম্মনীতি, কবিহৃদয়ের কল্পনাপ্রবাহ, এক একটি সাধারণ শব্দে অদ্যাপি গ্রথিত আছে।

ভাষা মনুষ্যহৃদয়ের বিকাশস্থল। যখন যে ভাবলহরী উত্থিত হইয়াছে, যখন যে নূতন বিষয় আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ তখনই ভাষাপটে অঙ্কিত হইয়াছে এবং স্পষ্টরূপে অদ্যাপি এক একটি বাক্যে খোদিত আছে। 'নির্ব্বাণ' এই শব্দটিতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত রহস্য নিহিত আছে। বুদ্ধদেব অনেক চিন্তা এবং বহু তর্কবিতর্কের পর যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটি ক্ষুদ্র কথাতে সম্বদ্ধ হইয়া দ্বিসহস্র বর্ষাধিক কাল, বৌদ্ধমতকে জীবিত রাখিয়াছে। ব্রহ্মার পুত্র মনু হইতে যে, মনুষ্যের উৎপত্তি, এই পৌরাণিক কথা 'মনুষ্য', 'মানব' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই গ্রথিত আছে। চন্দ্রকিরণে যে, সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হয়, এই বৈজ্ঞানিকতত্ব, সিন্ধুর নামান্তর 'সমুদ্র' শব্দে চিরসম্বদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যে, জাতিভেদ প্রথা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা ইতিহাসাদি বলিয়া না দিলেও, ভাষা 'যবন' কথাতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে। 'যবন' শব্দের ব্যুৎপত্তি যু ধাতু হইতে; উহার অর্থ মিশ্রিত করা। যাহারা জাতি বিচার না করিয়া, সকলের সহিত মিলিত হইয়া ভোজনাদি করে, তাহারাই 'যবন'। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে ভাষাভাণ্ডারে বহুতর অমূল্য জ্ঞানরত্ন মিলিতে পারে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

দেড় বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষদপত্রিকাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছু ফল লক্ষিত হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ, প্রত্যেক লেখকই আপনার প্রণীত কিংবা অবলম্বিত পরিভাষাকে অতীব স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন; তাই কিছুতেই তাহা পরিহার করিতে পারিতেছেন না। এস্থলে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচনা ভিন্ন সত্যোদ্ধার হয় না; ইয়ুরোপে কত বাদবিসংবাদের পর পরিভাষা স্থিরীকৃত হয়। আমি তাহার এইমাত্র উত্তর দিতে পারি যে, যাঁহারা মনে করেন, পরিভাষা লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিলেই আমরা ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজের ন্যায় জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইব, তাঁহারা কখনও ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা করেন নাই।

এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে;— হিন্দুশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের নামোল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে চন্দ্র, রাহু ও কেতু বর্ত্তমান জ্যোতিষের হিসাবে গ্রহ নহে। চন্দ্র একটি উপগ্রহ, ও রাহু এবং কেতু চন্দ্রের কক্ষপথে বিন্দুবিশেষ। রাহু এবং কেতুর কোন স্বরূপ নাই; তথাপি তাহাদের 'গতি' প্রতিপন্ন হওয়াতে তাহারা গ্রহনামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হিন্দুজ্যোতিষিগণ চলনশীল সংজ্ঞা মাত্রকেই "গ্রহ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা আর্য্যজ্যোতিষিগণের নবগ্রহের মধ্যে ছয়টিকে মাত্র গ্রহস্থানীয় রাখিয়া অপর তিনটিকে আসনচ্যুত করিয়া দিয়াছি (ইহা সত্বেও যে সকল হিন্দু মহোদয় নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা মনে করিয়া আশস্ত হইতে পারিবেন যে, Uranus, Neptune, ও মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষান্তর্বর্ত্তী 'গ্রহকঙ্কর' (Asteroids) সমষ্টিকে গ্রহত্রয়রূপে গণ্য করিলে নবগ্রহের সংখ্যার সম্পূরণ করা যায়)। Buchanan নামক জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত Uranus আবিষ্কারের পর হর্শেলের গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থ বলিয়াছিলেন যে, নবাবিষ্কৃত গ্রহ হিন্দুদিগের "রাহুগ্রহ" ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে এই দাঁড়াইতেছে যে, আমরা বর্ত্তমান জ্যোতিষের হিসাবে ছয়টিমাত্র গ্রহ পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহাদিগের উপর ইয়ুরোপের দাবীদাওয়া কিছুমাত্র থাকিতে পারে না। এই ছয়টি গ্রহের নাম আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদত্ত নামই থাকিবে; ইহাদিগের ইয়ুরোপীয় নামের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিতেছে না। অতএব "সুরসুন্দরী কামপ্রসবিনী বিনস্ (Venus) কেমন করিয়া অসুরগুরু শুক্র হইবেন' * তাহার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব বিন্দুমাত্রও

---

* দাসী—জুলাই, ১৮৯৫, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

আমাদের ঘাড়ে চাপিতেছে না। কিন্তু অপর দুইটি (Uranus ও Neptune) গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। কারণ যদি তাহাদের উপর আমাদের উত্তরাধিকার বর্ত্তাইতে হয়, তবে তাহাদের নাম "রাহু" ও "কেতু" রাখিতে হইবে। নতুবা ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা ইয়ুরোপ হইতে উক্ত গ্রহদ্বয়কে ভিক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে "নেপ্তুন বিলাতি জলাধিপতি বলিয়া আমরা কেন তাঁহাকে বরুণ বলিব ?"—এরূপ কথা কি আমাদের মত ভিখারীর মুখে শোভা পায় ? উক্ত গ্রহদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র অধিকার (Translation বা Transliteration) অর্থানুবাদ বা অক্ষরান্তর। আমি "ভারতীতে" (অগ্রহায়ণ, ১২৯৯—"গ্রহের নামকরণ") অর্থানুবাদ করিয়া প্রথমতঃ ঐ গ্রহদ্বয়ের নামকরণ করিয়াছিলাম। গত শ্রাবণের "পরিষদপত্রিকায়" যোগেশ বাবু উহাদের অক্ষরান্তর দ্বারা নামকরণের পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমার নামকরণের অর্থগত কোন দোষ দেখান নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে তাঁহার মত ব্যক্ত করাতে আমি অনুমান করিয়া লইতেছি যে, তিনি মনে করেন, অর্থানুবাদ না হইলেই ভাল ছিল ; যখন হইয়া গিয়াছে, তখন আর কি করা যায় ? এই অবসরে মাধববাবু গত জুলাই মাসের "দাসীতে" এক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর রায়চৌধুরীকে দোষী করিয়াছেন যে, Uranusকে টিপ্পনীতে চুপে চুপে ইন্দ্র বলিয়া যাওয়া কি উচিত হইয়াছে ?" মুরলীবাবু আমার উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিবাদ হইতে না দেখিয়া, মৎ-প্রদত্ত নামদ্বয় সাহিত্যসমাজে গৃহীত হইয়াছে, মনে করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার দোষ! মাধববাবুর মতানুসারে নামকরণ করিতে হইলে জগতে ইন্দ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইতে বহু বিলম্ব আছে। বরুণ (Neptune) গ্রহের কক্ষবহির্ভাগে ; (Leverrierর গণনাতে আস্থা রাখিতে হইলে) আরও গ্রহ থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। দূরবীক্ষণ তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারুক আর না পারুক, গণিত তাহার অনুসরণে কদাচ ক্ষান্ত থাকিবে না ; ভূতলে দ্বিতীয় Leverrierর অবতরণ অসম্ভব ব্যাপার নহে। রামেন্দ্রবাবুও বলিতেছেন "Uranus আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতা বরুণ।" (পরিষদ-পত্রিকা,—শ্রাবণ, ১৩০২, ১৬১ পৃষ্ঠা।) বৈশ্বানর বলাতে দোষ কি ?

অতঃপর আরও কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এস্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, যে সকল সংজ্ঞা কেবলমাত্র নামবাচক, তৎসমুদয়ের ভাষান্তর সাধন করিতে হইলে অর্থানুবাদ বা অক্ষরান্তর ভিন্ন অপর উপায় নাই। কিন্তু যে সকল সংজ্ঞা ভাববাচক, তৎসমুদয়ের ভাষান্তর সাধন কেবল ভাবানুবাদ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—Right Ascension ; মাধববাবু বলেন, ইহা যে, কেবল Oblique Ascension নহে, তাহা বুঝাইল। কিন্তু ইহা যে Wrong ascension নহে, তাহাও ত বুঝাইতে পারে। একমাত্র নিরক্ষমণ্ডলবাসী ভিন্ন অপর সকলেই R. A. কে oblique ascension রূপে দেখিয়া থাকেন। 'বিষুবাংশ' ইহার সুন্দর প্রতিশব্দ হইয়াছে। ইহাতে

কাহারও আপত্তি নাই। মাধববাবু বলেন, "প্রক্রিয়াস্থলে right ascension লগ্নের ভুজ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি right ascension এর নাম লগ্নভুজ হইবে?" প্রক্রিয়াস্থলে যে লগ্নের ভুজ হইল, তাহাকে 'লগ্নভুজ' বলিলে ত আর:গালি দেওয়া হয় না! অনেকে declination কে 'ক্রান্ত্যংশ' করিয়াছেন; আমিও প্রথমে তাহাই করিয়াছিলাম। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে 'ক্রান্তি' বলিতে কেবল ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) পথাবস্থিত নক্ষত্রদিগের declination বুঝায়। এতদ্ভিন্ন Ecliptic এর নাম 'ক্রান্তিবৃত্ত' হইতে পারে না। তাই আমি প্রক্রিয়া দেখিয়াই R. A. এর নাম 'লগ্নভুজ' এবং declination এর নাম 'লগ্নজ্যা' করিয়াছিলাম।

Densityর বাঙ্গালা আমি করিয়াছি 'গাঢ়তা'; স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত করিয়াছিলেন 'ঘনতা'; যোগেশবাবুও বলিতেছেন 'ঘনতা';—কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহাতে Volume এর বাঙ্গালা "ঘনফলের" সহিত এবং cube root এর বাঙ্গালা "ঘনমূলের" সহিত গোল বাধে। মাধববাবু বলিতেছেন "গাঢ়তা করিয়াছেন, উত্তম;"—যদি উত্তম হইল তবে আবার "সান্দ্রত্ব" কেন? আমি লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "সান্দ্রত্ব" শব্দের অর্থ কিংবা ধাতু, কিছুই আমার বোধগম্য নহে।

Ellipse, parabola, hyperbola সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি Ellipseকে কেন 'বৃত্তাভাস' বলিতে নারাজ, তাহার কৈফিয়ৎ পরিষদপত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩০২) একবার দিয়াছি, অতএব এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মাধববাবু parabola ও hyperbolaর ক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু আমরা উহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞানেই পাঠ করিয়া আসিয়াছি। তবে ক্ষেত্রদ্বয় সর্ব্বত্র অসীম নহে, এই মাত্র। তাহাদের খণ্ডবিশেষের "ক্ষেত্রফল" বাহির না করিয়া, কেহ কদাপি গণিতে "Honours" পাইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহার "ক্ষেত্র" নাই, তাহার অংশবিশেষের "ক্ষেত্রফল" কোথা হইতে আইসে, জানিতে পারিলে আমার ন্যায় অনেকেই কৃতার্থ হইবেন। মাধববাবু আরও বলেন, "অব" দ্বারা অভাব or ellipse বুঝাইতে পারে, অতি দ্বারা hyper বা আধিক্য বুঝাইতে পারে। কিন্তু para স্থলে কি সম বসান যায়?" লাতিন অভিধানকর্ত্তা para অর্থে 'সম' করিতে পারিলে আমরা "para স্থলে সম" বসাইয়া এত কি অধঃপাতে যাইব, এবং paraরই বা তাহাতে কি জাতি নষ্ট হইবে? Parabolaর অর্থ 'ক্ষেপণী' না করিয়া projectile অর্থে 'ক্ষেপণী' রাখিলে ঠিক হয়।

Ellipsoid এর বাঙ্গালা করিয়াছেন, 'বর্ত্তুলাভাস'। Sphere 'বর্ত্তুল' হইলে Spheroid অর্থে 'বর্ত্তুলাভাস' ভাল মানায়।

যোগেশবাবু Ellipse এর দুইটি প্রতিশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "প্রতিবৃত্ত" কথাটি Ovalএর জন্য রাখিয়া দিলে চলিতে পারে। আমার একমাত্র বক্তব্য এই, Ellipseকে বৃত্ত হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখাইতে পারিলে গণিতের পক্ষে অনেক লাভ হয়।

Focus সম্বন্ধে আমার বক্তব্য গত বৈশাখের (১৩০২) পরিষদ-পত্রিকার ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছি। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় যে, Focus অর্থে 'নাভি' করিয়াছিলেন, তাহা আমি আদৌ জ্ঞাত ছিলাম না। সাক্ষ্য প্রমাণিত হওয়াতে আশা করি, ঐ অর্থই সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।

Axisএর অর্থ আমি 'দণ্ড' করিয়াছি। মাধববাবু বলিতেছেন 'অক্ষ'। কিন্তু 'অক্ষ' শব্দে 'Latitude' বুঝায়। দুইটি *Principal* foci যে রেখাতে অবস্থিত, তাহাই Major axis, তাই আমি তাহার অর্থ 'মূলদণ্ড' করিয়াছি। মাধববাবু আরও বলেন, "সকল Ellipse এর minor axis অক্ষদণ্ড নহে।" চন্দ্র prolate spheroid হইলেও তাহার আবর্ত্তন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা minor axisকে বেষ্টন করিয়া ঘটিয়া থাকে।

মাধববাবু বলিতেছেন latus অর্থ side ; আমি ইহাও জানি যে latus অর্থ breadth ; পাঠকগণও ইহা জ্ঞাত আছেন যে 'পরিসর' অর্থে 'চওড়া' বুঝায়। Latus rectum বলিতে right breadth বা focal breadth বুঝায়, আমি সেই অর্থে পরিসর শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। মাধববাবু যে, একান্তই Focusটিকে 'উনান' বানাইতে চাহিতেছেন, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ অমত।

Eccentricity দ্বারা ক্ষেত্রের 'বিশিষ্টীকরণ' সাধিত হয় বলিয়া, আমি উহার অর্থ 'বিকার' করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গদেশের জলবায়ুর প্রভাবে বোধ হয়, ঐ শব্দটি অনেকের নিকট শ্রুতিসুখকর হইতেছে না। মাধববাবু যে, Ellipse কে বৃত্তের কিঞ্চিৎ "অপচয়" বা "অভাব" সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, সকলে একমত হইবেন না। Ellipse কোন বৃত্তের বর্দ্ধিতায়তনও হইতে পারে।

Refractionএর অর্থ 'আলোকবিবর্ত্তন' ভাল লাগিতেছে না ; কারণ 'বিবর্ত্তন' বলিতে Evolution বুঝা যায়। 'বক্রণ' ইহা হইতে অনেক ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে curvilinearএর ভাব আসিয়া গোল বাধাইতেছে।

যোগেশবাবু যে, Potential energyর বাঙ্গালা 'জড়শক্তি'তে "চিৎশক্তির অভাব" দেখিতেছেন, তাহা দোষাবহ নহে। আমি কেন 'জড়শক্তি'র ব্যবহার করিয়াছি তাহা পরিষদ-পত্রিকার (২য় ভাগ) ১৭ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছি। Potential বলিতে innate বুঝায়। নিউটন ঐ অর্থে Material করিয়াছেন ; আমি তাহারই অনুসরণ করিয়াছি মাত্র।

Differentiation = ব্যাসন ও Integration = সমাসন, অতি উপাদেয় হইয়াছে। Calculus অর্থ 'গণিত' বেশ লাগে ; অতএব 'খড়ী' শব্দটি chalk বুঝাইবার জন্য রাখিলে বেশ হইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, খড়ীরত্ন মহাশয় তাঁহাকে 'Chalk রত্ন' বলিয়া চালাইবার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া, আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

Nebula অর্থ 'নীহারিকা' করিতে কেহ কখনও আপত্তি করেন নাই, অতএব তাহার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেকস্থলেই Cosine অর্থে 'ভুজজ্যা' বা 'ভুজকোটিজ্যা' ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল কোটিজ্যা' দ্বারা কোন কোন স্থলে Sine বুঝা গিয়াছে।

Observation অর্থে 'বেধ' বলিলে 'শলাকা দ্বারা' observation বুঝায়। সিদ্ধান্তকারগণ শলাকা ব্যবহার করিতেন বলিয়াই তাৎকালিক অর্থ 'বেধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের Telescope, Microscope, Spectroscope প্রভৃতি যন্ত্রের দিনে 'বেধ' শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া 'পর্য্যবেক্ষণ' শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।

Experiment দ্বারা 'পরীক্ষণ' বুঝাইলে চলিতে পারে, বোধ হয়। 'পরীক্ষা' অর্থে Examination বোধ হয়, ষোল আনা বাঙ্গালীই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

পরিশেষে আমার একটি নিবেদন এই, আলোচনা করিতে হইলেই যে অনাবশ্যক তর্ক করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। এমন অনেক আবশ্যক শব্দ রহিয়াছে যে, যৎসমুদয় লইয়া তর্ক করিলে বর্ত্তমান জীবনে সিদ্ধান্ত স্থির করা দুর্ঘট।

Centrifugal force কথাটী লইয়া এখনও ইয়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে। এইরূপ ভাবগত সংজ্ঞা নিয়া আলোচনা করিলে জ্ঞানবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু Uranus ও Neptune এর নামের অনুবাদ লইয়া অকারণ তর্কে আপনাদের জাতীয় দোষের পরিস্ফুটন ভিন্ন অপর কিছুই প্রকাশিত হয় না।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বিদ্যাপতি।

(গতবারের পর)

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
দেহ	দাও	কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।	১৩০—৭
দোখ	দোষ	সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি।	১৮০—৬
দোতী (দোতি)	দূতী	দোতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ।	৬৭—১০
দোসর	দ্বিতীয়, সঙ্গী	দোসর জন নাহি সঙ্গ।	১৬৬—২
দোসর	সদৃশ	তস্থক দোসর দেহা।	১৯৮—৪
দোহাই	দিব্য	শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।	৩৮—১
দোহাইব +	দোহন করিব	সখা সঞে দোহি দোহাইব।	২০৮ নং ৫
দোহি +	দুগ্ধ (?)	„ „ „	„
দ্বন্দ্ব	যুগ্ম	জলধর বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।	১৪—৪
দ্বন্দ্ব	বিবাদ, সন্দেহ	পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব।	৯৪—১৪
ধনি	ধন্যে	এ ধনি কর অবধান।	৫১—৩
ধনি	ধন্য	ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।	৪৭—৭
ধন্দ	ধাঁদা, সন্দেহ	মঝু মনে লাগল ধন্দা।	৪৮—৪
ধন্দ	বিস্ময়কর ব্যাপার	নিকুঞ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।	১৪৭—২
ধন্দ	বিস্মিত	নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।	১৩৬—১
ধম্মিল্ল (ধামিলী)	বেণী	ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।	[illegible]—৭
ধয়ল	ধরিল	বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে।	[illegible]—৬
ধর	ধরে, গণ্য করে	হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা।	১৯১—৬
ধরই	ধরিতে	ধরই না পারই কেহ।	৫১—১০
ধরইতে	ধরিতে	করে ধরইতে কত করু না কোটি।	৬০—৪
ধরব	ধরিবে, ধরিব	ঐছন কবচ ধরব যব হাত।	১৫১—১১
ধরবে	ধরিবে	আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।	২০৬—১৫
ধরল (ধয়ল)*	ধরিল	কুন্দ বল্লী তরু ধরল নিশান।	৪১;নং ১৩
ধরসি	ধরিতেছ	সে ফুলে ধরসি বাণ।	১০৬—১৩
ধরু	ধরে	কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ।	৯৫—৮
ধরম +	ধর্ম্ম	ধরম কর সাথী।	৭৯ নং ৮
ধসধস	ধড়ফড় (?)	চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।	১২৬—১৫
ধাই	ধাইয়া	আইতে পড়লহুঁ ধাই।	১৫৬—২

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
ধাওল	ধাইল	ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ।	৯৫—৪
ধাবই	ধাবণ করে	ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।	১৬৩—৪
ধায়ল	ধাবিত হইল	দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল।	১৮৩—৯
ধায়লুঁ	ধাইয়া আসিলাম	হাম ধায়লুঁ তুয়া পাশ।	১৮৯—১২
(ফুল) ধারি	ধারা, বৃষ্টি	যাঁহা কয়ল ফুলধারী।	১৬৪—৫
ধাস	ধাসা, গিরি	আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল।	১১৮—১
ধুনি	কাঁপাইয়া	কোই শির ধুনি ধুনি দেখি।	১৮৯—১০
ধৈরজ	ধৈর্য্য	ধৈরজ লাজ রসাতল গেল।	১৪১—১০
ধোই	ধৌত করি	জল দেই ধোই যদি তবহু না যাই।	১৩৯—৬
ধোয়ল *	ধৌত করিল	মাজি ধোয়ল জনু কনয়া মুকুর।	১৪ নং ৬
ন *	না	আশা পাশ ন তেজই অঙ্গ।	৮ নং ৯
নওল	নবীন	বিহরই নওল কিশোর।	৯৭—৫
নখরমণি-রঞ্জন	নরুণ	চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ।	১৫২—১
নটই	নৃত্যকরে	রঙ্গিনীগণ সব সঙ্গহি নটই।	৯৯—৩
নটতি	নৃত্য করিতেছে	নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি।	১০০—২
নমুঞা	নবনী	নমুঞা বদনী ধনী	১৬—১
নবমী দশা	মূর্চ্ছা	নবমী দশা গেলি।	১৯৮—৫
নবরঙ্গ	নারাঙ্গা লেবু	পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।	৩২—৪
নয়লি	নূতন	কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা।	৬৫—২
নয়ান	নয়ন	হেরই মুখশশী সজল নয়ান।	১২৬—৪
নয়ান-স্বরূপে	প্রত্যক্ষ	দেখলু নয়ান স্বরূপে।	২৬—১৩
নহ	নাই	হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে।	১১০—৮
নহ	নহে	মালতী মাল, শিরে নহ গন্ধ	১৫৭—৪
নহি	না	হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।	৬১—১
নহি	নাহি	এহণ জগৎ নহি আনে।	২৮৫—৬
নহু	নহি	হাম নহু শঙ্কর হউ বরনারী।	১৫৭—২
না	নৌকা	বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।	২১০—৪
নায়	নৌকা (কে)	বন্দো তুয়া পদ নায়।	২১৭—৫

* ধোয়ল—কাব্যবিশারদে "ধয়ল" আছে।

* কাব্যবিশারদে "না" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
নাচত	নাচে	শিখী কুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।	৯৬—১
নায়রী (নায়র)	নাগরী (নাগর)	হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে।	১১০—৮
নারিল	পারিল না	লখিতে নারিল ওই ওই করি কান্দে।	৫৪—১১
নালিম	রক্তিম	উরজ উদয় থল নালিম দেল।	৩৭—৪
নাশই	নাশ করে	ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই।	১২১—৬
নাশা (নাসা)	নাসিকা	নাসা মোতিম গীমক হার।	১৩৪—৩
নাহ	নাথ	হঠ করি নাহ করল যত কাজ।	৬৮—১
নাহই *	স্নান করে	যাইতে পেখলু নাহই গোরী।	১২ নং ১
নাহই	স্নান করিয়া	নাহই উঠলু হাম কালিন্দী তীর।	১৩৯—৭
নাহলি	স্নান করিল	নাহলি গোরী।	১৮—৫
নাহি	স্নান করিয়া	নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী।	২৩—১
নাহি	না, নহে	কণক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।	২৫—২
নিকরুণ	করুণাহীন	মাধব নিকরুণ অন্ত।	১৬৯—১৬
নিকসউ	নির্গত হউক	শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।	১৮৫—৫
নিকসব	বাহির হইবে	জীউ নিকসব যব রাখব কোই।	৫৬—১২
নিকসয়ে	বহির্গত হয়	অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ।	১৫২—৬
নিকসল	বাহির হইল	মন্দির সঞে নিকসল।	১৪৩—৫
নিচয়	নিশ্চয়	মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।	১৬০—৭
নিচল	নিশ্চল	নিচল লোচন না শুনে বচন।	২০১—১৪
নিছিয়া	ছাঁকিয়া	পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।	২১৩—২
নিঠুর †	নিষ্ঠুর	কানু নিঠুর ভৈ গেল।	১৪০ নং ৬
নিতি	নিত্য	অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।	৭৭—৩
নিদ	নিদ্রা	মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল।	১৩৩—২
নিন্দ	নিদ্রা	নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।	১৬৪—১৩
নিদান	শেষ	বুঝনু আপন নিদান।	১৬৮—৯
নিদান	কারণ	এ সখি রঙ্গিনী কহ নিদান।	৪৫—১
নিদেশ	সংবাদ	এতহু নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরী।	৪৯—১
নিধান	নিধি	তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান।	১৮০—১০
নিবসই	বসে, রহে	নিবসই শয়নক সুখে।	১৩১—২
নিবাসে	বস্ত্রহীন স্থানে	নিবাসে বাস পুর্ন দেয়ল সোই।	১৪৫—৫

* নাহই—কাব্যবিশারদে "নাহলি" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
নিবিড়	দৃঢ়	নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক।	৮৫—৩
নিবেদলু	নিবেদন করিলাম	অতএ নিবেদলু তোয়।	১৯৭—১১
নিমগণ	নিমগ্ন	সখীগণ আনন্দে নিমগণ ভেল।	১২৬—৫
নিমালিক	নির্ম্মাল্য	ভেলি নিমালিক মালা।	২০১—১১
নিমিথ	নিমেষ	নিমিথ নেহারি রহল দ্বয়নয়না।	১১—৪
নিয়ড়ে (নিয়রে)	নিকটে	পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।	৫৫—৭
নিয়ে	লই	আলাই বালাই তার নিয়ে।	২১৩—৪
নিরখয়ে	দেখে	হাসি মুখ নিরখয়ে টাট মাধাই।	১৩৯—১৫
নিরজন	নির্জ্জন	নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।	৩২—২
নিরঞ্জন	অঞ্জন-শূন্য	নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।	১৯—৩
নিরদন্দা	দ্বন্দ্বরহিত, প্রসন্ন	দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।	২০৮—১৪
নিরদয়	নির্দ্দয়	শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।	১২৩—৩
নিরবাহ	নির্ব্বাহ	করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ।	১২৫—৪
নিরমাণ	নির্ম্মাণ	অধর মধুরি নিরমাণে।	১২০—৪
নিরমিল	নির্ম্মিল	কো বিহি নিরমিল বালা।	৯—৫
নিরমূল	নির্ম্মূল	শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল।	৯৬—১০
নিরোধ	নিরুদ্ধ করা	অধরে অধিক নিরোধ।	৮৫—৪
নিশঙ্ক	নিঃশঙ্ক	ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক।	৯৩—১২
নিশবদ	নিঃশব্দ	কত নিশবদ করি কুচে কর দেল।	১৪০—১২
নিশান *	সঙ্কেত	এ সখি রঙ্গিনী কহল নিশান।	২০ নং ১৩
নিশাস	নিশ্বাস	বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর।	৪৫—৬
নিশোয়াস	নিশ্বাস	সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।	১৪১—১
নিসরিতে (নিরসিতে)?	নিঃসৃত করিতে	ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি।	১২৯—৪
নিহার	দেখে	অনতহি গমনে এতহি নিহার।	৫৮—৫
নীঝর (নিঝর)	নির্ঝর	অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর।	১৫৪—১৪
নীত	নীতি, উপদেশ	বিদ্যাপতি কহ নীত।	১৬৩—১১
নীবি	কটি	নীবি বন্ধ করল উদেশ।	২২—৯
নুকি	লুক্কায়িত	ও নুকি করতহি দেহা।	১৯—৭
নূনা	ন্যূন, কৃশ	গোরী কলেবর নূনা।	১৪—৯
নেবি (নেব)	লইব	মাধব সেবি মনোরথ নেবি।	২০৫—৬

* নিশান—কাব্যবিশারদে "কহ নিদান" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
নেয়ল (নেয়লি)	লইল, স্থাপিত কা		১৩৫—৮
নেল	লইল	শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল।	৩১—২
নেহারই	চাহিয়া	পন্থ নেহারই তোরা।	২০১—১৩
নেহারই	দেখিয়া, দেখে	তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি।	১০৯—২
নেহারনী	দৃষ্টি	চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনী।	১৩—৩
নেহারনু	দেখিলাম	জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু।	২১৪—১
নেহারব	দেখিব, চাহিব	কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটির।	১৬৪—৪
নেহারবি	চাহিবি	আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।	৫২—৪
নৈয় *	লইও	সখীগণ গণইতে নৈয় মোর নাম।	১২৫ নং ৩
নৌতুন	নূতন	সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।	৯৪—৩
পখাণ	পাষাণ	সিরজল কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে	১২০—৬
পণ্ডার	পয়ঃপ্রণালী (?)	রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পণ্ডার।	৭৩—২
পণ্ডার	প্রবাল	অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পণ্ডার।	৬৫—৩
পঙ্কা	পঙ্কিল	গগন সঘন মহী পঙ্কা।	৯১—৭
পড়ই	পড়ে	ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।	১৮১—৯
পড়য়ে	পড়ে	ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।	১৬—৭
পড়ল	পড়িল	কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশী বয়না।	১১—৩
পড়লহু	পড়িলাম	আইতে পড়লহুঁ ধাই।	১৫৬—২
পড়াওল	পড়াইল	মনমথ মন্ত্র পড়াওল।	১৪৩—৩
পড়ায়ব	পড়াইবে	অবহি মদন পড়ায়ব পাঠ।	৮০—১২
পড়ু	পড়ে	চৌদিকে খসি পড়ু তারা।	১৪৬—৪
পড়ু	পাঠ করে	আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র।	৯৬—২
পতিয়াই	প্রত্যয় হয়	মঝু মনে নাহি পতিয়াই।	১৭২—৭
পতিয়ায়ব	প্রত্যয় করিবে	কো পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ।	৪২—২
পদুমিনী	পদ্মিনী	একে ধনী পদুমিনী সহজহি ছোটি।	৬০—৩
পন্থ	পথ	পন্থ নেহারই তোরা।	২০১—১১
পয়সি	জলে	পয়সি প্রয়াগে যাগশত জাগই।	৭—১
পয়াণ	প্রয়াণ	অব নাহি মাথুর করব পয়াণ।	১৫৩—৬
(বিধি) পয়ে	পৈ-কেবল, নিশ্চয়	ভালমন্দ বিহিপয়ে জানে।	১৯৮—৮

* নৈয়—কাব্যবিশারদে এই পঙ্‌ক্তি "নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
পর	উপর	আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।	৬৩—৯
পরকার	প্রকার	কত পরকারে বুঝায়নু।	১১৬—৮
পরকাশ	প্রকাশ	ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ।	৩১—৪
পরকাশ	অবসর (?)	ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।	১৩৮—১৪
পরচার	প্রচার	ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।	৩৯—৯
পরচুর	প্রচুর	বদন মোছল পরচুর।	২২—৫
পরণাম	প্রণাম	এ সখি তোহে পরণাম।	৫৭—১
পরতাপ	প্রতাপ	কত কত ঐছন কহব মদন পরতাপে।	৯—৪
পরতীত	প্রতীত	হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।	১০১—৮
পরতেক	প্রত্যক্ষ	স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে।	১৪৫-১২
পরদেশ	প্রবাস	পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।	১৫৪—৩
পরবাসী	প্রবাসী	মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।	১৯৫—৯
পরবেশ	প্রবেশ, আরম্ভ	বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল দুরদেশ।	১৬৬—৩
পরবেশল	প্রবেশ করিল,	এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল।	১৪৩-১
পরবেশে	প্রবেশ করে	ঘট পরবেশে হুতাসে।	৮—৯
পরবোধই	প্রবোধ দেয়	আকুল কত পরবোধই কান।	১৫৩—৫
পরবোধব	প্রবোধ দিব	মাধব কত পরবোধব রাধা।	১৯৩—১
পরবোধবি	প্রবোধ দিবি	তুহুঁ পরবোধবি তাই।	২০৪—১০
পরবোধি	প্রবোধ দিয়া	পরবোধি পয়োধর পরশিহ।	৫৯—৭
পরভাত	প্রভাত	ভেল পরভাত পুছই সবহুঁ।	১৭৯—১
পরমাণ	প্রমাণ, সাক্ষী	লছিমা দেবী পরমাণে।	১১—২
পরমাদ	প্রমাদ	কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ।	৪৩—২
পরশ	স্পর্শ	নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।	৭৫—১
পরশন	স্পর্শন	দরশন পরশন হয় অনিবারে।	৮০—৯
পরশবি	স্পর্শ করিবি	ছলে পরশবি কুচভারা।	৫৯—১০
পরশয়ে	স্পর্শ করে	যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পানী।	৫৭—৫
পরশিত	স্পৃষ্ট	গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত।	৬—১
পরশিহ	স্পর্শ করিও	পরবোধি পয়োধর পরশিহ।	৫৯—৭
পরসঙ্গ	প্রসঙ্গ	রস পরসঙ্গে উঠয়ে মধু কাঁপ।	৮২—৫
পরসাদ	প্রসাদ	সো সব পূরল পিয়া পরসাদ।	২১০—১০
পরহার	প্রহার	কুচযুগে দেয়ল নখ পরহারে।	৭০—৯

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	
পরাওল	পরাইল	যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি।	১২৭—১২
পরাণ	প্রাণ	আকুল করি গেও হামারি পরাণ।	২৪—৮
পরাভব	নির্য্যাতন,অবমাননা	প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই।	৯২—৪
পরিখই	পরীক্ষা করে	কোই সখী পরিখই শ্বাস।	১৮৯—১১
পরিতেজব	পরিত্যাগ করিবে	আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব।	১৯২—২
পরিপূরয়ে	পরিপূর্ণ করে	বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।	৪৫—৯
পরিবাদ	নিন্দা, অপবাদ	হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ।	১৩৬-১০
পরিযন্ত	পর্য্যন্ত, পরিণাম	না জানি কি ইহ পরিযন্ত।	১৬৯—১৪
পরিরম্ভ (পরিরম্ভণ)	আলিঙ্গন	পিয় পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।	৫২—৯
পরিহণ *	পরিধান	পরিহণ বসন আনহি করি ছন্দ।	৭৩ নং ৮
পরিহর	ত্যাগ কর,ছেড়ে দাও	পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।	৫৭—১
পরিহরে	পরিত্যাগ করে	সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি।	১৮০—৬
পরিহসি	পরিধান কর	কঙ্কণ নহি পরিহসি।	১২০—৭
পরিহার	ত্যাগ, সমর্পণ	বিহি পায়ে করি পরিহার।	৯১—৫
পরিহোয়ত	পরিত্যাগ করে	যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত।	২০৯—৯
পলায়ল	পলাইল	ইহ সব দূরহি পলায়ল।	৮—৬
পশলু †	প্রবেশ করিল	ইহ বর শবদ পশলু যব শ্রবণে।	১১৫ নং ৭
পশিয়ে	প্রবেশ করি	ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ।	১৩৮—১৪
পসারব	প্রসারিত করিবে	চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট।	২০৬—১০
পসারল (বিস্তৃত হয়);	প্রসারিত (করিল)	তৈল বিন্দু যৈছে পানি পসারল।	১৮২—১৪
পসারলি	প্রসারিত করিলি	দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি।	৪৮—১১
পসারি (পসারিয়া)	প্রসারিত করিয়া	কেশ পশারি যব তুহুঁ আছলি।	৪৮—৫
পহরী	প্রহরী	ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।	৯৩—১
পহিরণ	পরিধান	পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ।	৯৪—৮
পহিরল	পরিধান করিল	পহিরল হার উরজ করি উরে।	১৩৫—৭
পহিল	প্রথমে	পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।	৩২—৪
পহু (পহুঁ) (১)	প্রভু	কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।	১৩৪—৫
পহু (পহুঁ) (২)	পুনঃ	মৌনী করবি পহু কয়ইতে বাণী।	২৯ নং ৬

* পরিহণ—কাব্যবিশারদে "পহিরণ" আছে।

† পশলু— উকারটা মাত্রা। কাব্যবিশারদে "পশিল" আছে।

(১) পহু—অক্ষয় বাবু বলেন "পহু=প্রভু, (২) পঁহু=পুনঃ; কীর্ত্তন গায়কেরা এই প্রভেদ বুঝে না, সুতরাং অনেক সময় পাঠেরও ঠিক থাকে না।

শব্দ।		উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি
পুহু	পুনঃ	বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস।	১৫৩—১৪
পাঁচবাণ	মদন	ভুলহ জনি পাঁচবান।	৫৯—৬
পাঁজর		পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।	১৭৬—৮
পাঁতি (পাঁতিয়া)	পংক্তি	দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত।	১৮—১
পাই	পায়	তরুণী পাই পরিহাস তহি করই।	৩৯—৪
পাউ	পাই	ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ	১৩৮—১৪
পাওব	পাইব	ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।	২২০—২
পাওবি	পাইবে	গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি।	২২০—১
পাওয়ে	পায়	গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে।	২১-৮
পাওল	পাইল	কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।	২১২—৪
পাব	পাইবে	যো গুণবন্ত সোই ফল পাব।	৫৬—২
পাবি	পায়, পাইবে	না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি।	১৪৪·৪
পায়ব	পাইবে	ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।	২৬—৯
পাথ	পক্ষ	পাথীক পাথ মীনক পানি।	২১২—১৩
পাছু	পশ্চাৎ	অব পাছু তরইতে চাই।	১৫৬—৪
পাঠায়সি	পাঠাও	সন্দেশ না পাঠায়সি।	১৭৭—১
পাড়ব	পাড়িব	লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি।	৭৬—২
পাতল	পাতলা, সূক্ষ্ম	অঙ্গহি লাগল পাতলচীর।	১৩৯—৮
পানি	পান	কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।	১২২—৩
পানি	জল	পানি পীয়ে কিয়ে জাতি বিচারি।	১১১-১২
পানি (পানী)	হস্ত	ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পানি।	১৪৮-১২
পারা	যেন, প্রায়	দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা।	১৫০—১৪
পার	পারে	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।	৩৮—৬
পার *	পারি	যে কিছু কহল তাহা কি বিছুরি পার।	১৩১ নং ১১
পারই †	পারি	লথই না পারই জ্যেঠ কনেঠ।	৫ নং ১০
পারই	পারে	ধরইনা পারই কেহ।	৫১—১০
পারমু	পারিলাম	ঝাঁপন কুপ লথই না পারমু।	১৫৬—১
পারি	পারে	শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি।	৪১—২

* পার—কাব্যবিশারদে এ স্থলে "বিছুরিবার" আছে।

† পারই—কাব্যবিশারদে "পারিয়ে" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
পারিয়ে	পারি	সহই না পারিয়ে চলই না পারি।	২০০—১
পালটব †	ফিরাইব	করে কর বারি বয়ান পালটব।	১৯৮ নং ৮
পালটি	ফিরিয়া, উল্টাইয়া	বিহসি পালটি নেহারি।	১—২
পালটি	পরিবর্ত্তিত হয়	সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা।	৫০—১০
পাশ	রজ্জু, জাল	অপরূপ প্রেম-পাশে তনু গাঁথল।	১৯৬—১১
পাশ	পার্শ্ব, নিকট	পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।	৭৩—১১
পাশরিতে	ভুলিতে	পাশরীতে শরীর হোয় অবসান।	১৯৯—৯
পাহুন	প্রবাসী' (পাষাণ	কান্ত পাহুন কাম দারুণ।	১৭১—১০
পিউ	প্রিয়	আনি দেই মোর পিউ।	১৬৫—১২
পিছারে	পশ্চাদ্ভাগে	হেম মূরতি জনি না চল পিছারে।	৬২—৪
পিছে	পশ্চাৎ	পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি।	১৭৯-১৪
পিণাশ	পিণাক-বাদ্যযন্ত্র	রটতি রবাব মহতীক পিণাশ।	৯৯—৭
পিন্ধাওল	পরাইল	অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল।	১৯৮-১
পিয়া (পিয়)	প্রিয়	হাম নাহি যায়ব সো পিয়া ঠাম।	৫৭—২
পিয়ে	প্রিয়	যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।	৫২—৫
পিয়ারী	প্রিয়তমা	পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু।	১৬৭—৮
পিয়াস	পিপাসা	পাণিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব।	১৪০—১০
পিয়াস	প্রয়াস	সুধা সিন্ধু ত্যজি ক্ষারে পিয়াস।	১২৪—৬
পিয়াসা	প্রয়াসী, পিপাসু	লোমলতাবলী ভুজগী নিশাস পিয়াসা।	১০-৪
পিয়ে (পীয়ে)	পান করিয়া	পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি।	১৭৯-১৪
পিবই	পান করে	চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ।	২১৬—২
পিবইতে	পান করিতে	পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি।	২৬—২
পিবে (পীবে)	পান করে	অধর সুধারস যদি বোহ পীবে।	২৬—১০
পিয়ব	পান করিবে	অধর মধু পিয়ব হামারা।	২০৭—৬
পিরীত	প্রীত	তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।	৫৬—৫
পিশুণ	দুর্জ্জন, ক্রূর	করয়ে পিশুন বচন অবধান।	১৮০—৮
পীঠ	পৃষ্ঠ, আসন (?)	শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ।	৩৩—৬
পীঠ (পিঠ)	পশ্চাদ্দিকে	তহি রতি টীট পীঠ রহু চোরি।	১৪০—৪
পীড়য়ে	পীড়ণ করে	দিনে দিনে বাড়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ।	৩৩-৮
পীব	পান করিব	হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব।	১১১-৬
পীয়লু	পান করিলাম	অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লু।	২১৭-১০

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
পুছই	জিজ্ঞাসা করে	সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার।	৩২—১
পুছইতে	জিজ্ঞাসিতে	পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।	১০৮—৩
পুছব	জিজ্ঞাসা করিবে	কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।	১৮৫-১৩
পুছমো	জিজ্ঞাসা করি	পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।	৬৮—৭
পুছয়ে	জিজ্ঞাসা করে	লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত।	৪০—৪
পুছসি	জিজ্ঞাসা করিতেছ	কি পুছসি অনুভব মোয়।	২১৪—১
পুছারি	জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন	জানসি তব কাহে করসি পুছারি।	৬৮-৩
পুছারে	উপেক্ষা	সো হরি না করু পুছারে।	১১৮—১২
পুড় *	পুড়ে, দগ্ধ হয়	তব হি মন হি মন পুড়।	৯৯ নং ৮
পুণমি (পুণিম)	পূর্ণিমা	পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর।	১৫৫—১
পুতুলি (পুতুলা)	পুত্তলি	আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা।	১৯৪—৩
পুণ	পুণ্য	ফেরি আওলি তুহু পূরবক পুণে।	৬৬—৪
পুন	পুনরায়	বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।	৫১—২
পুন	কিন্তু	সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা।	৫০-১০
পুন	পরে	পহিল বদরী সম পুন নব রঙ্গ।	৩২—৪
পুরুখ	পুরুষ	যো পুরুখ দেখত তা কর ভাগি।	৩৪—৬
পুহপ	পুষ্প	জনু গাঁথনী পুহপ মালা।	১৪—৬
পূজল	পূজা করিল	মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু।	২১৬—৪
পূজসি	পূজা করিতেছ	সে ফুলে পূজসি।	১০৬—১২
পূজহ	পূজা করিও	অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম।	৭৯-২
পূর	পূর্ণ	বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।	৬৮—৯
পূরই	পূরে, পূর্ণ হয়	অসময়ে আশ না পূরই কান।	৮২—৭
পূরব	পূর্ব্ব	ফেরি আওলি তুহু পূরবক পুণে।	৬৬—৪
পূরব	পুরিবে	কতদিনে মনোরথ পূরব মোর।	১৮৫—১৬
পূরব	পূর্ণ হইব	ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান।	২০৭—১৬
পূরল	পূর্ণ হইল	থোরি দরশনে আশা না পূরল।	১৪—৭
পূরাইহ	পুরাইও	জীবন রহিলে পূরাইহ কাম।	৭৩—৬
পেখ	দেখি, দেখিলাম	অনুভব কাহু না পেখ।	২১৪—১৩
পেখন	প্রেক্ষণ, দেখা	ভাল করি পেখন না ভেল।	১৭—১
পেখনু (পেখলু)	দেখিলাম	মাধব পেখনু অপরূপ বালা।	৩২—৬

* পুড়—কাব্যবিশারদে "পুর" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
পেখহ	দেখ	মাধব যাইঞা পেখহ বালা।	১৯২—১
পেখি	দেখিয়া	হিমকর পেখি আনত কর আনন।	১৯৫-৫
পেখি	দেখে	যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি।	১১২—২
পেমিল *	প্রমীলিত	জনু ইন্দীবর পবনে পেমিল।	৩২ নং ১৪
পৈঠব	প্রবেশ করিবে	হৃদয় পৈঠব জনি পহু দিল পাণি।	১৪৩-১৪
পৈঠয়ে	প্রবেশ করে	হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।	৪৫—৭
পৈঠল	প্রবেশ করিল	পৈঠল হিয়া মাহা মোরি।	২৯—৮
পৈঠলি	প্রবেশ করিলি	পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি।	১৪০—২
পোহায়নু	কাটাইলাম	আজু শুভনিশি কি পোহায়নু হাম।	২০৮—৭
পৌগণ্ড	কৌমার অবস্থা	দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।	৯৫—৫
প্রতীত	প্রত্যয়	তব হি প্রতীত নাহি বোলে।	১২২—৯
ফিরায়	ফিরাইতে	লুবুধল লোচন ফিরায় কে পার।	৫৮—৬
ফুকরই	ডাকে	সবজন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই।	২৩-৬
ফুকরই	ফুকরিয়া	ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী।	১৫৩-২
ফুকারি (ফুকরি)	ডাকিয়া, ডাক	বায়স নিয়ড়ে ফুকারি।	১৯৬—৮
ফুগইতে	খুলিতে	কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।	১৩৪-৫
ফুটল	ফুটিল	ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ।	৩৮—৪
ফুয়ল (ফূয়ল)	স্খলিত	ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি।	৭৫-৩
ফুলধারী	পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পবাটিকা (?)	সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুলধারী।	১৬৪—৫
ফুলাএল	ফুটাইল	মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল।	২৭—৫
ফেরি	ঘুরে	অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।	৫০—১১
ফেরি	পুনরায়	ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।	২০—২
ফেরি	ফিরিয়া	আড় বদন তঁহি ফেরি।	২৩—৭
ফেলল	ফেলিল	তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেলল।	২৩—৮
ফেলিলা	ফেলিলে	তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে।	৫৪—১০

* পেমিল—কাব্যবিশারদে "ঠেলল" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি।
ফোয়	ফুৎকার	দেলি মনমথ ফোয়।	৮৪—৮
বঙ্ক	বাঁকা, কুটিল	দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।	১১—৫
বঙ্কা	বক্র	চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।	৭৪—১৩
বঞ্চব	কাটাইব	কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।	১৬৪—১২
বঞ্চল	যাপন করিল	সো নিশি বঞ্চল।	১২২—১২
বঞ্চলি	কাটাইলে	যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ।	১২৩—৬
বড়ি	বড়, অতি	এ বড়ি সাহস তোর।	১১৩—৪
বদলিয়া *	বদল করিয়া	বদলিয়া মাল পুনহি মুঝে দেল।	১০৬নং ১০
বধয়ে	বধ করে	বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ।	৬৬—১০
বনয়ারী †	বনমালী, বনবিহারী (?)	চানূর মরদন তুহু বনয়ারী।	৬৬নং ১
বনাব	রচিব	বেণী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।	২০৬-৫
বনায়ত	বিন্যাস করে	সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।	৫৭—৫
বনায়ল	রচনা করিল	বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।	১৩৫—৫
বন্ধ	বাঁধন	দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ।	৫৫—১০
বন্ধী	বাঁধা, বন্দী (?)	হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধী।	৪০—৬
বন্ধো (১)	বাঁধি (?) বন্দনা করি ?	এ হরি বন্ধো তুয়াপদ নায়।	২১৭—৫
বয়ান	বদন	ততহি বয়ান সুছন্দ।	২—২
বর	সুন্দর	বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।	৩৬—৩
বরকে (২)	কামুকে	বরকে জীবন কয়ল পরাধীন।	১৫৫—১৪
বরখন্তি(য়া)	বৃষ্টি পড়ে	ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।	১৭১—৯
বরজ	ব্রজ	আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ।	৫০—৪
বরিখ	বর্ষ	বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু।	১৭২-১২
বরিখব	বর্ষণ করিবে	শশধর বরিখব আগি।	১৭৪—৫
বরিখয়ে	বর্ষণ করে	বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু।	১৬৬-১২
বরিখে	বর্ষণ করে	অমিয়া বরিখে জনু পুণিম শশী।	১৬—২
বরিষা	বর্ষা	বরিষার ছত্র পিয়া।	২১০—৪

* বদলিয়া—কাব্যবিশারদে "বরিহা" আছে।

† বনয়ারী—কাব্যবিশারদে "বনমালী" আছে।

(১) বন্ধো—অক্ষয় বাবুতে "বন্ধা" আছে ; বন্ধ।

(২) বরকে—"বল্‌কে" পাঠান্তর = বলপূর্ব্বক।

শব্দ।		উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
বরিহা	বর্হ,-ময়ূরপুচ্ছ	বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল।	১৩৪—২
বল করি †	সবলে	বল করি চিত চোরায়ল মোরি।	২১নং ৬
বলব	বলিব	বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।	৫৭—১১
বলিহারী	বলিয়া শেষ করিতে পারে না	বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।	৪১—১
বসই	বসিয়া, বসে	হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।	১০৭-৩
বসায়ল (৩)	বসাইল	সিন্দুর সমীপ বসায়ল মোতি।	৯৩-৬
বহই	বহিয়া	বহই দিবস সব যাব।	১০৪—৮
বহয়ে	বহে	নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল।	১৬৩-১৬
বহল	বহিয়া গেল	বহল সগর নিশ।	১১৯—৯
বহি	বহিয়া, প্রবাহিত হইয়া	নয়নক লোরে বহি যাওত ধরণী।	১১২—৬
বহি	উহা	কত অদভূত বিহি বহি তোহে দেল।	১২-৭
বহি *	বাদে, পরে	দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি।	১২৫নং ১০
বহু	বহে	মণিময় হার, ধার বহু সুরসরি।	২৭—৭
বহু	বহুক	মলয় পবন বহু মন্দা।	২০৯—৮
বহুত	বিস্তর	মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।	২১৯-১৩
বহুরী	বধূ	বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।	১৪২-২
বাঁচব	বাঁচিব, বাঁচিবে	বাঁচব কোন উপাই।	১৮২—১৩
বাঁঝ (কি)	বন্ধ্যা (র) ; ফলহীন	সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।	১৭৪—৯
বাঁটাইনু	বণ্টন করিলাম	যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটাইনু।	২১৭—১
বাঁধয়ে (১)	বাঁধি, বন্ধন করি	তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত।	১১১-৮
বা	বাতাস	বসন লেই ঘন ঘন কর বা।	৬৯—৬
বাউর	বাতুল	তোহারি বিরহ-বেদনে বাউর।	১০৩—৭
বাখানিতে	বর্ণনা করিতে	অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নৌতুন।	২১৪—২
বাজ	বাজে	অবিরত কিঙ্কিনী কঙ্কণ বাজ।	১৪৮—৬
বাজত	বাজে	বাজত দ্রিগিদ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।	১০০-১
বাট	পথ	বিখিণি বিথারিত বাট।	৯০—৭
বাঢ়ই	বাড়াইয়া	বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী।	১৯৫—২

(১) বাধয়ে—সাধারণ নিয়মানুসারে "বাঁধিয়ে" হওয়া উচিত।

* বাধব—বাক্যবিশারদে "বাম্বব" আছে।

(৩) বসায়ল—অক্ষয় বাবুতে "বসায়লি" আছে। বোধ হয় ঠিক নহে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
বাঢ়ত	বাড়ে	যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত।	৫৩—৮
বাঢ়য়ে	বাড়ে	দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ।	৩৩—৮
বাঢ়ল	বাড়িল	অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর।	৩৪—২
বাঢ়াই	বাড়াইয়া	কানুক প্রেম বাঢ়াই।	১৮৩—৬
বাঢ়ায়ল	বাড়াইল	অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।	৩৩—৫
বাঢ়ি	বাড়ে	চান্দ কলা সম দিনে দিনে বাঢ়ি।	৪৯—৮
বাত	বার্ত্তা, কথা	লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত।	৮০—৪
বাদর	মেঘ, বর্ষা	বাদর ডরে শশী বেকত না হোই।	৪০—৪
বাধব *	বাধিব, বাধা দিব	করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া।	১৫৪নং৮
বাধা	যাতনা	বাঢ়ত বিরহক বাধা।	১৬০—২
বান্ধবি	বন্ধন করিবি	দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ।	৫৫—১০
বান্ধয়ে	বাঁধে	কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু উঘারি।	৩৭—১
বান্ধল	বাঁধিল	চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল।	৫—৬
বান্ধলু	বাঁধিলাম	জাগল মনসিজ বান্ধলু চোর।	১৩৪—৬
বারব	বারণ করিব, আটক	, করে কর বারব।	২০৭—৪
বারি	নিবারণ করিয়া	লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।	২৪—৯
বারিজ (বারিজি)	পদ্ম	বারিজি নাশন শীল গুণে শশী উজিয়ার।	১২১—১০
বারে	বারণ করে	দরশন পরশন দ্বয় অনিবারে।	৮০—৯
বালি	বালিকা	বালি বিলাসিনী আকুল কান।	৬১—৩
বাস	আশ্রয়	ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস।	২৫—৮
বাসব †	বুঝিব	নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন।	১৯৮ নং২
বাহুড়াব	তাড়াইবে, ফিরাইবে	বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই।	৮০—২
বিকশল	বিকাশিত হইল	বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে।	৩৮—১০
বিখ	বিষ	বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পুর।	১০৬—৬
বিঘিনি	বিঘ্ন	বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা।	৯১—৮
বিচারলু	বিচার করিলাম	তখনক লঘুগুরু কিছু না বিচারলু।	১৫৬-৩
বিচারি	বিচার করিতেছ	পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি।	১১১-১২
বিছর	বিস্মরণ	যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই।	৪৩-১২
বিছরিয়ে	বিস্মৃত হই	যত বিছরিয়ে।	৪৩—১২
বিছানে	বিস্তারে	ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।	২০৬-৬

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
বিছারি	অন্বেষণ করিয়া (?)	হেরণে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।	৭৫-৯
বিছুরণ	বিস্মরণ	সো কিয়ে বিছুরণ যায়।	২০৩—১৬
বিছুরল	বিস্মৃত হইল	সো অব বিছুরল হামারি অগাগি।	১৮০-৪
বিছুরলি	বিস্মৃত হইলি	তুহু বিছুরলি।	২০১—১০
বিছুরাই †	বিস্মৃত হইয়া	অবধি রহল বিছুরাই।	২০৬ নং ৬
বিছুরি †	বিস্মৃত হইতে	যে কিছু কহল তাহা কি বিছুরি পার।	১৩১ নং ১১
বিজুরী (বিজোরি)	বিদ্যুত	হাসি সুধামুখী না কর বিজোরী।	৯৩-৩
বিথার	বিস্তার (করে ?)	কোকিলকুল কলরব হি বিথার।	১৭০-৩
বিথারল	বিস্তারিত করিল	মালতী মাল বিথারল মোতি।	১০০-১৩
বিথারি	বিস্তারিত করে	কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।	৩৭-১
বিথারিত	বিস্তারিত	বিথিনি বিথারিত বাট।	৯০—৭
বিদগধ	বিদগ্ধ রসিক	নাহ রসিকবর বিদগধ জান।	২০০—৬
বিদারে	বিদীর্ণ করে	কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে।	৭০-১০
বিধুন্তুদ	রাহু	নয়ন কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ।	১৯৫-৭
বিন (বিনহি)	বিনা	সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান।	১৩০-২
বিনি	বিনা	বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়।	৮১—৬
বিনু	বিনা	মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ।	৪৬-১২
বিনে	বিনা	তো বিনে উনমত কান।	৫১—৪
বিপতি	বিপত্তি	বিপতি পড়ল রাধা।	২০৩—১৫
বিবাধ	বন্ধন, নিগ্রহ	হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।	১১১—৯
বিভঙ্গি	ভঙ্গি	ভাঙ্গ বিভঙ্গি বিলাস।	৫—৫
বিমুখে	মুখ ফিরাইয়া	শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।	৮০—১
বিলসই	ইচ্ছা করে, বিলাস করে	সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী।	৩৪-১০
বিলসব	বিলাস করিবে	কা সঞে বিলসব কো কব তাহ।	১৭০—৮
বিলসয়ে	বিলাস করে	বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।	২১২-৩

† বিছুরি পার—কাব্যবিশারদে "বিছুরিবার", আছে ; ভুলিবার

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
বিলাপয়ে	বিলাপ করে	বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।	১১৫—১
বিলোকন	দৃষ্টি	দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।	১১—৫
বিশঙ্কউ	শঙ্কা করি	ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ।	১৪২-১১
বিশরাম (বিসরাম)	বিশ্রাম	তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম।	২৬—৬
বিশেখি	বিশেষ করিয়া	আন কি কহব বিশেখি।	১১৪—৫
বিশেখি	বিশেষি, উৎকৃষ্টতর	গিধিনী শ্রবণ বিশেখি।	৮৫—১২
বিশোয়াস	বিশ্বাস	সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।	১২২—১১
বিসরি	বিস্মরি, ভুলিয়া	তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু।	২১৮—৭
বিসরিত	বিস্মিত	পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা।	১৭০—১৪
বিহরই	বিহার করে	বিহরই নওল কিশোর।	৯৭—৫
বিহসলি	হাসিল	হাসে হেরি বিহসলি থোরি।	২৪-৩
বিহসি	হাসিয়া	বিহসি পালটি নেহারি।	১—২
বিহান	প্রভাত	কোন না দেখত সখি হোত বিহান।	৭৪—৬
বিহি	বিধি	সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।	৯—৫
বিহিপয়ে	বিধাতাই	ভাল মন্দ বিহিপয়ে জানে।	১৯৮ ৮
বীজ	মন্ত্র	তুহু বীজ ইহ কর দান।	১৪২—১৬
বীজু	বীজ	অধর বিম্বসনে দশন দাড়িম্ব বীজু।	২৭—৯
বীজইতে	বীজন করিতে	মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।	১৪৫—৯
বীজকপোর	বীজপুর, গোঁড়ালেবু	সো পুন ভৈগেল বীজকপোর।	৩৪—১
বুঝই	বুঝিয়া	বুঝই না বুঝ ইহ রসরোল।	৪৭—৬
বুঝয়	বুঝিতে	কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি।	৪৩ ৪
বুঝনু (বুঝলু)	বুঝিলাম	অব বুঝনু অবগাহি।	১৫৬—১০
বুঝব	বুঝিবে,	বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।	৭৫—৫
বুঝয়ে	বুঝে	না বুঝয়ে রতি রস রঙ্গ।	৫৯—১১
বুঝলহু	বুঝিলে	বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।	৮২—৯
বুঝাই	বুঝাইয়া	কিয়ে হাম আথরে কহলু বুঝাই।	১৪০—৫
বুঝায়নু	বুঝাইলাম	যতনহি কত পরকারে বুঝায়নু।	১১৬—৮
বুঝল (১)	বুঝিলাম	পহিলহি না বুঝল এত সব বোল।	১১১—১
বুঝিয়ে	বুঝি	ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান।	৫৭—৪

(১) বুঝল—বোধ হয় "বুঝলু" হইবে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
বুতায়ব	নিভাইব	করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।	১১১—১১
বুলে	বেড়ায়	গোপ গোপী নাহি বুলে।	১৬৩—৬
বেকত	ব্যক্ত, অনাবৃত	বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে।	৩৯—২
বেকতয়	ব্যক্ত করে	বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ।	৫৮—৪
বেজনসায়ে †	ব্যজনাভিপ্রায়ে	বেজনসায়ে যব বসন উতারল।	২০০ নং ২
বেঢ়ল	বেষ্টিত করিল	জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল।	২—১
বেভার	বাহির (?)	কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।	১৯৯—১৫
বেয়াজ	সুদ	মূল বিনু পরধনে মাগয়ে বেয়াজ।	৪৬—১২
বেয়াধি	ব্যাধি, পীড়া	যা কর বেয়াধি পরাধীন ঔখদি।	২০২—৯
বেরি	বার	নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।	৩২—২
বেরি	বাহিরে	বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।	১৪২—২
বেরি	বেলা, সময়	মরণক বেরি কোই না পুছই।	২১৭—৩
বেরিএক	বারেক	বেরি এক কর ধনী মুদিত নয়ান।	৬৪-৭
বেলি	বেলা	যব গোধুলি সময় বেলি।	১৪—১
বেহারিব †	বিহার করিব	কুঞ্জহি রাস বেহারিব।	২০৮ নং ১১
বৈঠত	বসে	ধরণী ধরিয়া ধনী কত বেরি বৈঠত।	১৭৫—৪
বৈঠনু	বসিলাম	উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ।	১৩৯—১৪
বৈঠবি	বসিবে	পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।	৫২—৩
বৈঠলি	বসিল	বৈঠলি শয়ন সমীপে সুবদনী।	৮৪—৫
বৈঠায়ব	বসাইবে	কতদিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।	১৮৫—১৫
বৈঠায়ল	বসাইল	পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা।	২২-৮
বৈঠে	বসে, বাস করে	যা কর মরমে বৈঠে বরনারী।	১১০—৯
বৈসায়	বসায়	কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।	৬২-৫
বৈসায়ল	বসাইল	করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।	১২৮—১
বৈসে	বসে	যেথানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।	১৬২—১

তৃতীয় ভাগের সূচী।

অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
রসিকতা	ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।	৪৭—৩
বুঝাইয়া	নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি।	৭৯-১০
বল	না বোল বচন আন।	১০৬—১
বলে	হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।	৬১-১
বাক্য	প্রতীত নাহি বোলে।	১২২—৯
বল	কহত কহত সখি বোলত বোলত রে।	১৮৬—৩
বলে, বলিয়া	বোলত মধুরিম বাণী।	১২২—৫
বক্তা (?) নাগর	বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।	৭৯—৭
বলিব	ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।	৫৩—১
বলিবি	নহি নহি বোলবি গদগদ ভাষ।	৫২-৮
বল, বলিও	এ সখি না বোলহ আন।	৫৮—১
ও, ঐ জন	অধর সুধারস যদি বোহ পীবে।	২৬-১০
হইয়াছে	তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।	১৫৪—৩
হইয়া	কানু নিঠুর ভৈ গেল।	৯০ নং ৬
ভগ্ন	হা হা শম্ভু ভগন ভৈ গেল।	৬৯—৪
ভজিব, ভজনা করিব	তোহে ভজব কোন বেলা।	২১৯-৪
ভজিলাম	বড় অভিলাষে ভজিনু বর নাহ।	২০৫ নং ৩
কহে	ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী।	১৩-৭
কহে	ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী।	১১১—১১
কহে	ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতী	২৮-৫
কহে	ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতীক বচনে।	৩৮—৯

অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
কহে	ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।	৫৩—১
কহে	ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি।	২০৩—১৪
হই	হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে।	১১০—৮
ভরে	ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই।	৩৫—২
ভ্রম	নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে।	১০—৫
ভড়ং	আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।	১৪৪—৯
ভ্রমিব	দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।	১৯৯—৬
ভরিল	রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার।	৭৩—২
পূর্ণ	আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি।	১৭—৬
ভরে	দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু।	২১১—৮
ভস্ম	অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক।	১৫৭—১২
শোভাপায়	তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই।	২০৪—৫
ভাষা, কথা	বিদ্যাপতি কহ মিছ নাহি ভাখি।	১৯৯ নং ১১
ভাষী, বক্তা (?)	বিদ্যাপতি কহ ভাখী।	৫১—১১
ভাগুক; দূর হোক	ভাগউ সব দুঃখ মিলত মুরারী।	১৮৬—২
ভাগ্য	যো পুরুখ দেখত তা কর ভাগি।	৩৪—৬
ভাগ্যবান	যাগ শত জাগই সো পাওয়ে বহুভাগী।	৭—২
ভাগ্যে	ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে।	২০৫—১০
ভ্রূ	ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।	৩৮—৭
ভাব, অনুরাগ	ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।	৫—৫
প্রকাশ করে	ভাঙবি ভঙ্গি বিলাস।	৭ নং ৫
ভাঙ্গে	লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর।	১২৮—১০
ভাঙ্গিল	পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ।	৯৪—১৪
ভাণ্ডার	জানল মদন ভাড়ারক চোরি।	১৮১ নং ১০
প্রতীয়মান,প্রকাশে	চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ।	৩৭—৫

ভাওই—অক্ষয় বাবুতে "ভাবই" আছে; ভাবি।"

ভাখী—তর্করত্নের অর্থ দেওয়া হইল।

ভাঙবি—কাব্যবিশারদের এই লাইন "ভাঙ-বিভঙ্গী বিলাস।"

ভাড়ার—কাব্যবিশারদে "ভাণ্ডার।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
ভাণ	ভাব	ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ।	৭৪—৫
ভাণ	কহে	সো শুন কলেবর কবি বিদ্যাপতি ভাণ।	৪৯—৪
ভাণত	রূপ ধরিয়া (?) ভাণকরে	আওত মানবী ভাণত লোলী।	৯২—২
ভাণে	সদৃশ হয়, অনুকরণ করে	গতি গজরাজক ভাণে।	২৭—২
ভাণে	কহে	সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।	৩৯—১১
ভাদর	ভাদ্র	এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।	১৭১—৬
ভাবই	ভাবে	রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই।	১০৫—২
ভাবিনী	ভাবনাযুক্তা	কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।	১৫৩—১
ভারি	ভার	পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি।	১০২—২
ভাল	কপাল	ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু।	১৫৭—৬
ভাষ	ভাষে, কহে	নাগর মধুরিম ভাষ।	১২৫—১
ভিখ	ভিক্ষা	শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।	১৩০—৫
ভিগি	ভিজিয়া	মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল।	৭৮—১০
ভিত (ভীত)	ভিত্তি, দেয়াল	লিখইতে 'কালি' ভিত ভরি গেল।	১৭৮—৪
ভিন	ভিন্ন	কুশুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।	৬৯—১
ভীত	ভীতি, ভয়	ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত।	৭৪—১০
ভীর	ভীরু, ভীত	হাম অবলা অতি রতি রণভীর।	৮৩—৬
ভুঁজইতে	ভুঞ্জিতে	সোফল ভুঁজইতে চাই।	১৮৩—১০
ভুখলি	কৃশা	রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি।	২০২—৫
ভুঞ্জই	ভোগ করে	আপন করম-দোষে আপহি ভুঞ্জই।	১৮৩—১৩
ভুল	ভুলে, ভুলিল	তবহু পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল।	৭১—৬
ভুলল	ভুলিল	ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর।	১৬—৯
ভুলহ	ভুলিও (?)	ভুলহ জনি পাঁচ বান।	৫৯—৬
ভুলালি	ভুলাইল	সব যোনী পালটি ভুলালি।	৯২—১
ভুখণ	ভুষণ	কুশভুজভূখণ ক্ষিতি-তলে মেল।	১৫৪—৮
ভেজল *	পাঠাইল	ভেজল অব জগজন অনুলেহ।	১৪৩নং১২
ভেট	সাক্ষাৎকার	বালা শৈশব তারুণ ভেট।	৩৬—১
ভেটনু	সাক্ষাৎ করিলাম	মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।	৩৯—৫
ভেদ	পার্থক্য	চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।	৯৩—৯
ভেদ	বিদীর্ণ	কি কহব খেদ, ভেদ জনু অন্তর।	১৯৩—১২

* ভেজল——কাব্যবিশারদে "তেজল" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
ভেল (ভেলা,ভেলি)	হইল	শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা।	৩২—৭
ভৈ	হইয়া	দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।	৩৩—৩
ভোখিল	বুবুক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত	তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর।	৫৯—৪
ভোর	আচ্ছন্ন	বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর।	৪৫—৬
ভোল	ভুল, বিহ্বল	রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল।	১১১—২
ভ্রমই	ভ্রমণ করি	ভেলি মানস, ভ্রমই দশদিশ।	৮৪—৭
ভ্রমি	ঘুরিয়া	ভ্রমি দেই তছু কোর।	১৬৬—১১
মগন	মগ্ন	গগন মগন ভেল চন্দা।	১১৯—১০
মঝু	আমার	আজু মঝু শুভদিন ভেলা।	২২—১
মতঙ্গজ	হস্তী	সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।	৫৩—৯
মতি (মোতি)	মুক্তা	মোতিম বদ্ধ মৌলী নহ ইন্দু	১৫৭—৫
মতি বামা †	বিবেচনাহীন	হাম অবলা মতিবামা।	১৪০নং,৭
মদনলতা	ধুতুরাগাছ	মদন লতা জনু দংশল হাতী।	৭১—৪
মধুরাই †	মাধুর্য্যযুক্ত	কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই।	২০৩নং১১
মধুরি	মাধুরীযুক্ত	অধর মধুরি নিরমানে।	১২০—৪
মধুরিম	মাধুরীময়	নাগর মধুরিম ভাষ।	১২৫—১
মধ্যত	মধ্যে, মধ্য হইতে	রহসি পসারল তাহি মধ্যত পাঁচ বান।	১৩১—১৩
মনকাম	মনস্কামনা	নটবরশেখর সাধি চলল মনকাম।	১৪৩—১২
মন্দা	মন্দজন, দুষ্ট	অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।	৭০—৭
মনমথ	মন্মথ, কাম	মনমথে হেরি উজিয়ার।	৯০—৬
(মতি)ময়	মে-তে, ৭মী বাচক	যুবতী মতি ময় মেলি।	২১৭—৯
মরকত স্থলী	মরকতমণি (বর্ণ)ময় স্থান,	মরকতস্থলী শুতলি আছলি।	১৯০—৪
মরদন	মর্দ্দন	চানুর মরদন তুহু বনয়ারী।	৭৮—৫
মরম	মর্ম্ম	মরমী জনার মরমে বাজে।	১৫০—১৬
মরমী	মর্ম্মগ্রাহী	মরমী জনা।	১৫০—১৬
মরিযাদ	মর্য্যাদা	রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।	৭৯—৫
মহত	মহত্ত্ব,মান	হঠ না করহ মহত রাখ মোর।	১১৬—২
মহতীক	বীণা বিশেষ	রটতি রবাব মহতীক পিণাশ।	৯৯—৭
মাই	মাগো	আজুক লাজ তোঁহে কি কহব মাই।	১৩৯—৫
মাগই	মাগে, চাহে	সেব কোই মাগই হেরইতে তুয়াপদ।	২১৮—৩

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
•মাগব	চাহিবে	রভস মাগব পিয়া যব হি	২০৭—১
মাগয়ে	চাহে	মূল বিনু পরধনে মাগয়ে বেয়াজ।	৪৬—১২
মাগিও	চাহিও•	অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে।	১৬২—৮
মাগিতে	চাহিতে	অনুমতি মাগিতে বরবিধুবদনী।	১৫৩—৩
মাঝ (মাঝার)	মাঝে•	সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।	৫০—৩
মাঝ (মাঝা)	কটি	বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ।	৩৩—৪
মাঝারি	কটি	কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি।	১৫—১
মাতনু	মাতিলাম	রমণী রসরঙ্গে মাতনু।	২১৯—৩
মাতল	মাতাল	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।	৩৮—৬
মাতি	মত্ত করিয়া, মোহিত করে	বিদ্যাপতি মতি মাতি।	৯৭—১৫
মাতি	মত্ত	মধুর কুশুম মধু মাতি।	৯৮—২
মাতিয়া	মত্ত	মুকুল মধু মাতিয়া নব কোকিল।	৯৭—৮
মাথ	মাথা	সগর বচন কহু নত করু মাথ।	৪১—৮
মাথুর	মথুরা	ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।	১৬৩—৪
মাদ	দাম, মালা	করীকরে সোঁপল মালতীমাদ।	৭৮—৮
•মাধবি	বৈশাখে	মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।	৮৩—৯
মাধাই	মাধব	মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।	১৫৯—২
মান	মানে	কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান।	৬৭—৪
মানই	মানে	ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত।	৭৪—১০
মানইতে *	স্বীকার করিতে	মানইতে নায়র দূরে রহু লাজ।	৬১নং—৩
মাননু	মানিলাম	জীবন যৌবন সফল করি মাননু।	২০৮—১৩
মানবি	মানিবে	শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।	৪৪—২
মানয়ে	মানে	কছু নাহি মানয়ে বাধা।	৮৯—২
মানল	মানিল	নিজমদে মদন পরাভব মানল।	১৪৯—১১
মানায়ত	স্বীকার করাইল	মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।	১৪৮—৫
মানুখ	মানুষ	মধুসম বচন প্রেমসম মানুখ।	১৫৬—৫
মাল	মালা	মালতী মাল বিথারল মোতি।	১০০—১৩
মাহ	মাস	এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।	১৭১—৬
মাহল†	মধ্য, কটি	কণক কদলী পর সিংহস মাহল।	১নং ৬

* মানইতে——কাব্যবিশারদে "মানায়ত" আছে। ১৪৮—

† মাহল—কাব্যবিশারদে "সিংহ সমাহল"।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
মাহা (মাহ)	মধ্যে	পৈঠল হিয়া মাহা মোরি।	২৯—৮
মিছ †	মিথ্যা	বিদ্যাপতি কহ মিছ নাহি ভাখী।	১৯৯নং১১
মিটায়ব	মিটাইবে, ঘুচাইবে	কৈছে মিটায়ব মান ৮	১১৭—৬
মিটি	মৃত্তিকা	অলকা তিলক মিটি গেল হি দূর।	৬৮—১০
মিঠ	মিষ্ট	কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।	৭২—৭
মিত	মিত্র	সুত মিত রমণী সমাজে।	২১৮—৬
মিল	মিলিও	তব হি না মিল হরি সঙ্গে।	১২৩—২
মিলত	মিলিতেছে	ভাগউ সব দুঃখ মিলত মুরারি।	১৮৬—২
মিলব	মিলিব	কেমনে মিলব ধনী সুপুরুখ সঙ্গ।	৫৬ - ৪
মিলব	মিলিবে	পুন কি মিলব মোয়।	৪—৬
মিলয়ে	মিলে	মিলয়ে নব নব ভাতি।	৯৭—১৩
মিলল	মিলিল	ঐছনে মিলল কুঞ্জকি মাঝ।	৯৪—১১
মিলহ	মিলিত হও	অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।	১১০—৫
মিলায়ত	মিলাইয়া	দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত।	১৮-১
মিলায়ব	মিলাইব	ধৈরজ ধরহু মিলায়ব আন।	৩৭—৮
মিলায়ল	মিলাইল	কতনা যতনে বিধি আনি মিলায়ল।	২৬—১২
মিলু	মিলে, মিলিয়াছে	জনু যমুনা মিলু গঙ্গ-তরঙ্গ।	২১৫—১২
মুকুতা	মুক্তা	দশন মুকুতা পাঁতি।	১৮—১
মুকুলি	মুকুল	হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।	৩৫-৭
মুকুলিত	অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত	মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।	৮৩—৯
মুখানি	মুখখানি	হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া।	২১৩ ৫
মুগধ	মুগ্ধ, অবোধ	তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী।	৪৩ ৩
মুগধিনী	মুগ্ধা	শুন শুন মুগধিনী মঝু উপদেশ।	৫৫—১
মুঝে	আমাকে	মুঝে হানল নয়ন বাণে।	১৫—৪
মুঞি	আমি	মুঞি অতি বালি সো আরত নাহ।	৭৩-১০
মুঞ্চসি	ত্যাগ করিতেছ	গিরিসম গরুঅ মান নাহি মুঞ্চসি।	১২০-৯
মুড়	মস্তক	আপন করে হাম মুড় মুড়ায়মু।	১৮৩—৫
মুড়ায়মু	মুণ্ডণ করিলাম	মুড় মুড়ায়মু।	১৮৩—৫
মুদই	মুদ্রিত করে	সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।	৭৪—১১
মুদব	বুজিব	ও রসে পূরব হামি মুদব নয়ান।	২০৭—১৬
মুদয়ে	ঢাকে	শ্রবণে মুদয়ে দুইপাণি।	১১৬—১১

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
মুদরি	খুলিয়া	করসঞ্চে কঙ্কণ মুদরি।	৯০—১
মুদল	ঢাকিল	মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে।	৮০—১০
মুদি	মুদ্রিত হইয়া	কমল কোরক জলে মুদি রহু।	৮—৮
মুনল	মুদ্রিত রহিল	মুনল মুখ অরবিন্দা।	১২০—২
মুনি	মুদি, ম্লান হইয়া	মুনি গেল কুমুদিনী।	১২০—১
মুহির	কন্দর্প	মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে।	৮০—১০
মূরখ	মূর্খ	তুহুসম মূরখ জগতে নাহি আন।	১২৪—৪
মূরছন	মূর্চ্ছন	চেতন মূরছন বুঝই না পারি।	১৯১—৯
মূরছি	মূর্চ্ছিত হইয়া	হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী।	১৫৩-৪
মূরছিত	মূর্চ্ছিত	সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত।	১৫৪-১২
মূরতি	মূর্ত্তি	ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি।	৮৮ ১১
মূল	মূল্য	দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল।	৫৩—৬
মূল	আসল	লাভক লাগি মূল ডুবি গেল।	১১৯—৬
মৃগঙ্কা	মৃগাঙ্ক, চন্দ্র	দশগুণ দহই মৃগঙ্কা।	১৯২—৭
মেরুল*	?	মেরুল মিলায়ে দিলহি ধনকোটি।	২৪৭ নং ২
মেল	মিলিত হয়, মিলিল	কুশভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল।	১৫৪—৮
মেল (মেল্লি)	মিলন	বিদ্যাপতি কহে হবে পুন মেল।	১৮৪—৮
মেলি	মিলিয়া	সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।	৫৭—৫
মেহ	মেঘ	মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা।	২২—৪
মো	আমার	তৈখনে হরব মো চেতনে।	২০৭—৭
মোই	আমাতে, আমার	সে সব স্বপন হোয়ল মোই।	৭২—৬
মোই	আমাকে	অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।	১৭৯—১১
মো	আমাকে	মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।	১৫১—৭
মো*	আমি (?)	মো ইছে কি সহত জীবক শাতি।	১৮০ নং ৭
মোছল	মুছিল	বদন মোছল পরচুর।	২২—৫
মোড়	ময়ূর, মস্তক	তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড়।	৪৪—১২
মোড়ই	মোড়ে	করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।	৬৪—৫
মোড়বি	ফিরাইবি	হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম।	৫২ টীকা

* মেরুল—কাব্যবিশারদে এই পংক্তি "করে ধরইতে কত কঙ্ক না কোটি।"

মে　৭মী বাচক, যথা,—"অঙ্গমে"　২০৬—৫

ময়ে　৭মী বাচক, যথা,—"রাজসম্পদময়ে"　২০৪—৭

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
মোড়লি	মর্দ্দন করিলে	রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি।	১৮২—১২
মোড়সি	ফিরাইতেছ	ইথে কাহে ধনী তুহু মোড়সি মুখ।	৬৪—১০
মোড়ি	ফিরাইয়া	উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ।	১৫৯—১৪
মোড়ি	মর্দ্দন করিয়া	কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি।	১৮২—৬
মোতিম (মোতি)	মুক্তা	নাসা মোতিম গীমক হার।	১৩৪—৩
মোদিত	হৃষ্ট	মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।	১৭১—১২
মোরি (মোর)	মৌলী, খোঁপা	জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল।	২—১
মোয়	আমার	ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়।	১০৮-৬
মোয়	আমাকে	পুন কি মিলব মোয়।	৪—৬
মোহে	আমার	ঐছে উপজল মোহে।	১৯০—১১
মোহে	আমাকে	নাকর নাকর সখি মোহে অনুরোধে।	৬৯—৯
মোহে	আমাতে	আপন ভাব মোহে অনুভাবি।	১৪৪—৩
মৌনী*	চুপ	মৌনী করবি পহু করইতে বাণী।	২৯নং৬
মৌলী	কিরীট	মৌলী রসাল মুকুল ভেল তায়।	৯৫—৯
	যাহার	কুলজা রীতি ছোড়লু যছু লাগি।	১৮০—৩
যদু †	যদি	আপন দিব তব যদু কছু জান।	২০৩ নং ৮
যব	যখন	বালাজন সঞে যব রহই।	৩৯—৩
যব	যাবৎ	এ সখি যব রহুঁ জীব।	১১১—৫
যহুঁক	যাহার	যহুঁক বিরহ ডরে উরে হার না দেলা।	১৭৫—১২
যাঁহা	যেখানে	যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।	২৯—৫
যাক (জাক)	যাহার	যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।	১০২—৭
যাকর	যাহার	যাকর মরমে বৈঠে বরনারী।	১১০—৯
যাই	যায় (?)	যত বিছুরিয়ে তত বিছুর না যাই।	৪৩—১২
যাইঞা	যাইয়া	মাধব যাইঞা পেখহ বালা।	১৯২—১
যাইহ	যাইও	না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।	৬৬—৩
যাওত	যায়	বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে।	৩৮—১০
যাওব	যাইব	হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম।	৫৭—২
যাওবি	যাইবি	যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।	৫৫—৫

মৌনি করবি—কাব্যবিশারদে এ পংক্তি "মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
যাঙ (১)	যাই	তোহারি পিরিতক যাঙ বলিহারি।	২০৮—২
যাতা	যাইতেছে	কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।	৪৪—৬
যাপই	যাপন করিয়া	যুগশত যাপই সো পাওয়ে।	৭ টীকা
যাবক	অলক্তক	চরণে যাবক হৃদয় পাবক।	৪—১
যামুন	যমুনা	যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ।	১৪৯—১৫
যায়ব (যাওব)	যাইবে	ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব।	১০৪—৯
যায়ব	যাই (ব)	তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত।	১৭৯—১০
যায়ল	যাইল	লাজে না যায়ল কঠিন জীব।	১৪১—১২
যাব	যাইবে	বহই দিবস সব যাব।	১০৪—৮
যাসি	যাইতেছ	কাহে মোহে সন্তাসি না যাসি।	৮—৫
যাহ	যাও	এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।	৭৩—৯
যৈছন	যেরূপ	যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত।	৫৩—৮
যৈছে (যৈসে)	যেরূপ	যৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত।	৪০—১০
যো	যে	যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি।	৩৪—৬
যোই	যাহা	যোই করল সোই নাগর রাজ	৬৭—৮
যোঁথল †	প্রীতিযুক্ত ?	যোথল সকল মহীতল গেহ	১০৬ নং ৫
যোনী	প্রাণী	সব যোনী পালটি ভুলালি।	৯২—১
যোয়	যে, যাহাকে	ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়	৯৩—১

যে—৭মী বাচক ; যথা,—"ধরণীয়ে চাঁদ।"

য়া—কথার মাত্রা ; যথা,—"রাতিয়া" "হাতিয়া।"

রঙ্গ	রমণীয়	রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।	৬৬—১
রঙ্গ		চৌরী পিরিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ।	৫০—২
রচয়ে	রচনা করে	রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।	৯৯—৫
রচহ	রচনা কর, স্থির কর	রচহ সজনি অব কি করি উপায়।	১৯৯—১২
	রঞ্জিত করে	নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই।	৫০—৪
রটই	বাজে	রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিনী রটই।	৯৯—৪
রটতহি	রব করে	অনুখণ রাধা রাধা রটতহি।	১৫৯—১০

(১) যাঙ—অক্ষয় বাবুতে "যাও" আছে।

† যোথল—তর্করত্নের এ কথাটার ব্যাখ্যা গবেষণা পূর্ণ। ১০৬ নং ৫ টীকা দ্রষ্টব্য। কাব্যবিশারদে "যো থল" দুটা শব্দ ; অর্থ সোজা—"যে থল"।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
রটতি	বাজে	রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।	৯৯—৭
রতন	রত্ন	বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি।	৭৫—৪
রবয়ে	রব করে	কিঙ্কিনী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।	২১৬—৭
রবাব	বাদ্য যন্ত্র বিশেষ	রটতি রবাব মহতীক পিণাশ।	৯৯—৭
রভস	রহস্য	কেলি রভস যব শুনে।	৩৯—৭
রভস	রতি, আনন্দ	রভস সময়ে পুন দেয়বি ভঙ্গ॥	৫২—১০
রভস	ঔৎসুক্য, আবেশ	রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা।	৪৩—৮
রমইতে	রমণ করিতে ?	নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান।	১৪৪—৮
রময়ে	রমণ করে, সুখিত করে	রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে।	২১২—২
রমহ	বিহার কর	লহু লহু রমহ পরিজন পাশ।	৭৬—৮
রমি	বিহার করিয়া	সবহু কুসুমে রমি না তেজই।	১৬৭—১১
রয়নী (রয়না)	রজনী	রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।	৯১—১
রসাল	সরস	তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরিতি রসাল।	১৩২—৭
রসিয়া	রসিক	অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।	২০৬—১৩
রহ	রহে	অতএ সে দুঃখ রহ।	১৮—৩
রহই	রহে	বালা জন সঞে যব রহই।	৩৯—৩
রহব	রহিবে	কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর।	১৬৭—১
রহবি	রহিবি	দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ।	৫৫—৬
রহয়ে	রহে	মুদি রহয়ে দুনয়ান।	১৭৪—১৩
রহল (রহলা) *	রহিল	চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা।	১৫ নং ১০
রহলুঁ (রহনু)	রহিলাম	শুতি রহলুঁ মুখে আঁচল ঝাঁপাই।	১৩২—১৪
রহসি	নির্জ্জনে	কত পরবোধি না মানে রহসি।	১০৪—৩
রহু	রহে	কমল কোরক জলে মুদি রহু।	৮—৮
রহু	রহুক	চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর।	১৫—৫
রহু	রহ	তিল আধ মুদি রহু দুনয়ান।	৮১—৯
রাখই	রাখে	রাখই আমার জীউ।	১৬৫—১২
রাখত	রাখে	তৈ ধনী রাখত পরাণে।	১৭৭—১০
রাখনু	রাখিলাম	লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু।	২১৪—১০
রাখব	রাখিবে	জীউ নিকসব যব রাখব কোই।	৫৬—১২
রাখবি	রাখিবি	রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি।	১৪৯—৬
রাখয়ে	রাখে	রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার।	১৯৯—১৬

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
রাখল	রাখিল	পুর রমণীগণ রাখল বারি।	১৭৯—৬
রাগী *	অনুরাগী	কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিনী হোয়।	১৫ নং ৭
রাজ	বিরাজ করে	ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।	৯৮—১৩
রাজ	রাগ	বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।	৫৫—৪
(যুব)রাজ *	শ্রেষ্ঠ	আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ।	১১১ নং ১০
রাতা	রক্তবর্ণ	নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।	১৯—৩
রাতিয়া	রাত্রি	হরি বিনে দিন রাতিয়া।	১৭২—৪
রাব	রব	শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।	১১—৯
রীত	রীতি	ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।	৭৭—৭
রুখলি	রুক্ষ	রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি।	২০২—৫
রুচি	শোভা	নাল বিনা রুচি পায়।	২৭—৬
রেহা †	স্নেহ	দুলহ নব রেহা	২০৫ নং ৫
রেহা	রেখা	নবজলধর বিজুরী রেহা।	১৪—৩
রোই	রোদনকরে	ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার।	২০—৩
রোখ	রোষ	রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।	১৫২—৭
রোখল	রাগিল	তব কাহে রোখল কান।	১৩১—১১
রোদিতি	রোদন করে	রোদিতি পিঞ্জর শুকে।	১৬৩—৩
রোপব	রোপন করিব	কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।	২০৬—৭
রোয়	রোদন করে	পথ নিরখিয়ে রোয়।	১০৪—২
রোয়ই	রোদন করে	চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই।	১৮৩—৭
রোয়ত	রোদন করে	ফুকরই রোয়ত ঝরঝর নয়নী।	১৫৩—২
রোয়ল	রোপিল, স্থাপিল	রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম।	৪০—৮
রোয়সি	রোদন করিতেছ	রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই।	১৫২—১২
রোয়ে	রোদন করে	মুখশশীভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার।	২০—৯
রোল	অব্যক্তধ্বনি	বুঝই না বুঝ ইহ রসরোল।	৪৭—৬
লইঞা	লইয়া	এ সখি লইঞা না যাহ।	৭৩ টীকা
লখই	লক্ষ্য করিতে, বুঝিতে	লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ।	৩৬—২
লখি	লক্ষ্য	তুয়া কুচ কুম্ভ লখি দেই।	১০৫—৫

* যুবরাজ—কাব্যবিশারদে "ব্রজরাজ" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
লখি	লক্ষ্য করি, দেখি	লাখ লখিমীচয় লখি না লখি।	১১৪—৬
লখিতে	লক্ষ্য করিতে	তুরিতে আওলি লখিতে নারিল।	৫৪—১১
লগ	নিকট	লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।	৮০—৫
লছিমা (লখিমি, লছমী)	লক্ষ্মী	লছিমা দেবী পরমাণে।	২৯—২
লব	লইবে	হারে হরি লব মন।	১৭—১০
লহু	লঘু,মৃদু	বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।	৩১—৩
লাখ	লক্ষ	লাখ বয়ান বিহি না দিল হামার।	১২৭—১০
লাগ	লাগে	গোপত মদনশর কাহে না লাগ।	২৫—৬
লাগত	লাগে	ভ্রমরবধ পাপ লাগত কাহে।	২৬—৮
লাগয়ে	লাগে, লাগিবে	তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়।	৮২—২
লাগল	লগ্ন হইল,	পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি।	১২৬—১৪
লাগি	লগ্ন	তিতিল বসন তনু লাগি।	২১—১
লাগি	জন্য	মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।	৩৯—৫
লাগে	জন্য	হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে।	১১০—৮
লাজাওলি †	লজ্জিত হইল ?	লাজে লাজাওলি গৌরী	২০০ নং ২
লিখই	লেখে	পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই।	১৫৫—৭
লিখইতে	লিখিতে	ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলী ছীন।	১৫৪—১০
লিখিহ	লিখিও	সেথানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি।	১৬২—২
লিখু	লেখে	করনখে লিখু মহী।	১৯৪—৮
লিহে	লয়	নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।	১৬২—৫
লুকাওয়ে	লুকায়	বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ।	৫৮—৪
লুকাওল	লুকাইল	সরমহি লুকাওল মাধব বুকে।	৬২—৮
লুকায়লি	লুকাইল	আধ লুকায়লি আধ উদাস।	২৫—৩
লুটয়ে (লুঠয়ে)	লোটে	পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস।	১০২—৬
লুটল (লুঠল)	লুণ্ঠন করিল	কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার।	৬৫—৪
লুঠত	লুণ্ঠিত হয়	সোই লুঠত মহী ঠামে।	১৭৭—৬
লুবধ	লুব্ধ	সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ।	৬৭—১২
লুবধাই	লুব্ধ (মুগ্ধ) হইয়া	আপন গুণ লুবধাই।	১৫৯—৪
লুবুধল	লুব্ধ হইল	তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান।	৫৮—২
লুবুধি	লুব্ধ হইয়া ?	তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয়।	১৮৮—৮
লেই	লইয়া	মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।	৩১—৫

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
লেই *	লয়	আবেশে হিয়ার মাঝারে লেই।	৫৬ নং ৪
লেই	লও ?	ত্রিভুবন ভরি যশো লেই।	১০৫—৭
লেও	লইও	বলে নাহি লেও ত জীবন হামার।	৮৩—৪
লেখি	লেখে	অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি।	১১২—১
লেপল	লেপন করিল	সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর।	১২৮—২
লেয়	লয়, লইবে	যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।	৫২—৭
লেয়ব	লইবে	কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।	২০১—৩
লেয়ল	লইল	সব রস লেয়ল রসিক মুরারি।	৬৯—৮
লেহ (লেহা)	স্নেহ	অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা।	২০—১
লোচন কোণা	নেত্রপ্রান্ত, কটাক্ষ	হুলহ লোচন কোণা।	১৫—২
লোটায়ল	লুণ্ঠিত হইল	ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ।	১৫২—২
লোটি	লুণ্ঠিত হয়	কনক পুতলী যৈছে অবনীয়ে লোটি।	১৯৪—১৪
লোভাই	লুব্ধ করে ? লোভে	তা কর বচন লোভাই।	১৮৩—৪
লোর	অশ্রু	"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।	৬৩—৫
লোলী	বিদ্যুৎ, লক্ষ্মী	আওত মানবী ভাগত লোলী।	৯২—২

ল—ক্রিয়ার পর—অতীত কাল সূচক। যথা,—"সাজল" "মাতল"।

লু (লুঁ, নু)-ক্রিয়ার পর—উত্তম পুরুষ বাচক। যথা,—"কহলুঁ" "দেখলু"।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
শকতি	শক্তি	শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি।	১৯২—৮
শবদ	শব্দ	ইহ সব শব্দ পশিল যব শ্রবণে।	১৫৩—৭
শমতি (সমতি)*	শমতা	না দেই শমতি রহল বদন চাই।	১৩৮ নং ২
শাঙন (সাঙন)	শ্রাবণ	শাঙন ঘন সম ঝরু হুনয়ান।	৪৩—৫
শাঙর (সাঙর)	শ্যামল	শাঙর চিকুর ভার।	১২—২
শাতি	শান্তি	রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।	৭১—৩
শারদ	শরৎ, শারদীয়	কাম পুজল যৈছে শারদ চন্দ।	২—৪
শাশ	শাশুড়ি	দারুণ শাশ রহল তঁহি জাগি।	১২৬—১২
শাস (শাসা)	শ্বাস	তৈখনে ক্ষীণ ভেল শাসা।	১৮৯—৫
শিখায়ব	শিখাইব	হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ।	৫৫—২
শিখায়ব	শিখাইবে	কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ।	৫২ টীকা

* লেই——কাব্যবিশারদে "লই"।

* শমতি——কাব্যবিশারদে "সমতি" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
শিখায়ল	শিখাইল	নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচবান।	৮৩—২
শিঙলী	শীমূল, শাল্মলী	চন্দন ভরমে শিঙলী আলিঙ্গনু।	১১৮—৩
শুক (বসন)	বস্ত্রাঞ্চল	তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি	৩৪—৫
শুকায়ল (সুখায়ল)	শুকাইল, শুকায়	সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুকায়ল।	১৮৩—১
শুতলি	শয়ন করিয়া	মরকতস্থলী শুতলি আছলি।	১৯০—৪
শুতলু	শয়ন করিলাম	স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ।	১৩২—১২
শুতায়ল	শোয়াইল	সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।	৬৪—৩
শুতি	শুইয়া	শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই।	১৩২—১৪
শুতিয়া	শুইয়া	একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।	১৩৩—৯
শুনই	শুনে	যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত।	৪০—১০
শুনই	শুনিয়া	শুনই অব তুহু করহ বিধান।	৪১—১২
শুনইছে	শুনিয়াছে	রাজা শুনইছে চান্দ কি চোরি।	৯২—৬
শুনইতে	শুনিতে	শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।	১১—৯
শুনতহি	শুনিয়া	শুনতহি কানু মিলিল ধনী পাশ।	২০১—৭
শুননু (শুনলু)	শুনিলাম	ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু।	১৪২—৩
শুনয়ে	শুনে	মন্ত্র না শুনয়ে জনু বালভুজঙ্গ।	৬৪—৬
শুনিয়ে	শুনি	কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।	৫৭—৭
শূন	শূন্য	হৃদয় পুতলি তুহ সো শূন কলেবর।	৪৯—৩
শেজ	শয্যা	উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই।	১৭৭—৫
শোভয়ে	শোভা পায়	বানর মুখে কি শোভয়ে পান।	১৩২—১০
শোহে	শোভে	ঐছন সকল শোহে।	১৪৭—১২
শ্যাঙল *	শ্যামল	শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান।	১৯ নং ৫
শ্যামর *	শ্যামল	শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।	১৮ নং ৫
সংবাদই(সম্বাদই)	সংবাদ করে	কান্ত কাক মুখে নাহি সংবাদই।	১৬৮—৩
সংবাদহ (সম্বাদহ)	সংবাদ কর	আব যদি যাই সম্বাদহ কান।	১৭০—৫
সকোপিত *	উদ্দীপ্ত	সারঙ্গ-শবদে মদন সকোপিত।	১৪৯ নং ২

ক্রমশঃ।

* শ্যাঙল—কাব্যবিশারদে "শাঙণ" আছে।

* শ্যামর—কাব্যবিশারদে "ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।"

গৌরীমঙ্গল।

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমোর রাজবাটীতে গৌরীমঙ্গল নামক এক খানি পুঁথি দেখিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিবিধ "মঙ্গল" গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু গৌরীমঙ্গল বোধ করি বাঙ্গালী পাঠকের এ পর্য্যন্ত অপরিচিত। এই প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থ খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তুলট কাগজে পুঁথির আকারে ২৪৪টি পত্র আছে; প্রত্যেক পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। অধিকাংশ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত। পয়ারের চল্লিশটি চরণ গড়ে প্রতি পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থের শেষ ভাগে কবির পরিচয় এইরূপ দেওয়া আছে;—

গৌড় দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে।
কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃ পূর্ব্ব স্থান নদী সরযূ উত্তরে।
এ দেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে॥
বিখ্যাত ভুবনে নাম পোকরে আলয়।
ভনে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥

পুনশ্চ

গৌড় দেশ রাঢ়ভূমি পর্ব্বত সমীপ।
গঙ্গার দক্ষিণ কূলে রাজ্যের অধিপ॥
আমাড়ি পরগণা নাম পোকর আলয়।
ভনে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥

পুস্তক রচনার তারিখ বারশত তের সাল,—

সতের শ আটাইশ শকে, রচিলাম এ পুস্তকে,
বারশত ত্রয়োদশ সন।
গৌরীমঙ্গলের গীত, শ্রবণে ভক্তের প্রীত,
ভবভয় উদ্ধার কারণ॥

আমাড়ি পরগণার অন্তর্গত পোকর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপলাইনের পাকুড় ষ্টেসন হইতে অভিন্ন। গ্রন্থকার পাকুড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ত্রিবেদীর পুত্র রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী।

রাজা পৃথ্বীচন্দ্র পাকুড়ের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুরের প্রমাতামহ। গ্রন্থখানি নব্বই বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রচিত হইলেও বিষয়, ভাব ও ভাষার বিচারে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত।

পাকুড়ের রাজবাটীতে বা অন্যত্র এ গ্রন্থের প্রতিলিপি বর্ত্তমান আছে কিনা, জানি না। জেমোর রাজবাটীর পুঁথিখানির নকল ১৭৫১ শকে (১২৩৬ সালে) ২৭শে মাঘ তারিখে শেষ হয়, এইরূপ লিখিত আছে। গ্রন্থরচনার তেইশ বৎসর পরে নকল; সুতরাং মূল গ্রন্থের সহিত পাঠভেদের অধিক সম্ভাবনা নাই।

শুনিলাম, জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (প্রবন্ধলেখকের প্রপিতামহীর পিতা) পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের সহিত সৌহার্দ্দবদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সূত্রেই এখানে এই পুঁথির আবির্ভাব। ১২৩৯ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরলোক হয়। তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুঁথি খানি এখানে আসিয়া থাকিবে। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

সত্যযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ। সেইমত চালাইল সংসারের জন ॥
ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল। তে কারণে মুনিগণে পুরাণ করিল
অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুষ্যগণে ধারণে নারিল ॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে।
বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন ॥
ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল ॥
মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ ॥
চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল ॥
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালি করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল ॥
গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কিরীট মঙ্গল আদি হইল সকল ॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল ॥
সকলে রচিল কথা পুরাণ ভারত। কৌতুক রচিল কেহ কাহিনীর মত ॥
কেহ না রচিল শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ। ব্রহ্মলীলা কেহ নাহি করিল রচন ॥
আগম নিগম সব বিচারিয়া মনে। রচিল কিঞ্চিৎ ব্রহ্মলীলা নিরূপণে ॥
ষড় দরশনে যার দর্শন না পায়। মম রচা হাস্য ভাষ্য জানিবে সবাই ॥

মূর্খের স্বভাব মতে করিল রচন। দোষ না লইবে কেহ গুণবান জন ॥
এই পুঁথি রচিল গীতগানের কারণ। দিলাম দ্বারকানাথে করিতে গায়ন ॥
সেনভূমে (সিংভূম ?) বাস রূপপুর নামে গ্রাম। চক্রবর্ত্তী উপাধি বালকরাম নাম ॥
লইলা এ পুঁথি বহু আগ্রহ করিয়া। গান গৌরীমঙ্গলের গীত শুদ্ধ হইয়া ॥
গুণের সাগর হন দয়ার সাগর। নারদ তুম্বুরু সম গানে গুণিবর ॥

গ্রন্থকারের সাহিত্যানুরাগ ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভক্তি-লতা, ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না; উল্লিখিত কবি ও কাব্য সকলের অধিকাংশই বোধ করি, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাপি স্থান পায় নাই। গত চৈত্রের "সাহিত্যে" বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়েকখানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিত্যানন্দপ্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।

"মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা" ভারতকৃত অন্নদামঙ্গলের প্রতি গৌরীমঙ্গল রচয়িতার এই উক্তি বড় সুন্দর।

অন্যান্য মঙ্গল গ্রন্থের ন্যায় গীত হইবার জন্য গৌরীমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। কোন প্রদেশে এই গীত চলিত হইয়াছে কি না, অবগত নহি।

শুনিতে পাই রাজা পৃথ্বীচন্দ্র শক্তিভক্ত ছিলেন; শক্তিতত্ত্ব নিরূপণের জন্য গৌরী-মঙ্গল লিখিত হয়; সমগ্র গ্রন্থ শক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনে পরিপূর্ণ।

গৌরীমঙ্গল পাঠ করিয়া উহার সম্বন্ধে মত প্রকাশের অবসর আমার নাই। পাতা উল্টাইয়া যত দূর দেখিলাম তাহাতে কাব্যাংশে ইহাকে অন্যান্য প্রচলিত মঙ্গল গ্রন্থের সহিত তুলনীয় করা যায় না। সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে উহা রচিত হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সহিত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে ৪১৯ অধ্যায় আছে। গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম দেবখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণ ও দেব-দেবী বন্দনার পর সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও শিবগৌরীর কলহ পর্য্যন্ত যথারীতি বর্ণনায় কোন অংশে ফাঁক পড়ে নাই। এই খণ্ড মধ্যে নারদ হিমালয়ের কথোপকথনছলে কৃষ্ণলীলা এবং গৌরীর কলহান্তে পিত্রালয় যাত্রাপ্রসঙ্গে দুর্গোৎসব পদ্ধতির বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী চারি খণ্ডে অবন্তী নগরের রাজা শালবান বা শালিবাহন ও তৎপুত্র জীমূতবাহনের উপাখ্যান। উত্তর দেশ হইতে মদ্রসেন রাজা আসিয়া শালবানকে রাজ্যচ্যুত করেন। শালবান পত্নীর সহিত অরণ্যযাত্রা করেন। সেখানে শালবানের মৃত্যু হয়। এই স্থলে গর্গমুনি রাণীর সান্ত্বনার্থ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বিবৃত করেন।

অরণ্যবাসকালে রাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুদ্ধখণ্ডে পুত্র জীমূতবাহনের জন্ম,

গর্গমুনির নিকট জীমূতবাহনের শিক্ষালাভ ও তান্ত্রিক মতে দীক্ষাগ্রহণ, পরে বিবিধ তীর্থ পর্য্যটনান্তর তারাপুর নামক তীর্থে ভগবতীর দর্শন লাভ, ভগবতী কর্ত্তৃক বর প্রদান ও তৎপরে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সাহায্যে মদ্রসেনের পরাজয় ও জীমূতবাহনের রাজ্য-প্রাপ্তি বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা যথাযথ স্থান পাইয়াছে। বৈদ্যনাথ, বক্রনাথ, তারাপুর প্রভৃতি প্রাদেশিক তীর্থ স্থলের প্রতি গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক, তারাপুর গ্রাম রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী। তারাপুরে তারাদেবীর মন্দির অবস্থিত এবং এই প্রদেশে উহা সিদ্ধপীঠের মধ্যে পরিগণিত। ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিবরণ এইরূপ ;—

চন্দেলে চয়েনসিংহ মহা সেনাপতি। সহস্র সর্দ্দার সঙ্গে অযুত পদাতি॥
বয়েসে বক্তারসিংহ বড় বলবন্ত। যোদ্ধা অনেক যুড়ি থাকে যাহার সামন্ত॥
চোহানে চতুরসিংহ বড় বল ধরে। যাহার সামন্ত অন্ত না হইতে পারে॥
রাঠোরে রাঘব রায় বড় ধনুর্দ্ধর। দেবতা দেখিতে ইচ্ছে যাহার সমর॥
পোঁয়ারে পর্ব্বত সিংহ যেন যমদূত। যার সঙ্গে অসংখ্য থাকয়ে রজপুত॥
কছোয়া কুলের কর্ত্তা কিষণ ভূপতি। যার সঙ্গে রঙ্গে ক্ষত্রি যুঝে দিবারাতি॥
ইত্যাদি।

মদ্রসেন অতিশয় অধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে গোহত্যা ও বিবিধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচারের প্রচলন করেন ও প্রজার প্রতি নিতান্ত নিপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর জীমূতবাহন কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন ও সন্নীতি প্রতিষ্ঠা ও জীমূতবাহনের বিবাহ ও ঘরকন্নার বর্ণনায় নীতিখণ্ড সমাপ্ত। স্বর্গখণ্ডে জীমূতবাহনের বার্দ্ধক্যে বনবাস ও গর্গমুনির নিকট বিবিধ উপদেশ লাভের পর পার্ব্বতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাস প্রবেশে গ্রন্থের সমাপ্তি।

গর্গমুনি জীমূতবাহনকে কলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়া কলিকালে জীবের নিস্তারের উপায় এইরূপ বলিয়াছেন ;—

দেখিয়া কলির রীত আশুতোষ হর। দ্রাবিড়ে হইবে জন্ম আচার্য্য শঙ্কর॥
চতুর্দ্দশ মত ভিন্ন করিয়া সন্ন্যাস। মুক্তির শরণি প্রভু করিবে প্রকাশ॥
রামানুজ গোস্বামিন হইবে আচার্য্য। সাত মত বিষ্ণুপথ করিবেন ধার্য্য॥
ইহাতে পাইবে মুক্তি বহু সাধুনর। তাহে কলি কাম লোভী করিবে বিস্তর॥
কলিকালে পাপী নরে করিতে নিস্তার। দয়া করি গোবিন্দ করিবে অবতার॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে মিশ্র পুরন্দর। শচী গর্ভে জন্ম নিবে দেব গদাধর॥

চৈতন্য করণে নাম ধরিয়া চৈতন্য। হরিনাম দিয়া আচণ্ডালে কৈবে ধন্য॥
ধরিয়া চৈতন্যবেশ ভ্রমি দেশে দেশ। সর্ব্ব নরে ভক্তির দিবেন উপদেশ॥
সেই জন ধন্য যে লইবে হরিনাম। ভব ফাঁস কাটিয়া যাইবে বিষ্ণুধাম॥

মদ্রসেনের সহিত শালিবাহন বা শালবান রাজার বিরোধ কোন পৌরাণিক উপাখ্যান বা প্রাদেশিক জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে কিনা জানি না। মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে কর্ণের সহিত শল্যের বিসংবাদ প্রসঙ্গে মদ্রকগণের যেরূপ নিন্দাবাদ পড়িয়াছিলাম তাহাতে মদ্রকগণ পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী কোন প্রদেশের আর্য্যাচার বহির্ভূত অধিবাসী ছিল বলিয়া আমার ধারণা আছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের প্রণীত দক্ষিণাপথের ইতিহাসে শালিবাহনোপাধিক অন্ধ্র ভৃত্য রাজগণের সহিত বৌদ্ধ অনার্য্য শক ভূপতিগণের মালবদেশ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের আধিপত্য লইয়া যে বিবাদের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনে রাখিলে গৌরীমঙ্গলোক্ত উপাখ্যান সেই ঐতিহাসিক ঘটনারই দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়।

"শক্তি তত্ত্বনিরূপণ" ও "ব্রহ্মলীলা বিরচন" যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহাতে সর্ব্বত্র কাব্যরসের উচ্ছ্বাসের আশা করা যায় না। কিন্তু যতদূর দেখিলাম গৌরীমঙ্গল কাব্যাংশে নিতান্ত নিকৃষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য নহে। রচনা প্রায় সর্ব্বত্রই সরস বোধ হইল, এমন কি তীর্থ মাহাত্ম্য ও পুজা প্রকরণাদিও পাঠকের সম্পূর্ণ বিরক্তি উৎপাদন করে না। স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুকরণ চেষ্টা দেখা যায়। এক স্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণে একটি তোটকের অবতারণা দেখিলাম। পুঁথির প্রথমার্দ্ধ প্রায় সমগ্র ভাগই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে গিয়াছে। এই স্থানে রচয়িতা সরস ও কবিতাময় বর্ণনার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছেন। আশা করি সাহিত্য পরিষদ এই গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ এবং উহার মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন। আমার বিবেচনায় প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থ মাত্রই পরিষদ কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে সকল গ্রন্থ কাব্যাংশে ও সাহিত্য হিসাবে নিকৃষ্ট, তাহাদেরও ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ ও সমাজতত্ত্ববিদের নিকট যথেষ্ট মূল্য থাকিতে পারে।

গৌরীমঙ্গলের কবিতার নমুনাস্বরূপ কতিপয় স্থল যদৃচ্ছাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(১) বন্দনা;—

বন্দিব নাগর হরি মদন মোহনে। তুলনা দিবার যার নাই ত্রিভুবনে॥
চরণের তলে অরুণের ছটা জিনি। পক্ক বিম্বাধর কিবা রক্তপদ্মশ্রেণী॥
দশ নখে শশী শোভা শারদ জিনিয়া কনক নূপুর তাহে ঘুঙ্গুর মিলাইয়া॥
উরুর উপমা রম্ভা কদাচিত নয়। কটি আঁটি পরিপাটী পীতবাস রয়॥
কণ্ঠে মণি কৌস্তভের দীপ্তি মনোহর। কণ্ঠ মালা করে আলা তাহার উপর॥

বয়ানের বয়ান বর্ণিতে হয় ভার। কত শত শারদ শশীর শোভা যার॥
অবিরত গোপাঙ্গনা বয়ানে সুস্থির। হেরিলে হরয়ে জ্ঞান যতেক নারীর।
বিহরয়ে বৃন্দাবনে যমুনার তটে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম নব বংশী বটে॥
সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনায় বেষ্টিত। নয়ানে বয়ানে যার সদাই জড়িত॥

(২) হর গৌরীর কোন্দল সূচনা ;—

দেবদেব মহাদেব কৈলাসশিখরে। ইচ্ছা হইল যাইবারে কোচনী নগরে॥
ভিক্ষাছলে বৃষবরে করি আরোহণ। বিশ্বনাথ কোচপাড়া করিলা গমন॥
বাজান ডম্বুর শিঙ্গাবর ঘনে ঘন। শুনিয়া ধাইল যত কোচ বধূগণ॥
সভে উনমত্তা হৈয়া যায় হরপাশে। কটিতে বসন মাত্র গাত্র নগ্ন বেশে॥
তুঙ্গস্তনী নিতম্বিনী দেখি পঞ্চানন। হৃষ্ট হৈয়া দৃষ্টি করে স্থির করি মন॥
দিগম্বর হরবর জানি নারীগণে। কৌতুক করয়ে সভে মহাদেবসনে॥
বনপুষ্প তুলি মালা দেয় শিবগলে। হর নাচে নারীগণ নাচয়ে বিভোলে॥
হেন কালে নারদ আসিয়া প্রণমিল। হরের কৌতুক সব সাক্ষাত দেখিল॥

(৩) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ;—

গগনে নিবিড় মেঘ করয়ে গর্জ্জন। দামিনী দমকে ঘন বরিষে সঘন॥
হইল যামিনী ঘোর অন্ধকারময়। যোগনিদ্রা জগতে প্রচার রূপ হয়।
দ্বারে দ্বারে প্রহরী যতেক নিয়োজিত। অচেতন নিদ্রায় থাকয়ে বিমোহিত॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। গায় হরিগুণ নাচে বিদ্যাধরীগণ॥

(৪) সখীগণের শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ওকালতি ;—

শুনলো শ্রীমতি, কহি যে ভারতী, কেন কর এত মান।
ছাড়িয়া কি হরি, থাকিবে পাশরি, ধরিতে নারিবে প্রাণ॥
নাগরের দোষ, ক্ষমা কর রোষ, মান কর রাই দূরে।
আপন শরীরে, যদি দোষ করে, ছাড়িতে কে পারে তারে॥
যাহার কারণে, না রহে পরাণে, তারে কি তেয়াগ ধনি।
বায়ুর গমনে, উড়ায় বসনে, তাহা বিনে বাঁচে প্রাণী॥
অনল পরশে, সকল বিনাশে, তাহা বিনা নাকি চলে।
জলে শীত হয়, বৃষ্টে অতি ভয়, তবে কি তেজিবে জলে॥
শুনলো সুন্দরী, তোমারি সে হরি, অপরাধ ক্ষমা কর।
তেজি মান মনে, নাগরের সনে, আনন্দে কুঞ্জে বিহর॥

(৫) শ্রীদুর্গার ধ্যানের অনুবাদ ;—

জটাজূট অর্দ্ধ ইন্দু কপালে শোভন। ত্রিনয়ন পদ্ম ইন্দু সদৃশ আনন।।
তপ্ত স্বর্ণ জিনি রুচি নবীন যৌবনী। সর্ব্ব আভরণ অঙ্গে সুচারু দশনী॥
অতি পীন পয়োধর করিকুম্ভ জিনি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম মহিষ মর্দ্দিনী॥
মৃণাল সদৃশ দশ বাহু সুশোভন। দক্ষিণে ত্রিশূল খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
তীক্ষ্ণ বাণ শক্তি অধঃক্রমে প্রহরণ। বাম করে খেটক ধনুকযুত গুণ॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা কিবা পর সুশোভন। অধঃক্রমে দশভুজে শোভে অস্ত্রগণ॥
অধেতে মহিষাসুরে কৈল শির ছেদ হৃদে শূল দিয়া বক্ষে করিলেন ভেদ॥
রক্ত বিস্ফুরিতাসুর বিকট-দশন। নাগফাঁসে বান্ধি চুলে করিল ধারণ॥
দক্ষিণে চরণ সম সিংহের উপরে। কিছু উর্দ্ধে পাদাঙ্গুষ্ঠ মহিষে বিহরে॥

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ছড়া।

বৰ্দ্ধমান—দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত

(১)

রোদ আয়রে হেনে।
ছাগল দেব মেনে॥
ছাগ্‌লীর মা বুড়ী।
কাট কুড়ুতে গেলি॥
দু'খান কাপড় পেলি।
দু'বউকে দিলি॥
আপুনি মরিস জাড়ে।
ক/ ..ছের আড়ে॥
কলা পড়ে দুপ্ দাপ্।
বুড়ী খায় কুপ্ কাপ্॥
যা বুড়ী তুই ষষ্ঠি-তলা।
সেথা পাবি খই কলা॥
যা বুড়ী তুই সিংটী।
সেথা পাবি আংটী॥
যা বুড়ী তুই কোল্‌কাতা।
সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা॥
যা বুড়ী তুই বদ্দমান।
সেথা পাবি জলপান॥
বদ্দমানের রাঙ্গা মাটি।
বুড়ীকে ধরে ছ্যাডাং কাটি॥

(২)

গোপাল গোপাল গোপাল।
কাঙ্গালিনীর দুলাল॥
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশী।
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশি॥
ধন বর্ষাকালের ছাতি।
আঁধার ঘরের বাতি॥
ছেলের হাতের নাড়ু।
পোয়াতীর হাতের খাড়ু॥
কাণার হাতের লাটি।
শীত কালের সাটি॥

(৩)

ধন ধন ধন পায়রা।
ধন পায় গো কারা।
ঘোষপাড়ায় কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা।
এ ধন যাদের নাই ঘরে।
তারা কি নিয়ে গো ঘর করে॥

(৪)

গোপাল বেড়ায়রে অলি গলি।
ছাতা ধররে বনমালী॥
ছাতার ভেতর কোম্পানি।
কোন কাঙ্গালের ধন তুমি॥

(৫)

মাণিক মাণিক মাণিক।
নাচে দাঁড়ারে খানিক।
কত কত সুন্দর কণে আস্‌বে আপনি॥

(৬)

খোঁকণ আমার ধন, কি খেতে মন?
পাকা চিংড়ী আর বাড়ীর বেগুণ,—
আমার তাই খেতেই মন।

(৭)

কেঁদনারে নীলমণি, কাঁদ্‌লে গলা ভাঙ্‌বে।
রাত পোহালে বাঁশী দেব, যত সোণা লাগ্‌বে॥

(৮)

ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন॥
তারা কিসের গরব করে।
উনুনে পুড়ে কেন না মরে॥

(৯)

ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও॥
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা।
দু দুয়োরে ঘুম যায় দুটী মোগল পাতা।
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী॥

(১০)

আঁদুলে কুঁদুলের মাসী কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা॥
হাতে না মেলাম ভাতে মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার।
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটিবার॥

(১১)

তাল গাছেতে হুট্‌ টুমাটুম হলো পাদারু।
চোত মাসের গরমিতে মলো মাচারু॥
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
কুঞ্জলতার বাপ এসেছে তাক্‌ ধিনা ধিনা ধিনা॥

(১২)

দোল দোল দোলনি।
কাল যাব বেলুনি।
কিনে আন্‌বো দোলনি॥
বেলুনীর পাকা আমড়া।
খেয়ে অম্বলে বুক চাবড়া॥

(১৩)

উলু উলু মাঁদারের ফুল।
বর আস্‌চে কত দূর॥
বর আস্‌চে বাঘনাপাড়া॥
বরের মাথায় চাঁপা ফুল,
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
গোঁপ দাড়িটা পাকা॥
চোক খাক তার মা বাপ,
চোক খাক তার খুড়ো।
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
তামাক খেকো বুড়ো॥
তামাক খেকো বুড়োটা কলা-আড়িকে যায়।
যে কলাটা মর্ত্তমান সেই কলাটা খায়॥

(১৪)

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডান মিগড়ি ঘুঁগুর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়্‌লো ঠুলি।
ঠুলি গেল মোর কমলা পুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা।
সূর্য্যি মামার বিয়েটা॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে।
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই॥
একটী পান কোঁকড়া।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
পান খাবি না খিলি খাবি।
টোক্কা মেরে চলে যাবি॥
নাচ দুয়োরে ব্যাঙের কুটী।
ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে একটী মুটী॥

(১৫)

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে।
খোঁকণকে যে খোঁড়ে—তার মুখটী পোড়ে
আর যে খোঁড়ে মনে মনে।
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে ॥

(১৬)

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর,
ধুলো লেগেছে গায়।
ধুলো ঝেড়ে লওরে কোলে,
প্রাণ জুড়োবে তায় ॥
চণ্ডীতলায় এসেছিল বাণ।
তাই কুড়িয়ে পেয়েছি সোণার চাঁদ ॥

(১৭)

আয়রে পাখী নেজ ঝোলা।
গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা ॥
আয়রে পাখী হুমো।
খোকাকে নিয়ে ঘুমো ॥
খাবি আর কল কলাবি।
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি ॥

(১৮)

নেবু পাতা করঞ্চা।
হে বৃষ্টি ধরে যা ॥

(১৯)

অরে আমার তুমি।
তোমার তরে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে
মলুম আমি ॥

(২০)

ধন গেছেগো বেড়াতে।
পায়ের নুপুর হারাতে ॥
যাক্‌গে নুপুর হারিয়ে।
আবার দেব গড়িয়ে ॥
আয়রে গোপাল ঘরে আয়।
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায় ॥

(২১)

কেঁদনারে নীলমণি—কাঁদ্‌লে গলা ভাঙ্গ্‌বে।
রাত পোহালে বাঁশী দেব যত সোণা লাগবে ॥

(২২)

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে।
মাসী গেছে বৃন্দাবনে, দেখে আসি গিয়ে ॥
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
আজ হতে জানিলাম মা বড় ধন ॥
মাকে দেব শাঁখা সাড়ী, ভাইকে টাকার তোড়া।
বাপকে দেব জামা জোড়া আর নীলে ঘোড়া ॥
খাবতো ধোবতো নাচ্‌বো খেয়ে খেয়ে।
অলঙ্গেতে চাল নাই তবে কিসের বিয়ে ॥

(২৩)

কাজল বলে উজল আমি গৌর মুখ থেকে।
হতমান হবে আমার গেলে কাল মুখে ॥

(২৪)

ধন ধন ধন ধুনিয়ে।
কাপড় দেব বুনিয়ে ॥
তাতে দেব ভেঁড়ার ডোর।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক।
তাতে দেব কালার আঁজি।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার বাঁজী ॥

(২৫)

চাঁদ ছেলে গেছে মাছ ধর্‌তে
ভাংলো নদীর বিল।
মাথায় গুগ্‌লির ঝুড়ি, সঙ্গে ছুটো চিল ॥
আগুন লাগুক মাছে।
সোণার চরণে আমার কাদা লাগে পাছে ॥

(২৬)

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে,
কদম তলায় কেরে।
আমি তো বটি কেষ্ট ঠাকুর,
ঘোম্‌টা তুলে দেরে ॥

(২৭)

ওরে আমার সোণা।

সেকরা ডেকে,মোহর কেটে, গড়িয়ে দেব দানা॥

(২৮)

খুঁকু রাণীর বিয়ে দেব হস্তমালার দেশে।

তারা গাই বলদে চষে।

হীরেয় দাঁত ঘসে।

রুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে॥

তার মা কোণে বসে বসে বাচে।

পাড়া প্রতিবাসী চাইতে এলে—

বলে আর কি আমাদের আছে॥

আম কাঁটালের বাগান দেব ছায়ায়২ যেতে।

সরু ধানের চিঁড়ে দেব শাশুড়ী ভোলাতে॥

(২৯)

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী।

নল ভেঙ্গেচে একাদশী॥

একা নল পঞ্চদল।

কে যাবিরে কামার শাল॥

কামার মাগী খাঁড় ভাঙ্গানি।

খাঁড়ার উপর তোলে পানি॥

অর্পণ দর্পণ।

কুড়ি কিষ্টি ব্রাহ্মণ॥

(৩০)

অন্নপূর্ণ দুদের সর।

কাল যাব মা পরের ঘর॥

পরের বেটা মার্‌লে চড়।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খুড়োর ঘর॥

খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥

হেঁই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি।

দিয়ে আয়গে বাপের বাড়ী॥

মা দিলে সরু শাঁখা, বাপ দিলে সাড়ী।

ভাই দিলে হুড়্‌কো ঠেঙ্গা চল শশুরবাড়ী॥

(৩১)

বড় বউগো রান্না চড়া।

ছোট বউগো জলকে যা॥

জলের ভিতর লেখা জোকা।

ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥

ফুলে বড় কুঁড়ি।

নটের শাকে বড়ি॥

(৩২)

একটী কথা আছে।—কি কথা?

ব্যাঙ লতা।—কি ব্যাঙ?

তুড়ি ব্যাঙ।—কি তুড়ি?

বামুণবুড়ী।—কি বামুণ?

চণ্ডী বামুণ।—কি চণ্ডী?

পিটে গণ্ডী।—কি পিটে?

তাল পিটে।—কি তাল?

খেজুর তাল।—কি খেজুর?

পিক্ মজুর।—কি পিক্?

সোণা পিক্।—কি সোণা?

গু খানা।—তুই আদ্দেক ভাগ নে না!

(৩৩)

কত সাধ যায়রে চিতে।

বেগুণ গাছে আঁকৃসি দিতে।

(৩৪)

ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়।

চাম কৌটা মজুমদার।

ধেয়ে এলো দামুদার॥

দামুদারের হাঁড়ি কুড়ি।

চার দুয়োরে চাল কাঁড়ি॥

চাল কাঁড়তে হলো বেলা।

ভাত খেসেরে জামাই শালা॥

ভাতে পড়্‌লো মাছি।

কোদাল দিয়ে চাঁচি॥

কোদাল হলো ভোঁতা।
খা কামারের মাথা।

(৩৫)

আয়রে আয় ছেলের পাল মাচ মারণে যাবি।
মাচের কাঁটা ফুট্‌লে পায় দোল্‌ায় চেপে যাবি॥
দোলায় আছে দু'পোণ কড়ি গুণ্‌তে ২ যাবি॥
ছোট শাঁখ বড় শাঁখা ঝুমুর ঝুমুর করে।
এক তোলা খএর খেয়ে দাঁত ফর্‌ ফর্‌ করে।
আর এক তোলা খএর খেয়ে দুর্গহনু জ্বলে॥
দুর্গহনুর জলটুকু ঝিকি মিকি করে।
তাতে বসে বাপু ঠাকুর কন্যা দান করে॥
কন্যা দান কর্‌তে কর্‌তে চখে এলো কলু।
ধর বাবা লাল গামছা মোছ বাবা মু॥

(৩৬)

আঁটুল বাঁটুল।
শ্যামলা শাঁটুল॥
শাম্‌লা গেল হাটে।
শাম্‌লাদের মেয়েগুলি পথে বসে কাঁদে॥
আর কেঁদোনা আর কেঁদনা চালভাজা দেব।
আর যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব॥

(৩৭)

চড়ুইটীরে মরুইটী দুয়ারে বসোসে।
রামচন্দ্রের কান বিধাব নাড়ু বিলাওসে॥
বড় বড় নাড়ু গুলি সিকেয় তুলোসে।
ছোট ছোট নাড়ু গুলি গালে ভরসে॥
এস এস জামাইএর পাল ভোজন করসে॥
সকল জামাই এলো আমার খোঁড়া জামাই কই।
ঐ আস্‌ছে খোঁড়া জামাই ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে॥
ভাঁড়ার ঘরে শুতে দিলুম ইদুরে নিলে কান।
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দেব দান।
ও গরুটির নাম কি—পূর্ণিমার চাঁদ॥

(৩৮)

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চাল পিটুলি খেয়ে।
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।
ঘুঘুকে নিয়ে গেলুম 'বকুল তলা দিয়ে॥
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা
রাম ধনুকের বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ নাচেরে কাঁকাল বাঁকাইয়ে।
আলোচাল ভেজে দেব টোপর ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হলো কাট।
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট॥
ত্রিবেণীর ঘাটেরে ঝুর্‌ ঝুর্‌ বালি।
সোণামুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি॥
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেবেছে।
হাতীর গলায় জোর ঘণ্টা বাজ্‌তে লেগেছে॥

(৩৯)

বাছার বাছা পো।
নিমতলাতে শো॥
নিম পড়লো বুকে।
হাজরা এলো নিতে।
বাপ দেয় না যেতে॥
বাপের হাঁসা ঘোড়া,
মায়ের ছাপন দোলা।
বোনের স্থাপন পেটারি,
ভেয়ের সোণা ধড়া॥
বাপ যাবেন গৌড়।
আন্‌বে সোণার ময়ূর॥
দেবে সোণার বিয়ে।
আলপোনাতে চাল নাই,
নাচ্‌বো ধেয়ে ধেয়ে॥

(৪০)

তাল গাছ কাটম।
বোসের বাটম॥

গৌরী গো ঝি,—।
তোমার কপালে বুড়ো বর আমি কর্ব্বো কি ॥
চোক থাক তোর মা বাপ,
চোখ থাক তোর খুড়ো।
এমন বরকে কে দিয়েছে,
তামাক খেকো বুড়ো॥
বুড়োর নল গেল ভেসে।
বুড়ো তামাক খাবে কিসে॥

(৪১)

এস পৌষ যেওনা। জন্ম জন্ম ছেড়ো না ॥
পৌষের মাথায় সোণার বিঁড়ি। হাতে নড়ি,
কাঁকে ঝুড়ি।
পৌষ আস্‌ছে গুড়ি গুড়ি ॥
আন্‌বো গাঙ্গের জল, ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো।
বাহান্ন পৌটি হয়ো, ঘরে বসে পিটে খেয়ো,
এমন সোণার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো ॥

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

হুগলী ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত।

(১)

ওপারের কুলা গাছটী লম্বা লম্বা চুল,
ঢাক বাজে ঢোল বাজে কোন গাঁয়ের বর
দুষ্টমাগী শাশুড়ী কনে বার কর,
বার করেছি বার করেছি জলের ঝারা দিয়ে,
রামমণিকে নিয়ে যাবো বকুলতলা দিয়ে,
বকুল ফুল কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা,
রামধনুকের বাদ্দি বাজে সীতারামের খেলা,
নাচ্‌ত বাপু সীতারাম কেঁকাল বাঁকিয়ে,
আলো চা'ল খেতে দিব টেঁপর ভরিয়ে,
আলো চা'ল খেতে খেতে গলা হলো কাট,
হেথা কোথা জল পাবো তিরপুনীর ঘাট,
তিরপুনীর ঘাটেরে ভাই ঝুর ঝুরে বালি,
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি,
ডালিম গাছে পিরভু নাচে,
তা ধেই ধেই বাদ্দি বাজে,
আই গো চিন্‌তে পার,
গোটা দুই অন্ন বাড়,
অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাবো মা পরের ঘর,
পরের বেটা মারবে চড়,
কান্তে কান্তে খুড়োর ঘর,
খুড়ো দিলে বুড়ো বর,
হে খুড়ো তোর পায়ে পড়ি,
রেখে আয় মায়ের বাড়ী,
মা দিলে সরু শাঁখা, বাপ দিলে ঝারি,
ভাই দিলে হুড়কে ঠ্যাঙ্গা চল শ্বশুরের বাড়ী।

(২)

দাদা হাঁক পড়েছে দাদা নাই ঘরে,
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে,
দাদাকে নিয়ে যাব দিগনগর দিয়ে,
দিগনগরের মাঠে রে ভাই হাতী নেবেছে,

হাতীর গলায় গজঘণ্টা বেজে উঠেছে,
নেড়ে চেড়ে দেখ্না বুড়ো মালা পেতেছে।

(৩)

তাল গাছ কাটম্ বেসের বাটম্ গোরী লো ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি,
য়্যান্‌কা ভেঙ্গে স্যান্‌কা দিব,
কাণে মদন কড়ি,
তোর বিয়ের বেলায় দেখ্‌তে যাব বুড়ো চাঁপ দাড়ি,
বুড়ো চাঁপ দাড়ি নেড়ে কলা বাগানে যায়,
সে কলাটা মর্ত্তমান, টপরে গিলে খায়।

(৪)

ড্যাং ড্যাং শালুক ডাঁটা,
মামাকে আন্‌তে পাঠা,
মামাদের কচুবনে,
কচুশাক খায় না কেন,
বেলাঙ্গিতে বাদ্য মরেছে,
তোমাকে যেতে বলেছে,
তুমি নাও ঘি কলসী,
আমি যাই ঝাউটি হাতে,
চল যাই রাজপথে,
মণ্ডি মনোহরা,
জিলিপি রসকরা।

(৫)

টিয়ে টিয়ে টিয়ে,
লাল গামছা দিয়ে,
লাল গামছা লবো না,
তসর কাপড় লব,
তসর করে খসড় মসড় ধোপা বাড়ী যাবো।
ধোবাদের তেল আমলা,
মালীদের ফুল,
এমন ঝেঁটন বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল।

(৬)

দোল দুল্‌তে এলো বাণ,
হেজে গেল জলার ধান,
যাক ধান থাকুক নাড়া,
নাড়া কেটে দিব রাঙ্গা ধাড়া,
রাঙ্গা ধাড়া পাটের খোপ,
কেটে মরবে পাড়ার লোক,

(৭)

ওপারের কুলগাছটি রামছাগলে খায়,
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ী যায়,
আগে যায়গো ভার বাউটি,
পিছু যায়গো ঝুলি,
দাঁড়ারে কেবলা,
মায়ে বোদ করি,
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি,
কেঁদে কেন মর,
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা,
কার ঘর কর।

(৮)

আলু পাতা থালু পাতা,
ভেরেণ্ডা পাতার ঝোল,
সকল জামাই ভাত খেলে মা,
মেজ জামাই কই,
কাপড় দিয়েছি থানে থানে,
ঘটী দিয়েছি দানে,
মেজ জামাই ভাত খায় নাই
কিসের অভিমানে।

(৯)

উলুকুটু ধুলুকুটু,
নলের বাঁশী,
নল ভেঙ্গেছে কি দেশী,
একা নল পঞ্চ দল,

কে যাবিরে কামার শাল,
কামার মাগী ঘের ঘেরানী,
অর্পণ দর্পণ
কুঁড়ে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ।

(১০)

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম,
ঘোড়া ডুম সাজে,
লাল ঘেঘর,
ঘাগর বাজে,
বাজ্‌তে বাজ্‌তে,
চল্লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুলী,
কমলা পুলীর টিয়ে টা,
স্থর্য্যি মামার বিয়েটা,
হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
কুস্থম কুস্থম পানের বিড়ে,
চল্‌ পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোশাটা কিনে খাই,
একটি পান ফোঁপরা,
ছুসতীনে ঝগড়া,
শাস্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে,
দিনের ভাগে খায় কি,
কেলে গোরুর দুধ,
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুণভাজা, কুচ্‌

(১১)

ইকির মিকির চাম চিকির,
চাম কৌটা মজুন্দার,
ধেয়ে এলো বরের বাপ,
বরের বাপের হাঁড়ি কুঁড়ি
গোয়ালে বসে চা'ল কুঁড়ি,
চা'ল কুঁড়তে হলো বেলা,
ভাত খাবি আয় জামাই শালা,
ভাতে পড়লো মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁচি,
কোদাল হলো ভোতা,
খা কামারের মাথা।

(১২)

রাঙ্গা নটে চাপর চটি,
গুড় দিয়ে দিয়ে খালাম নটে,
আয়রে কানাই দাস,
এক কাটা পুঁইয়ের ডাঁটা
ধর্ত্তো ঘামুনের কাণ।

(১৩)

আয় মণি সায় মণি,
রতন মণির কোলে।

(১৪)

আঁটুল বাঁটুল,
শিমলে সাঁটুল,
শিমলে গেছে হাটে,
গুয়া কাট কাটে,
মালীদের মেয়ে গুলো,
খাটে বসে কাঁদে,
আর কেঁদো না
আর কেঁদো না,
কলাই ভাজা দিব,
আর কাঁদ্‌লে,
দাদাকে বলে দিব,
দাদা ডাক ছাড়ি,
দাদা গেছে কার বাড়ী,
ও পথেতে যেওনা গো,
বঁধু এসেছে,
বঁধুর পান খেওনা গো,

ভাব লেগেছে,
ভাব ভাব কসমের কুল,
ফুটে রয়েছে,
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম,
দাদা রয়েছে,
দাদার হাতের বাজু বন্ধন,
ছুড়ে মেরেছে
উহু হু বড্ড লেগেছে।

(১৫)

পুঁটু পুঁটু ডাক ছাড়ি,
পুঁটু গেছে কার বাড়ী,
নিয়ে আয়গো ফুলের ছড়ি,
পুঁটু কেন কেঁদেছে,
ভিজে কাটে রেঁধেছে,
কাল যাবো মা গঞ্জের হাট,
কিনে আন্‌বো শুক্‌নো কাট,
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত।

(১৬)

ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন,
এ ধন যার ঘরে নাই,
তার কিসের জীবন।

(১৭)

ভোঁদড় নাচে,
ভোঁদড় নাচে, কোন খানে,
শতদলের মাঝখানে,
সেখানে ভোঁদড় কি করে,
ডুব গেলে গেলে মাছ ধরে।

(১৮)

ধন ধন ধন ছেলে,
পথে বসে কি কাঁদছিলে,
মা বলে কি ডাক্‌ছিলে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।
মেঘনাদবধে প্রকাশিত মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত।
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। ইত্যাদি।

প্রাচীন সময়ে হিন্দু যখন শিক্ষার্থী হইয়া, গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের পালন করিতে হইত। নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভের সহিত কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসবিদ্বেষ ও চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হওয়া এই ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার প্রবর্ত্তক ঋষিকুলে আমরা যে, বিষয়বিরাগের সহিত অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাই, ব্রহ্মচর্য্যই তাহার একমাত্র কারণ। হিন্দুর এই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি না থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয়, প্রকৃত মহত্ত্বের আশ্রয়স্থল হইত না। বিদ্যায় মানুষের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে; বহুদর্শনে মানুষের চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে; গভীর ভাবস্রোতে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উন্নত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু চিত্তসংযমের অভাবে মানুষ কখনও মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ আবর্ত্তঘূর্ণিত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবল এ দিকে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা, তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, তাঁহার অপরিসীম মানসিক শক্তি, কিছুতেই তাঁহাকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারে না। প্রতিভায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তির অভাবে তাঁহার স্থিরতা ঘটিতে পারে না। তাঁহার মনোমন্দিরের এক দিকে যেমন উজ্জ্বল আলোক; অপর দিকে সেইরূপ ঘোর অন্ধকার। তিনি আলোকের সাহায্যে অতীত ও বর্ত্তমান কালের মনীষীদিগের মানসপট সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে পারেন; কিন্তু উহা তাঁহার চিরাভীষ্ট রত্নের অন্বেষণে সহায় হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সুখ ও আরামদায়িনী শান্তির পথ তাঁহার সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তাঁহার মনোমন্দিরের উজ্জ্বল আলোক এই অন্ধকারভেদে সমর্থ হয় না। তিনি মানসিক শক্তিতে অপরাজেয় হইয়াও, হৃদয়ের শক্তির অভাবে ঐ অন্ধকারস্তূপে নিমজ্জিত থাকেন। অপরে তাঁহার মানসক্ষেত্রের আলোকে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে যেমন প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়, তাঁহার হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে সেইরূপ বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া, তদীয় সত্ত্বগুণময় ধর্ম্মভাবের অভাব জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। লোকসমাজে তাঁহার প্রশংসালাভ হয়, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধালাভ ঘটিয়া উঠে না। তিনি মানসিক আলোকের অধিকারী হইলেও, হৃদয়ের গভীর তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অন্তিম কাল পর্য্যন্ত কেবল "জ্যোতিঃ আরও জ্যোতিঃ" বলিয়া কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া থাকেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মানসক্ষেত্র এইরূপ সমুজ্জ্বল আলোক এবং এইরূপ গভীর অন্ধকারের বিকাশস্থল ছিল। পৃথিবীতে লোকে যাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, মধুসূদনে তাহার অভাব ছিল না। মধুসূদন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের পুত্র। তাঁহার পিতা সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন প্রসিদ্ধ উকীল। তাঁহার মাতা একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর কন্যা। তাঁহার সংসারে কখনও কোনও বিষয়ের অভাব ছিল না। তিনি যেরূপ সবল ও সুস্থ, সেইরূপ; বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও শ্রমশীল ছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ম্ময়, আয়ত, লোচনযুগল, উন্নত নাসিকা, কুঞ্চিত কেশ, সুনিপুণ চিত্রকর বা সুদক্ষ ভাস্করের গুণগৌরবপ্রকাশের বিষয়ীভূত ছিল। তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তি—তাঁহার স্নেহ, দয়া, পরোপকার এক জন ভাবুক কবির ভাবময়ী কবিতার অযোগ্য উপাদান ছিল না। কিন্তু কোমল বৃত্তির পার্শ্বে যে নিবিড় কালিমা ছিল, তাহা দেখিলে পথের এক জন ভিক্ষুকও ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ বিকৃত এবং নাসিকা সঙ্কুচিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নির্ম্মল কোমল ভাবের পার্শ্বে এইরূপ ঘৃণিত পঙ্কিল ভাব, উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে এইরূপ গভীর অন্ধকারের অস্তিত্ব যে, নিরতিশয় বিস্ময়জনক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদনে এইরূপ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত, বিস্ময়াবহ ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঘটনা যেরূপ বিস্ময়াবহ, সেইরূপ শোকোদ্দীপক। কিন্তু যখন মধুসূদনের বাল্যকালের শিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলভাব, বিজাতীয় রীতি ও বিজাতীয় ভাবের অনুকরণপ্রবৃত্তি মনে হয়, তাঁহার সংযমশিক্ষায় তদীয় মাতাপিতার ঔদাস্য ও অযত্ন যখন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে, তখন বিস্ময়ের আবেগ মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু শোকের উচ্ছ্বাস কখনও অল্প হয় না। মাতৃভাষানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিগণ চিরকাল মাতৃভাষার সেবক প্রতিভাশালী কবির জন্য শোকাশ্রুপাত করিবেন।

মধুসূদন সপ্তম বর্ষ বয়সে স্বকীয় আবাসপল্লী সাগরদাঁড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বালকদিগের ভীতিস্থল ছিল। যখন বেত্রধারী গুরুর ভীষণমূর্ত্তি তাহাদের মনে উদিত হইত, তখনই তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিত। তাহারা গুরুকে শিক্ষাদাতা বলিয়া যত ভক্তি করুক বা না করুক, যমদূত বলিয়া শতগুণে ভয় করিত। অনেকেই এই যমদূতের ভয়ে আত্মগোপন করিত। অনেকে ইহার প্রসন্নতাবিধান জন্য নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিত। অনেকে ইঁহার ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বালক হইয়াও তোষামোদকারী বাক্‌চতুরের ন্যায় অলীকস্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু মধুসূদন কখনও গুরুকে যমদূত বলিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করেন নাই। তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র পুত্র; স্নেহপরায়ণা জননীর অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতির অদ্বিতীয় অবলম্বন। দাসদাসীগণ নিরন্তর তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিত থাকিত। পিতৃগৃহের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নিরন্তর সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য যত্ন প্রকাশ করিত। তাঁহার পিতা এই সময়ে ওকালতীর

জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি সাগর-দাঁড়ীর বাড়ীতে থাকিয়া, লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও মাতা স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন না। কিন্তু মধুসূদন লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। গুরুমহাশয়ের বেত্রে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। অপর বালকেরা যে স্থানে যাইতে ভীত হইত, তিনি প্রফুল্লভাবে সেই স্থানে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি চিরকালই বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তিনি সমুদয় বিঘ্নবিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। লোকপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের সমকক্ষ হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। এই প্রবল বাসনাস্রোত কিছুতেই নিরুদ্ধ হয় নাই। বাল্য-কালে ইহার রেখামাত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যৌবনে ইহা প্রসারিত হইয়া, তাঁহাকে বিবিধ ভাষার অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। যাঁহারা সংসারে অভীষ্ট ফললাভের জন্য অটল-ভাবে বিঘ্নবিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, শৈশবেই তাঁহাদের চরিত্রে সেই অটলতার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতবীর শক্ত যখন একখানি নবনির্ম্মিত তরবারির ধার পরীক্ষা করিবার জন্য অম্লানভাবে আপনার অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া, উহাতে আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক ছিল না। পঞ্চবর্ষীয় বালক যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই তেজস্বিতাই অতঃপর তাঁহাকে গরীয়সী জন্মভূমির গৌরবরক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। শক্ত ভ্রাতৃদ্রোহী হইলেও চিরস্মরণীয় হলদিঘাটের যুদ্ধের পর জ্যেষ্ঠের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া, কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মধুসূদন অতঃপর যে মানসিক শক্তিতে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন, সপ্তম বর্ষ বয়সেই তাঁহাতে সেই শক্তির অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শক্ত তেজস্বী বীরের চিরাভ্যস্ত গুণের অবমাননা করেন নাই। মধুসূদন পণ্ডিতোচিত ধীরতার অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদ্রোহী ও মাতৃদ্রোহী হইয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক জাতীয় ভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; জনকজননীর সেই বাৎসল্য, সেই স্নেহ-প্রবণতা, সেই শোকাশ্রু মনে করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে তাঁহাদের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হয়েন নাই, বা তাঁহাদের হৃদয়গত জ্বালা দূর করিবার জন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। রাজপুত চিরকাল বীরধর্ম্মে অভ্যস্ত; আজন্ম বীরব্রতের সম্মানরক্ষায় কৃতহস্ত। মতিভ্রম-প্রযুক্তই হউক, ক্রোধের উত্তেজনাতেই হউক, হিংসার আবেগেই হউক, রাজপুত অবলম্বিত পথে স্খলিতপদ হইলেও, আপনার সেই চিরন্তন নীতিতে, সেই মহীয়সী শিক্ষায় একবারে বিসর্জ্জন দেয় না। শক্ত এই শিক্ষার গুণেই বীরত্বের সম্মানরক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের পদানত হইয়াছিলেন। আর মধুসূদন? মধুসূদনের অদৃষ্টে এরূপ শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। অশ্ব যেমন অসংযত হইলে অপথে ধাবিত হয়, মধুসূদনও সেইরূপ অসংযত হইয়া, বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য এক জন পরিচালকও

আবির্ভূত হয়েন নাই। তাঁহাকে সংযতভাবে রাখিবার জন্য এক জন শিক্ষাদাতাও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই।

মধুসূদন মানসিক শিক্ষার অসামান্য উন্ননি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ইংরেজ অধ্যাপকের প্রদত্ত শিক্ষায় ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তিলাভ হয়। তিনি ইংরেজী রচনায় অভ্যস্ত, ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য এবং ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের ভাবগ্রহণে সুনিপুণ হয়েন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতার আদর করিতেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত কবিতার প্রতি তদীয় অনুরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। ইংরেজী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া, তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া আমোদিত হইতেন। ইংরেজ কবিদিগের কাব্যপাঠে তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইত। ইংরেজ দার্শনিক, ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহার দূরদর্শিতাবুদ্ধির সহায় হইতেন। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপকের উপদেশে, ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের রচনাপাঠে, তিনি বহুদর্শী হইলেও হৃদয়ের ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন নাই। তাহার মনের শিক্ষা যথোচিত হইয়াছিল, হৃদয়ের শিক্ষা কিছুই হয় নাই। তিনি পাশ্চাত্য কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাব্য তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হয় নাই। মিল্টন্ তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন; তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেন; তাঁহার রচনাশক্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতেন; কিন্তু মিল্টনের ধর্ম্মভাবে তাঁহার ধর্ম্মভাব উন্নত হয় নাই; মিল্টনের চিত্তসংযমে তাঁহার চিত্তসংযম ঘটে নাই। পাপপ্রবৃত্তির প্রতি মিল্টনের বিদ্বেষভাবও তাঁহাকে পাপের প্রতি বিদ্বেষপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করে নাই। মিল্টন্ যেরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনিও সেইরূপ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা যেমন বলবতী; তাঁহার সাধনাও সেইরূপ মহীয়সী ছিল। তিনি সাধনাবলে ভাষা-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। আটটি প্রধান ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি এক দিকে যেমন বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তেলিগু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষার আলোচনা করিতেন, অপর দিকে সেইরূপ হিব্রু, গ্রীক্, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষার অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। যিনি এইরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করিয়াছেন; অধ্যবসায়প্রভাবে যিনি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার কবিদিগের ললিতপদাবলী, উদ্দীপনাময়ী কবিতামালা, স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছেন; তিনি কি জন্য হৃদয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেন? কোমলভাব যাঁহাদের রচনার প্রধান উপকরণ; দয়াধর্ম্ম যাঁহাদের কল্পনার প্রধান সহায়; পাপীর দুর্ভাগ্য, ধার্ম্মিকের সৌভাগ্য; যাঁহা-দের বর্ণনীয় বিষয়; তাঁহাদের সহিত চিরপরিচিত হইয়া, বিনীতভাবে তাঁহাদের পদপ্রান্তে অবনত থাকিয়া এবং তাঁহাদের কাব্যপাঠে অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি কি জন্য পাপপঙ্কে কলুষিত হইলেন? কি জন্য ধর্ম্মভাবে বিসর্জ্জন দিয়া, আপাতরম্য

বিষয়বাসনার পঙ্কিল প্রবাহে ভাসমান হইলেন ? কি জন্য স্নেহশীল জনক, বাৎসল্যময়ী জননী, প্রীতিভাজন পরিজনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ? কি জন্য পরকীয় বেশে সজ্জিত, পরকীয় রীতিতে পরিচালিত, পরকীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, পরদেশে জীবন-যাপনে অগ্রসর হইলেন ? তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহার শিক্ষার দোষই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষাদোষে তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইতে পারে ; শিক্ষাদোষে তিনি অপথে পদার্পণ করিতে পারেন ; শিক্ষাদোষে তিনি বিজাতীয় ভাবে বিমোহিত হইয়া, জাতীয় ভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারেন ; কিন্তু বোধ হয়, কেবল শিক্ষার ব্যভিচারই এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অপশিক্ষার সহিত মাতাপিতার অযত্ন এবং অত্যধিক সন্তানবাৎসল্য প্রযুক্ত অত্যাদরই মধুসূদনকে অপথে পরিচালিত করিয়াছিল। হিন্দু কলেজে মধুসূদনের অনেক সতীর্থ ছিলেন ; ইঁহারাও কার্য্যক্ষমতায়, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিগুণে সমাজে যথোচিত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় ইঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। ইঁহারা সকলেই এক গুরুর নিকটে এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইতেন ; এক গুরুর মুখে উপদেশ শুনিতেন ; এক গুরুর ব্যাখ্যায় সন্দেহ দূর করিতেন ; এক গুরুর সমক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধির পরিমাণ করিতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ইঁহাদের সকলের সমক্ষেই প্রসারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শন সকলেই সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন ঐ জ্ঞানালোকে যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত, ঐ সভ্যতায় যেরূপ আকৃষ্ট, ঐ রীতিনীতিতে যেরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপরে সেরূপ হয়েন নাই। মধুসূদন যে পথ অবলম্বন করেন ; অপরে উহার বিপরীতপথগামী হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মধুসূদন যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা মানসিক উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও হৃদয়ের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একই শিক্ষায় যে, একই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে ফলের ইতরবিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া, উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন, মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাঁহার আকর্ষণে স্খলিতপদ হয়েন নাই। মধুসূদন জাতীয় ভাব পদদলিত করিয়াছেন ; ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। একের প্রতিভা বিজাতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য, চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা ঘটাইয়াছে ; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্ব-জনীন, উদার ভাবনিচয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। মধুসূদন যদি পিতার নিকটে অত্যধিক আদর না পাইতেন ; মাতার নিকটে যদি অত্যধিক বাৎসল্যের ফলভোগ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার উদ্দাম প্রকৃতি কিয়দংশে সংযত থাকিত। তিনি বাল্যকালে মাতৃসমীপে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন ; কৃবিকঙ্কণের অমৃতময়ী কবিতায় আমোদিত হইতেন, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের

মহত্ব, চণ্ডীর জাতীয় ভাবমূলক স্বাভাবিক বর্ণনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাকে হিন্দুত্বের মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর করিতে যত্নবতী হয়েন নাই। তিনি মাতার নিকটে যাহার আবদার করিয়াছেন, মাতা তাঁহার সন্তোষসাধন জন্য তাঁহাকে তাহাই দিয়াছেন। কিসে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলভাব দূরীভূত হইবে, কিসে তিনি সংযতচিত্ত হইবেন, কিসে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া, তিনি জাতীয় ভাবের জয় কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার পিতা কি মাতা, তৎপ্রতি মনোযোগী হয়েন নাই। এই অমনোযোগপ্রযুক্ত মধুসূদন অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হয়েন। পাশ্চাত্যভাব তাঁহাকে যে দিকে টানিতেছিল, তিনি বিনা বাধায় সেই দিকে ধাবিত হয়েন। এইরূপে তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। এইরূপে তাঁহার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং এইরূপে তাঁহার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় অবস্থা তাঁহাকে সর্ব্বাংশে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। মধুসূদন মাতাপিতার আদরের ধন হইলেও পরিশেষে তাঁহাদের ত্যাজ্য পুত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। তিনি স্নেহময়ী জননীর যেরূপ ত্যাজ্য পুত্র, গরীয়সী জন্মভূমিরও সেইরূপ অধঃপতিত, প্রনষ্টসর্ব্বস্ব অবোধ সন্তান। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে যেমন সকলের বরণীয় করিয়া রাখিবে, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিও সেইরূপ তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিকটে অদূরদর্শী ও অব্যবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে।

যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হইয়াও আপনাদের প্রতিভায় জগতের সমক্ষে অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা বিবেক হইতে বিচ্যুত হইলেও লোকসমাজে উদারতা ও মহানুভাবতার পরিচয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদের দয়া, তাঁহাদের কোমলতা, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের উদারতা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন সকল স্থলেই পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অধঃপতিত সন্তান; কিন্তু তাঁহাদের শোচনীয় অধঃপতনেও প্রকৃতি তাঁহাদের মানস-মন্দিরে কোমল ভাব উদ্দীপিত করিতে নিরস্ত হয় নাই। তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তি গুলি তাঁহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও অপরের সমক্ষে তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় দিতে কাতর হয় নাই। তাঁহারা স্বয়ং অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েন; সমাজের উন্নত স্তর হইতে নিরতিশয় নিম্ন স্তরে পতিত হইয়া থাকেন; সৌভাগ্যসূর্য্যের প্রদীপ্ত আলোক হইতে ঘোরতর দুর্ভাগ্যতমঃসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। সেই শোচনীয় অধঃপতন, সেই অভাবনীয় অবনতি এবং সেই ঘোরতর দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে এরূপ স্নিগ্ধ মহত্ত্বজ্যোতিঃ নিঃসৃত হয় যে, লোকে উহার প্রশান্ত কমনীয়ভাবে বিমোহিত হইয়া থাকে। গোল্ডস্মিথ্ প্রকৃতির দুরদৃষ্ট সন্তানের মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন। তিনি মানসিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আপনার অভাবমোচনের জন্য বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা প্রযুক্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তিনি এক দিন সুখসেব্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত, অন্য দিন

উদরান্নের জন্য লালায়িত ; এক দিন সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সুশোভিত, অন্য দিন ছিন্ন মলিনবসনে গৃহস্থের সমক্ষে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত ; একদিন বিষয়কর্ম্মে নিয়োজিত, অন্য দিন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া নিরতিশয় দুর্দ্দশায় নিপতিত। তিনি শিক্ষিত হইয়াও এইরূপে বিবেকের সম্মান রক্ষা করিতেন! তাঁহার হৃদয়াকাশে এক মুহূর্ত্ত যেরূপ সৌদামিনীর সমুজ্জ্বল প্রভার বিকাশ হইত, পরমুহূর্ত্তে সেইরূপ ঘোরতর অন্ধকারের আবির্ভাব ঘটিত। কিন্তু তিনি এইরূপ অব্যবস্থিত ও অধঃপতিত হইলেও হৃদয়গত কোমল ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রসময়ী কবিতায় তদীয় কোমল বৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি অর্থ পাইলে পরদুঃখমোচনের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন ; পরদিনে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে, এ ভাবনা তদীয় মনোমধ্যে স্থান পাইত না। এইরূপে তিনি একদিন দানশীল, অন্য দিন ভিক্ষা-প্রার্থী ছিলেন। মধুসূদনেরও এইরূপ দানশীলতা ছিল। নিজের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, মধুসূদন সর্ব্বদা পরকষ্টমোচনে উদ্যত থাকিতেন। এবিষয়ে তাঁহার সমক্ষে শত্রুমিত্রের পার্থক্য ছিল না। স্বদেশভক্তিতে, হৃদয়ের কোমলভাবে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে তিনি গোল্ডস্মিথকেও অতিক্রম করিয়াছেন। গোল্ডস্মিথ যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেন, মধুসূদন সেখানে কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উভয়ের কবিতাই স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম এক দিকে যেমন প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল ভাবের পরিচয় দিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ জাহ্নবীর জলধারার ন্যায় অসামান্য স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, লোকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে। মধুসূদন যখন ইয়ুরোপে যাত্রা করেন, তখন তিনি জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।"

গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি তাঁহার এইরূপ ভক্তি, এইরূপ প্রীতি এবং এইরূপ অনুরাগ কখনও মন্দীভূত হয় নাই। তিনি ইয়ুরোপে গিয়াছেন। ইয়ুরোপের বিভিন্ন জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার সমক্ষে সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিয়াছে। ইয়ুরোপের কবিকুল কবিত্বসুধায় তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সকলের মধ্যেও স্বদেশের বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই। স্বদেশের সহিত, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ স্বদেশের কথাই জাগরূক রহিয়াছে। বিদেশের তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, তিনি জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের বিষয় ভাবিয়া, নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। দান্তে, হ্যুগো প্রভৃতির ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, তিনি বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির নিকটে যথোচিত ভক্তিসহকারে অবনতমস্তক হইয়াছেন। আর

যাঁহার সাহায্যে তিনি সেই সুদূর দেশে—সেই অপরিচিত স্থানে অর্থাভাবজনিত দুঃসহ কষ্ট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি করুণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধাশন বা অনশন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া, সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

ফলতঃ ইয়ুরোপে প্রবাসকালে মধুসূদন যেন সর্ব্বাংশে জাতীয় ভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিলেন। তিনি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপঞ্চমী, দেবদোল, আশ্বিন মাসে বাঙ্গালীর মহোৎসবের কথা তাঁহার হৃদয়কে যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত করিত। পরদেশে বাস করিলেও তিনি স্বদেশের বিষয়বর্ণনায় আমোদিত হইতেন। পরকীয় ভাষা পরকীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিলেও তিনি বঙ্গভাষাকে লক্ষ্য করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে গাইতেন—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

ইয়ুরোপে মধুসূদন এইরূপ অনুতপ্তহৃদয়ে স্বদেশের জন্য, স্বদেশীয় বিষয়ের নিমিত্ত অনুক্ষণ শোকাশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। স্বদেশে তাঁহার শান্তিলাভ হয় নাই। তিনি স্বদেশে থাকিতে নৈরাশ্যে অধীর হইয়া গাইয়াছিলেন :—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় !
তাই ভাবি মনে ?
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় !"

বিদেশেও তাঁহার অদৃষ্টে এইরূপ অশান্তি, এইরূপ নৈরাশ্য ঘটিয়াছিল। বিশ্বসংসার যেন তাঁহার সমক্ষে মহামরুভূমির মত ছিল। মরুভূমধ্যে তৃষ্ণাকাতর পান্থ যেমন মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তিনিও সেইরূপ শান্তির আশায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে সংসারমরুতে বিচরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। যে সকল গুণ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের সহায়, তাঁহার হৃদয়ে সেই সকল গুণের অভাব ছিল না। শিক্ষা, সংসর্গ ও পরিণামদর্শিতা অনুকূল হইলে ঐ সকল গুণ সর্ব্বাংশে পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে সাধারণের বরণীয় করিয়া

তুলিত। কিন্তু তমোগুণের প্রতিকূলতায় অন্ধকারময় খনির মধ্যস্থ রত্নের ন্যায় তাঁহাতে ঐ সকল গুণের ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট হইত না। এক এক বার যখন অনুতাপানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিত, তখনই ঐ সকল গুণের বিকাশ হইত; এবং তখনই ঐ সকল গুণ তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিত। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে সদ্‌গুণবীজ রোপিত ছিল, তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইলেও সেই অঙ্কুর যথাকালে পরিবর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে নাই।

সংসারক্ষেত্রে মধুসূদন এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে অতৃপ্ত, সকল সময়ে অনুতাপদগ্ধ ও সর্ব্বস্থলে অশান্তিতে অবসন্ন পুরুষ। কিন্তু কাব্যজগতে তিনি অমৃতময়ী বাগ্দেবীর পরম স্নেহাস্পদ পুত্র এবং সহৃদয়সমাজে তিনি অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন, অসীম ক্ষমতাশালী, মহাকবি। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন এক দিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানবচরিত্রও সেইরূপ তাহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কবিতা প্রায়ই উদ্ভাবনা, উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহা বিমল স্রোতঃস্বতীর ন্যায় যেরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ আবেগময় হইয়া থাকে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে বটে, কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধিতে অনেক সময়ে কাব্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় না। সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থাতেই কবিতার সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সে ক্ষমতার গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা, মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে। কোমলমতি বালক যখন নীতিশিক্ষার জন্য হিতোপদেশে পথিক ও ব্যাঘ্রের কথা পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্রের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, সেই বলবতী জীবহিংসাপ্রবৃত্তি তাহার স্মৃতিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে। ব্যাঘ্র নিরন্তর তাহার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে। তাহার বাসগ্রামে ব্যাঘ্র না থাকিলেও, এবং সে উহার ভীষণ মূর্ত্তির সহিত পরিচিত না হইলেও, সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, ব্যাঘ্র যেন মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শিশু যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সভ্যতার আদিম অবস্থায় কোমলতি মানুষও সেইরূপ কল্পনা-স্রোতে ভাসমান হইয়া থাকে। তখন তাহার হৃদয় যেন কাব্যরসের অক্ষয় আধারস্বরূপ হইয়া উঠে। মানুষ সভ্যতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার চিন্তাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকভাব বৃদ্ধি হয়, এবং কবিত্বসুলভ পূর্ব্বতন কল্পনার উচ্ছ্বাস তাহার নিকট হইতে দূরীভূত হইতে থাকে। তখন সে সরলহৃদয় ভাবুক না হইয়া, প্রগাঢ় চিন্তাশীল দার্শনিক হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষের মনোগত ভাবপ্রকাশক ভাষা

যেমন কবিত্বের উপাদানে সংগঠিত হয়, সভ্যতার অবস্থায় তাহার ভাষা সেইরূপ বিচার-চাতুর্য্যময় দার্শনিক ভাবে জড়িত হইয়া উঠে।

কিন্তু আদিম অবস্থায় সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। প্রতিভা সকলকে কাব্যজগতের আধিপত্য প্রদান করে না। অধিকন্তু যত্ন করিলে বিজ্ঞান-প্রভৃতি শাস্ত্র লোকের আয়ত্ত হয়। কিন্তু যত্নাতিশয়ে কবিত্বসকলের অধিকৃত হয় না। এক জন গণিত ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া নিউটন বা ফ্যারাডের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন; কিন্তু এক ব্যক্তি আজন্ম কাব্যোদ্যানের ভাবকুসুমরাশির চয়নে ব্যাপৃত থাকিলেও শেক্ষপীয়র হইতে পারেন না। কবি মানুষের মনোগত ভাবের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; সমাজের উত্থান ও পতনের বিবরণ বিশদ করিয়া দিতে পারেন। একটি দার্শনিক বা বিজ্ঞানবিৎ কবির ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাস ইচ্ছা করিলে সাংখ্যকারের ন্যায় দার্শনিক বিচারে পটুতা দেখাইতে পারিতেন, কপিল ইচ্ছা করিলে বোধ হয়, একটি দুষ্মন্ত বা একটি শকুন্তলার সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় কবিত্বের বিকাশ হয়; কিন্তু সকলেই এই অসামান্য ও অতুল্য ক্ষমতাপ্রদর্শনে সমর্থ হয় না। আদিম অবস্থায় মানুষের ভাষা কবিত্বময় হইলেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি বলিয়া সম্মানিত হয়েন। কবি লোকের সমক্ষে মায়া বিস্তার করেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছায়াবাজির সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকারময় গৃহে ছায়াবাজি যেমন দর্শকের সমক্ষে নানা দৃশ্য বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে কবিতাও সেইরূপ মায়া দেখাইয়া, লোকের হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আলোকের সঞ্চারে ছায়াবাজির কৌশল যেমন ক্রমে অন্তর্হিত হয়, সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের সেই চিত্তবিমোহিনী মায়াও সেইরূপ অপগত হইতে থাকে। ফলতঃ কবিতা মানুষের অনুন্নত অবস্থাতেই অধিকতর কোমল, অধিকতর সরল ও অধিকতর চিত্তবিভ্রমকর হইয়া থাকে।

কিন্তু স্থলবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইলেও যে, সভ্যতার পূর্ণ অবস্থায় কবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এমন নহে। সভ্যযুগে এমন অনেক কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তৎসমুদয় অদ্যাপি সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, এবং যাঁহাদের প্রতিভাগুণে সেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে, তাঁহারা অদ্যাপি সমগ্র কবি-সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মিল্টনের ন্যায় কোন কবি সহৃদয়সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সভ্যতার আদিম অবস্থায় মিল্টনের আবির্ভাব হয় নাই। মিল্টন্ সভ্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সুশিক্ষালাভ হইয়াছিল। লাতিনে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি ইয়ুরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদের পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপের

প্রচলিত ভাষায় তাঁহার যথোচিত অধিকার ছিল। তিনি দার্শনিকভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ; দার্শনিক ভাবে তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেন এবং দার্শনিক তত্ত্বের সহিত দুরবগাহ রাজনীতির পরিচয় দিয়া, লোকের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায়, সভ্যযুগের অনুমোদিত এইরূপ সুশিক্ষায় এবং রাজনীতি ও দার্শনিক ভাবের এইরূপ জটিলতায় মিল্টনের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয় নাই। মিল্টন্ যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কাব্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মধুসূদন যে সময়ে আবির্ভূত হয়েন, সে সময়ে সভ্যতালোক যেরূপ উদ্দীপিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিও সেইরূপ উন্নতদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এদিকে মধুসূদন নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এবং নানা বিষয় দেখিয়া, বহুদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায় তাঁহার রসময়ী লেখনী হইতে যে কাব্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে প্রাধান্য রক্ষা করিতেছে। মিল্টন্ কেবল মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রের পঙ্কিলভাব দুর করিয়াও তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। যখন তাঁহার আবির্ভাব হয়, তখন ইংলণ্ডে তাদৃশ সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল না। দুর্নিবার্য্য পাপস্রোত ঐ শৃঙ্খলার মূলদেশ ক্রমে ক্ষয় করিয়া তুলিতেছিল। রাজা ভোগাভিলাষী হইয়া অপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছিলেন। পারিষদগণ বিলাসসুখে প্রমত্ত হইয়া অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। বিলাসিনী ললনাদিগের মধ্যে সুনীতিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ ভোগাভিলাষের বৃদ্ধির জন্য, এইরূপে উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সন্তোষসম্পাদন এবং এইরূপ বিলাসীদিগের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইত, তৎসমুদয়ের সহিত বিশুদ্ধ ভাবের সংশ্রব থাকিত না। গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা নির্গত হইত। নাট্যশালায়, সঙ্গীতে, কবিতায়, সর্ব্বত্রই এই তীব্র হলাহলস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইত। পিউরিটন্ সম্প্রদায় সুনীতির সম্মানরক্ষার জন্য এই স্রোতের গতি নিরুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন। ঐ সম্প্রদায়ের পরিপোষক মিল্টন্ উক্ত কুনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরভাবে, গম্ভীর ভাষায় যে মহাবাক্য প্রণয়ন করেন, তাহা ইংলণ্ডকে শতগুণে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। তাঁহার প্রতিভায় সাহিত্যের পঙ্কিলভাব দুরীভূত হয়। ভাবগাম্ভীর্য্য, রচনাচাতুর্য্যে ও সুনীতিগৌরবে মিল্টনের কাব্য ইংরেজীসাহিত্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। এদিকে মধুসূদনের সময়ে বাঙ্গালা কবিতায় তাদৃশ গাম্ভীর্য্য ছিল না। অনেক সময়ে উহাতে সুরুচির অবমাননা ঘটিত। ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করের কবিতাযুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরতিশয় অপকৃষ্ট ঘটনার মধ্যেই পরিগণিত রহিয়াছে। এই সকল কবিতা এরূপ পঙ্কিল ভাবে পরিপূর্ণ যে, উহাতে নয়নাবর্ত্তন করিলেও ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিতে হয়। এই পঙ্কিল ভাব কেবল ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহাদের অনুকরণকারী লেখকগণ গুণাংশের অনুকরণে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহারা নিরতিশয় অপকৃষ্ট বিষয়েরই

অনুকরণ করিতেন। সুতরাং অনুকরণের হীনতায় তাঁহাদের লেখনী হইতে এরূপ অপকৃষ্ট রচনা নির্গত হইত যে, তাহা ভদ্র সমাজের অপাঠ্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, অপকৃষ্ট লেখকগণ তাহার অধিকারী হইতে না পারিয়া, আপনাদের রচনা পঙ্কিল ভাবে অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন *। এই পঙ্কের মধ্যে রঙ্গলালের পদ্মিনীর যে অনুপম সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা অনাবিলভাবে সহৃদয়দিগের প্রীতি বর্দ্ধন করে। বাঙ্গালা কবিতার অনাবিল ভাব মধুসূদনের প্রতিভায় অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। যে আলোক স্তিমিতভাবে ছিল, মধুসূদনের ক্ষমতায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জল করে।

মধুসূদনের প্রতিভায় জাতীয় সাহিত্য সমুজ্জল এবং মধুসূদনের ক্ষমতায় জাতীয় সাহিত্য অভিনব পথে পরিচালিত হইলেও, মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই সেবক ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল যে, তিনি প্রথমে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। এক সময়ে মাতৃভাষায় ভালরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেও তাঁহার কষ্ট হইত। তিনি পৃথিবীকে প্রথিবী বলিতেন। সাহেবী ভাবে তাঁহার মতির যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সেইরূপ আচারাদিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেয় নাই। মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালে তিনি ইংরেজী ভাষায় আপনার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজীকাব্য তদীয় প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ হইলেও সাহিত্যসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তির কারণ হয় নাই। ক্যাপ্‌টিব্ লেডি প্রভৃতির লেখক কখনও বঙ্গীয় সমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং কখনও বোধ হয়, টেনিসন প্রভৃতির পার্শ্বে আসনপরিগ্রহে সমর্থ হইতেন না। বঙ্গভূমির সৌভাগ্যক্রমে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেলেগাছিয়ার রঙ্গালয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্য †। এই রঙ্গালয় মধুসূদনকে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত করে। এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতার

* ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে অনেকে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া কবিসমাজের প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ইঁহারা এই উক্তির লক্ষ্য নহেন। যাঁহারা সংবাদপত্রে প্রভাকরের হীন অনুকরণ করিতেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। এই সময়ে "আক্কেল গুড়ুম" নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখনভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থ ই গুড়ুম হইত।" (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা)। প্রভাকর ও রসরাজের হীন অনুকরণে এই অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছিল।

† পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তাঁহাদের বেলগাছিয়াস্থিত উদ্যানবাটীতে এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাতে প্রথমে রত্নাবলী নাটকের মধুসূদনকৃত ইংরেজী অনুবাদের অভিনয় হয়। মধুসূদন ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়া, বাঙ্গালায় নাটক লিখিতে উদ্যত হয়েন। এইরূপে তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রণীত হয়।

পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ সময়ে তদীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে মাতৃভাষাদ্বেষী পুরা সাহেব বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদন হয়। মধুসূদন কয়েক খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া, সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় যে নাটক প্রণয়ন করেন, সেই নাটক তাঁহার ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকে। ক্রমে পদ্মাবতী নাটক এবং দুই খানি প্রহসন প্রণীত হয়। নাটকে ও প্রহসনে তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইয়া উঠে। যিনি এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লিখিতে এবং বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জিত হইতেন; কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ ভিন্ন যিনি অন্য কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ করিতেন না, তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার শব্দযোজনার পরিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্য্য দেখিয়া, বাঙ্গালী পাঠকগণ সবিস্ময়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পূজায় অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালায় অনেক প্রহসন প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গালা কবিতায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনা মধুসূদনের প্রতিভার অসামান্য নিদর্শন। যখন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হয়, তখন ঐ কাব্যের প্রতি অনেকেই উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যে ও দূরদর্শিতায় সমাজে যাঁহারা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাঁহারাও মধুসূদনের অভিনব অমিত্রচ্ছন্দাত্মক কাব্য পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিনই বীরোচিত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। শত তিরস্কারে, শত অখ্যাতিবাদে, শত দোষঘোষণায় তাঁহার বীরধর্ম্ম কখনও বিচলিত হয় নাই। তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক প্রকাশ করেন, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অলঙ্কারগত ও রচনাবিষয়ক নানা দোষের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি যখন অমিত্রচ্ছন্দে প্রথম কাব্য প্রণয়ন করেন, তখনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধে নানা কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় মধুসূদন উহাতে দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি ধীরভাবে এবং তেজস্বিতাসহকারে কাব্যে ও নাটকে আপনার অবলম্বিত রীতি রক্ষা করিতে থাকেন। ধীরতা, তেজস্বিতা, ও বীরোচিত প্রকৃতির গুণে পরিশেষে মধুসূদন রণপারদর্শী, বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরবান্বিত হয়েন। তাঁহার কৃষ্ণকুমারীতে তদীয় রচনানৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়। যাঁহারা এক সময়ে শর্ম্মিষ্ঠা পড়িয়া মধুসূদনের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণকুমারী পড়িয়া তাঁহার প্রশংসাবাদে অগ্রসর হয়েন। যাঁহারা উৎকট অমিত্রচ্ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মেঘনাদবধে মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণবিকাশ দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখ হয়েন। তিলোত্তমাপাঠে তাঁহারা মুখ বিকৃত করিলেও মেঘনাদবধপাঠে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হয়। তাঁহারা অমিত্রচ্ছন্দের গৌরব বুঝিয়া, প্রীতিপুষ্পে প্রতিভাশালী মধুসূদনের অর্চ্চনা করিতে থাকেন। মহারাজা স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অমিত্রচ্ছন্দে কবিতাপ্রণয়ন

সম্বন্ধে মধুসূদনের এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব তাঁহার উৎসাহে লিখিত এবং তাহার অর্থে মুদ্রিত হয়। তিনি মেঘনাদবধে মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া, অপরিসীম প্রীতিলাভ করেন। মধুসূদন এইরূপে বাঙ্গালা কাব্যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিষয়ের অবতারণা করিয়া অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হয়েন। ভারতচন্দ্র কবিতাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, মদনমোহন এবং রঙ্গলাল যে পথের গৌরববর্দ্ধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মধুসূদনের প্রতিভায় সে পথ পরিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালা কবিতায় যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা প্রথমে কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু মধুসূদনের ক্ষমতায় সহৃদয়গণ অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া মনে করেন। মধুসূদন অসাধ্য সাধন পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিস্ময়ে যেরূপ স্তম্ভিত করেন, সেইরূপ কবিতারাজ্যেও চিরজয়ী এবং চিরগৌরবান্বিত প্রতিভাশালী মহান্ পুরুষ বলিয়া সম্পূজিত হয়েন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সংশ্রবে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। কিরূপে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে হয়; কিরূপে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হয়; কিরূপে সমাজতত্ত্বঘটিত বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়; রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় তাহার পথপ্রদর্শক। পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন দ্বারা তিনি বোধ হয়, এই পথ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা অভিনব পথে পরিচালিত হয়। কৃষ্ণমোহন এবং রাজেন্দ্রলাল এই পথের প্রসারণে সবিশেষ যত্ন করেন। ইহাদের নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালা ভাষা পাশ্চাত্য ভাষার সংশ্রবে নানা বিষয়ে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভাবলে এ বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামমোহন যে বিষয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার সেই বিষয় সুসংস্কৃত এবং সমধিক উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন সভ্য জনপদের ভাষা, ভিন্নদেশীয় উন্নতিশীল ভাষার সাহায্যে পরিপুষ্ট এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা পাশ্চত্য প্রণালীতে এবং পাশ্চাত্য ভাষার ভাবে সঞ্জীবিত হওয়াতেই উহার অভাবনীয় উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় বাঙ্গালা গদ্যে পাশ্চাত্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধুসূদনের প্রতিভায় বাঙ্গালা পদ্য অভিনব রীতিতে পরিচালিত হইয়া, গাম্ভীর্য্য ও ভাববৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। মধুসূদন দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা নবীন লতার ন্যায় কেবল কোমল ভাবে আনত থাকে না। উহা দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় অনেক কঠিন পদার্থকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। যে কবিতা এক সময়ে কামিনীর কোমলকণ্ঠধ্বনির ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নির্জীব ভাবের পরিচয় দিত, তাহা মধুসূদনের প্রতিভায় "মিত্রচ্ছন্দরূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া" এবং গম্ভীর শব্দমালায় গ্রথিত হইয়া, গভীর ভাব প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবরাজ্যে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিদেশীয় সাহিত্যের উপকরণে স্বদেশীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসাধন করিতে হইলে স্বদেশীয় রীতিনীতির

প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। মধুসূদনের এরূপ দৃষ্টি ছিল না। তিনি স্বয়ং যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন; তাঁহার কাব্যও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচায়ক হইয়াছে। তিনি আত্মপ্রকৃতি ও আত্মরুচি অনুসারে কবিতাদেবীকে বিদেশীয় ভাবরত্নে সজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ রত্ন জাতীয় প্রণালী অনুসারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই। তাঁহার নাটক—তাঁহার কাব্য প্রভৃতিতে যে সকল বিদেশীয় উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় জাতীয় ভাবের সহিত সম্মিলিত না হইয়া, বিজাতীয় ভাবেরই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি স্বদেশীয় কাব্য-কানন হইতে যে সকল ভাবকুসুম চয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় জাতীয় প্রকৃতির অনুগত হওয়াতে তদীয় কাব্যে জাতীয় ভাবের সমতা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আত্মসংযমের অভাব-প্রযুক্ত মধুসূদন বিজাতীয় ভাবের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রাধান্যরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য ভাবে এরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন যে, স্বদেশীয় ভাষা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পরিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবরাশি সর্ব্বাংশে তাঁহার নিকটে সমীচীন বোধ হইত। যে কোন প্রকারে হউক, ঐ সকল ভাব স্বদেশীয় সাহিত্যে সন্নিবেশিত হইলেই, তিনি সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ হইল বলিয়া, চরিতার্থ হইতেন। এই জন্যেই তাঁহার নিকটে রামায়ণ অপেক্ষা ইলিয়াদের অধিকতর সম্মান ছিল; এইজন্যই তিনি স্বদেশীয় পুরাণ অপেক্ষা গ্রীক পুরাণের অধিকতর গৌরব করিতেন এবং এই জন্যেই তিনি স্বদেশের উজ্জ্বল চরিত্রকে বিদেশের অপকৃষ্ট চরিত্রের ছায়াপাতে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষগুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষগুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষগুণ আছে, কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবে-চনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয়, মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালীর কবিতাতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দুপরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দুপরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুলসূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া, রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয়ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে *।" মধুসূদন মেঘনাদবধে বাল্মীকির পদচিহ্নের অনুকরণ করিলেও উহাতে এইরূপ বিজাতীয়

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা।

ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে। তিনি বিদেশীয় কাব্যের অনুকরণে বীরাঙ্গণা কাব্য লিখিয়াছেন; কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক কথার প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে এ কাব্যও বিজাতীয়-ভাব শূন্য হয় নাই। মধুসূদন যদি স্বকীয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রকৃতির সংযম করিয়া চলিতে শিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তদীয় রচনায় বিজাতীয় ভাবের সংস্পর্শ ঘটিত না।

সমালোচক মহোদয়গণ মধুসূদনের রচনাগত অনেকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল দোষের মধ্যে 'বাক্যের জটিলতা, প্রাঞ্জলতার অভাব, উৎকট শব্দের সন্নিবেশ, অনুপযোগী উপমাসমূহের সমাবেশ, প্রথাবহির্ভূত ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভা এবং কল্পনার অপূর্ব্ব চাতুরী তাঁহার রচনার সমস্ত দোষের মধ্যেও তাঁহাকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। মধুসূদন স্বকীয় রচনার সকল স্থলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ কোমল ও শ্রুতিমধুর শব্দের বিন্যাস করেন নাই। কিন্তু তিনি যে, শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাসে অসমর্থ ছিলেন, তদীয় ব্রজাঙ্গনা ও ক্ষুদ্র কবিতাবলী পাঠ করিলে, তাহা প্রতীত হয় না। অমিত্রচ্ছন্দেও যে, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা তিনি "বীরাঙ্গণায়" দেখাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে তিনি অপ্রসিদ্ধ ও উৎকট শব্দের সন্নিবেশের ইচ্ছা সংযত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় ললিত পদাবলীর মাধুর্য্য আছে। রাধিকার পূর্ব্বরাগ, বিরহ প্রভৃতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রজাঙ্গনাকার বৈষ্ণব কবিদিগের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মাধুর্য্যের যে অক্ষয়-ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত মধুসূদনের মধুপ্রবাহের তুলনা হয় না।

মধুসূদন শব্দযোজনার চমৎকারিত্বে যেমন ভারতচন্দ্রের নিম্ন স্থানে অবস্থিত, স্বভাববর্ণনে ও জাতীয় ভাবের রক্ষণে সেইরূপ মুকুন্দরামের নিম্নগণ্য। কিন্তু কল্পনার লীলায় এবং গভীর ভাবের বর্ণনায় তিনি বঙ্গের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ কবিকে অতিক্রম করিয়াছেন। কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের মেঘনাদবধসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি?

" * * * বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব

তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কই? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়;—বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জ্জন নাই,—মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন শ্রবণ তৃপ্তিকর *।" সমালোচক মহোদয় এস্থলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতার উল্লেখ করেন নাই। মধুসূদনের কাব্যে যে, অপূর্ব্ব কল্পনাবিভ্রম আছে, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে কাব্য স্বাভাবিক বর্ণনায় ও জাতীয়ভাবে উন্নত, কাব্য-জগতে তাহাই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়া থাকে। পুষ্পাভরণা বনলতা যেমন প্রকৃতিপ্রদত্ত সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী হয়, এই কবিতাও সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা হইয়া, পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। যত্নসাধ্য কৃত্রিম শোভা এই সৌন্দর্য্যের সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করে। মুকুন্দরামের কবিতা অযত্নসম্ভূতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে গৌরবান্বিতা বনলতার সদৃশ। উহাতে কৃত্রিমতা নাই; বিলাসচাতুরী নাই; কঠোরতার সমাবেশ নাই; উহা অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমুগ্ধা; অপরেও সেই সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনে বিমুগ্ধ। মুকুন্দরাম এই গুণে বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া, যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গুণে কবিসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। ফলতঃ মধুসূদনের কবিতা কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন। অযত্নসম্ভূত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শিল্পকৌশলের সহিত সংযোজিত হইলে যেমঃ স্থলবিশেষে অধিকতর উজ্জ্বল এবং স্থলান্তরে অপরিস্ফুট ও অনুজ্জ্বল হয়, মধুসূদনের কবিতাও সেইরূপ কোথাও উজ্জ্বল এবং কোথাও বা অনুজ্জ্বল হইয়াছে। শিল্পী ধীরে ধীরে নানা দিক দেখিয়া, প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর আপনার শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়া থাকে; প্রাকৃতিক বিষয়টি যে ভাবে রাখিলে ভাল হয়, ধীরতার অভাবে বা বিবেচনার ত্রুটিতে, সকল সময়ে হয় ত তাহার হস্তে সেই ভাব রক্ষিত হয় না। কাব্যজগতে মধুসূদনও এক জন শিল্পীর তুল্য। তিনি স্বাভাবিক ভাবের উপর শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রণালীতে তিনি শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার কবিতা এই শিল্পকৌশলেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেখানে তিনি নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অধিকতর কৌশলপ্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছেন, সেই খানেই তাঁহার কবিতা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ এই কারণেই কমনীয় প্রাকৃতিক ভাবের সংরক্ষণে বঙ্গের প্রাচীন কবিকুলের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন।

সাহিত্যসংসারের অনেক প্রতিভাশালী লেখক, পদ্যরচনায় যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, গদ্যরচনাতেও সেইরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মিল্টন যেরূপ মহাকবি, সেইরূপ প্রধান গদ্যলেখক। তাঁহার পদ্যে যেরূপ ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য আছে; তাঁহার গদ্যও সেইরূপ ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। আডিসন, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতিও

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মেঘনাদবধসমালোচনা।

কবিত্বশক্তির ন্যায় গদ্যরচনায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনে এই দুই গুণের সমাবেশ হয় নাই। মধুসূদন হেক্টরবধনামক এক খানি গদ্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গদ্য যেরূপ প্রাঞ্জলতাপরিশূন্য, সেইরূপ উৎকট, অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত ক্রিয়ার সমাবেশে লালিত্যহীন। মধুসূদন প্রতিভাশালী কবি বলিয়াই পরিচিত। কবিতা-রাজ্যে তিনি অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনাচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্যে তাঁহার ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় নাই।[৫০]

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সংসারে মধুসূদনের প্রীতিদায়ক, মধুসূদনের তৃপ্তিসাধক, মধুসূদনের শান্তিসম্পাদক, কিছুই ছিল না। মধুসূদন সংসারমরুতে তৃষ্ণাকাতর, উদ্‌ভ্রান্ত পান্থস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার হতাশহৃদয়ে যে নিদারুণ তুষানল প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আসিলেও, তিনি স্বদেশে আপনার অভাব-মোচনে সমর্থ হয়েন নাই। চিত্তসংযমের অভাবে তিনি কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই ঘোরতর অশান্তি, তীব্রতর নৈরাশ্যের জ্বালায় নিরন্তর অস্থির ছিলেন। তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয়ে কখনও শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। তিনি কয়েকখানি অভিনব কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অশান্তিপ্রযুক্ত কোনও খানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সঙ্গতি-পন্ন গৃহস্থের একমাত্র পুত্র হইয়াও, তিনি অর্থাভাবে কষ্টের এক শেষ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন যেন অনন্ত কষ্টের অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ ছিল। তিনি বিদেশে থাকিয়া, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে যে মর্ম্মজ্বালা প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও সে জ্বালার বিরাম হয় নাই। কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষার্থীও শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মধুসূদনের দুরদৃষ্টে সংসারের সুখ বা শান্তি, কিছুই ঘটে নাই। বঙ্গের প্রতিভাসম্পন্ন হতভাগ্য কবির অনন্তকষ্টময় জীবন এইরূপ অশান্তিতেই শেষ হয়।

চিত্তসংযমের অভাবে, উদ্দাম ভোগলালসার প্রাদুর্ভাবে, নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরও কিরূপ দুরবস্থা ঘটে, মধুসূদনের জীবন তাহা দেখাইয়া দিতেছে। মধুসূদন সত্ত্বগুণে আকৃষ্ট হইলে সংসারে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতেন না। সত্ত্বগুণের অভাবপ্রযুক্ত তিনি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক, স্বকীয় নামে শ্রীর পরিবর্ত্তে "মাইকেল" এই বিজাতীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া, বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দেন ; সত্ত্বগুণের অভাবে তিনি অপেয় পান ও অখাদ্যভোজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন ; সত্ত্বগুণের অভাবেই তিনি প্রিয়তম পরিজনের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাতরম্য ভোগলালসায় আকৃষ্ট হইয়া, আপনিই আপনার দুঃসহ কষ্টের কারণ হয়েন। তীব্র সুরা যেন তাঁহার জীবনসহচরী হইয়াছিল। তিনি উহার দর্শনে প্রীত হইতেন ; উহার ঘ্রাণে উল্লাস প্রকাশ করিতেন ; উহার স্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার এই তমোগুণময়ী প্রকৃতিই বোধ হয়, তাঁহাকে রাক্ষসকুলের সহিত প্রীতিসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন—"তাঁহার কাব্য-সমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমার, বার্জ্জিল, মিল্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, ভবভূতি প্রভৃতি

নানা দেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনই বহুজনের প্রকৃতির সম্মিলনে সংগঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে এবং গাম্ভীর্য্যে তিনি মিল্টন; উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রণ; ঔদার্য্য এবং মহাপ্রাণতায় তিনি বরন্স্; অমিতব্যয়িতা এবং পরদিনের চিন্তায় ঔদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ডস্মিথ্। * * * মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রে যদি তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহা তাহার মেঘনাদবধের রাবণেই হইয়াছে। * * মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহবান পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী, সাগরপরিখা-বেষ্টিতা লঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র; সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। * * কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র, অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া, আর কাহারও বুঝি তাঁহার ন্যায় অধঃপতন হয় নাই। যে বিকশিত কুসুম তাঁহার হৃদয় উদ্যান সুশোভিত করিত, যে উজ্জ্বল তারাবলী তাঁহার জীবনাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিত, বিধিবশে নয়, তাঁহার নিজ দোষে, সে কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত, এবং সে তারকামালা অস্তমিত হইয়াছিল। * * রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পাঠক মধুসূদনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সাংসারিক সুখসম্পদের জন্য, মনুষ্য বিধাতার নিকট যে সকল বস্তু কামনা করে, যাচ্ঞা ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * তিনি ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান; ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি বারিষ্টার; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহে তিনি সুপণ্ডিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ, গুণপক্ষপাতী এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা; সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা এবং স্বদেশবাসিগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর অতি ঘোরান্ধকারময় রজনী মধুসূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছিল। * * পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে; কিন্তু বঙ্গের নব্য কবিশিরোমণির তাহাও ছিল না। যে পরান্নভোজন এবং পরগৃহে অবস্থান, আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল; তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ কখনও উপবাসে কখনও পর্য্যুসিত অন্নে দিনপাত করিত; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন বিনা-পথ্যে—বিনাচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, এসমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর সর্ব্বশেষে তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যাঁহার রচনা পাঠ করিয়া, সহস্র সহস্র নরনারী

তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন, মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন আর কেহ যে, তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে ?" *

চিত্তসংযমের অভাবপ্রযুক্ত মধুসূদন যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তিনি স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খলভাবের জন্য সংসারে অতি কঠোর শাস্তিই ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে; তাঁহার প্রাণাধিক সন্তান বিনা-চিকিৎসায় দেহ ত্যাগ করিয়াছে; তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী তীব্র যাতনানলে দগ্ধীভূত হইয়া, এই রোগশোকতাপময় সংসারের নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; আর তিনি আজীবন নৈরাশ্যে কাতর, অভাবে অবসন্ন, দুঃসহ কষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া, অযোগ্য স্থানে অপরিচিত, দরিদ্র লোকের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার কঠোর শাস্তি আর হইতে পারে না। কিন্তু তিনি যে, মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকটে তিনি সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তদীয় অসামান্য প্রতিভার সমুচিত গৌরব রক্ষা করেন নাই। স্বদেশের সম্ভ্রান্ত ধনী অমিত্রচ্ছন্দাত্মক কাব্যপ্রণয়নে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; সম্ভ্রান্ত ধনীর অনুগ্রহে তিনি ভাগীরথীতটশোভী, প্রশস্ত প্রাসাদে কিছু দিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার নাটকে সম্ভ্রান্ত ধনীর নাট্যশালা গৌরবান্বিত হইয়াছিল; তাঁহার কাব্যপাঠে তদীয় বঙ্গীয় অধিবাসীগণ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রতিভার সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে অনেকে স্বদেশীয় ধনীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছেন। স্বদেশীয় ধনীর সাহায্যে ও উৎসাহে অনেক কাব্য প্রণীত হইয়াছে। এইরূপ আশ্রয় না পাইলে বোধ হয়, দরিদ্র কবিগণের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না; অনবদ্য কাব্যকুসুমও বোধ হয়, যথাসময়ে বিকশিত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্র আমোদিত করিত না। কবিদিগের এই সকল আশ্রয়দাতা যেরূপ কবিত্বের গুণগ্রাহী, সেইরূপ কবির প্রতিভার সম্মানরক্ষক ছিলেন। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে এইরূপে গুণগ্রহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর অনুগ্রহে যেরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, মুসলমানের অনুগ্রহেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণীত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে দেশেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। যে জাতি পরের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত, পরের সন্তোষসাধন জন্য যত্নশীল, পরকীয় সাহায্যে আত্মক্ষমতার বিস্তারে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, তাহাদের মহত্ত্ব, তাহাদের স্বদেশানুরাগ আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাংশে পরমুখপ্রেক্ষী হওয়াতে তাহারা আপনাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে না। সুতরাং স্বদেশের প্রতি তাহাদের মমতা ও আস্থার হ্রাস হয়; স্বদেশীয়দিগের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, তাহাদের অমনোযোগ বা অনাদরের বিষয়মধ্যে গণ্য

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত।

হইয়া উঠে। অধুনা আমাদের এইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। বিদেশীয়দিগের আধিপত্যে আমাদের প্রকৃতি এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা স্বদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছি না। আমরা কর্ণেল নীলকে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হই, কিন্তু সীতারামের নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করি। কাউপারের স্মৃতিচিহ্নস্থাপন জন্য চাঁদা দিতে আমাদের আগ্রহ হয়, কিন্তু হতভাগ্য কবিকঙ্কণের জন্য এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। স্বদেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিতের দেহাত্যয় হইলে আমারা কোমলমতি বালক অথবা মুগ্ধস্বভাবা নারীর ন্যায় কাতরভাবে কেবল রোদন করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় অসামান্য প্রতিভার সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হই না। আমাদের দৃঢ়তার এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, কেবল রোদন ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই। আমরা রোদনের জন্য ভূমিষ্ঠ হই, চিরজীবন রোদন করিয়াই জন্মভূমির নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করি। দৃঢ়তার অবনতির সহিত আমাদের চরিত্রেরও এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, আমরা আপনাদের জন্য যৎসামান্য যত্ন করিতেও উদ্যত হই না। ইংলণ্ড এখন আমাদের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা হইয়াছে। আমরা সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে নিরতিশয় দারিদ্র্যদুঃখের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। এই সময়ে আমাদের দেশে প্রতিভার অনাদর ছিল না। সদাশয় ধনীর সাহায্যে বাগ্দেবীর উপাসকগণ পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের অসীম সৌভাগ্য; কিন্তু বর্ত্তমান কালেই আমাদের দেশের প্রতিভাসম্পন্ন সুলেখকদিগের একান্ত দুরবস্থা। ইংলণ্ডের লোকে উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা অবনতিপথে অধঃপতিত হইয়াছি। লর্ড চেষ্টরফীল্ড এক সময়ে জন্সনের প্রতি যেরূপ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ধনিগণ স্বদেশীয় সাহিত্যসেবকদিগের প্রতি সেইরূপ দাক্ষিণ্য দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। জন্সন যেরূপে ঐ দাক্ষিণ্যের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন; আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন থাকিলে স্বদেশীয় সাহিত্যবীরদিগের বীরত্ব ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তেজস্বী জন্সনের নিকটে লর্ড চেষ্টর্‌ফীল্ডের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছিল; আমাদের দেশের কোন প্রতিভসম্পন্ন পুরুষের নিকটে অস্মদ্দেশীয় কোন ধনকুবেরের সেরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। যাহা হউক, মধুসূদন এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেশে এইরূপ সমবেদনাহীন লোকের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা নিরন্তর পরানুগ্রহপ্রার্থী হইয়া, আপনাদের হীনতার পরিচয় দিতেছে, তাহাদের সমক্ষে মধুসূদন যে, অন্তিম কালে আশ্রয়বিহীন হইয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। স্বদেশীয়দিগের বেদনাবোধ থাকিলে তিনি শান্তভাবে সংসারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেন। মধুসূদনের জীবনী কেবল মধুসূদনের অন্তিমকালীন শোচনীয় অধঃপতনের কথা প্রকাশ করিতেছি না।

উহা মধুসূদনের স্বদেশীয়দিগের অধঃপতনেরও সাক্ষ্য দিতেছে। স্বদেশীয়গণ অধঃপতিত হওয়াতেই প্রতিভাসম্পন্ন মধুসূদন শেষ কালে যাতনার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ধনী যদি তদীয় প্রতিভার গৌরব বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানগণ পর্য্যুসিত অন্নে উদর পূর্ত্তি করিত না, এবং তিনিও নিরতিশয় শোচনীয় ভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহ ত্যাগ করিতেন না। মধুসূদন যদি কোন রূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের দরিদ্রের নিকটেই তিনি তাহা পাইয়াছেন। ধনী যখন বিলাসতরঙ্গে দুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসী, দরিদ্র, করুণাসাগর তদীয় দুঃখানলে শান্তিসলিলপ্রক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মহৎ কার্য্য যখন ধনীর সমক্ষে অনাদর বা অমনোযোগের বিষয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার স্বদেশের এক জন দরিদ্র অধ্যাপকই তদীয় সমাধির উপর স্মৃতিচিহ্নস্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচিত মধুচক্র কখনও মধুহীন হইবে না। গৌড়জন চির কাল তাহা হইতে মধু পান করিবে। চির কাল শত শত নরনারী তাঁহার কাব্যপাঠে আমোদিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অশ্রুপ্রবাহে প্লাবিত হইবে, কিন্তু মধুসূদনের স্বদেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনী তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সম্মানরক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কলঙ্ক কখনও অপসারিত হইবে না। মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধিকারীর প্রদীপ্ত প্রতিভার অনাদর মাতৃভাষার ইতিহাসে তাঁহাদের সুকীর্ত্তির পরিবর্ত্তে অপকীর্ত্তিরই ঘোষণা করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সংস্করাদি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল, সুলেখক ব্যক্তি কোন কোন সাময়িক ও সংবাদপত্রে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ এবং নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। পরিষদ-পত্রিকায় ঐ সকল মতের সারাংশ প্রকাশ করিলে ভাল হয়।" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাব সঙ্গত। আমরা উহার অনুমোদন করি। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে যিনি যাহা লিখিবেন, যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে তাহা পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে একবার এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। ঐ আলোচনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখক মহাশয়গণও স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া দীর্ঘকাল পরে উহা শেষ হইয়াছে। এই সকল মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অথবা মাতৃভাষার হিতৈষী অন্য কোন ব্যক্তি যদি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে উহা পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে।

* * *

বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কারের সহিত ভাষার গঠনপ্রণালীর নির্দ্ধারণ অতি গুরুতর বিষয়। পরিষদ এই গুরুতর বিষয়ে উদাসীন রহেন নাই। একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালা ব্যাকরণ-প্রণয়নে পরিষদ পূর্ব্বাবধি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব পরিষদে উপস্থিত হইলে পরিষদ সবিশেষ উপকৃত হইতে পারেন। পরিষদ বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, কার্য্য করিতেই অগ্রসর হইয়াছেন। এ সময়ে বঙ্গভাষানুরাগী মহোদয়গণ পরিষদের সাহায্য করিলে ভাল হয়।

* * *

ভাষাসংস্কার প্রসঙ্গে এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দীর্ঘকাল হইল, পরিষদ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এখন ভূগোলের পরিভাষা স্থির হইতেছে। বিজ্ঞানের ও জ্যোতিষের পরিভাষা সম্বন্ধে পরিষদ পত্রিকায় আন্দোলন চলিতেছে। যে ভাবে আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও উপস্থিত বিষয় শেষ হইবে না। যে সকল সুশিক্ষিত ও সুলেখকগণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষার এক একটি সম্পূর্ণ তালিকা

প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এক এক বিষয়ের পরিভাষার সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য শেষ হইতে পারে, নচেৎ এক একটি কথা লইয়া বাদবিতণ্ডা করিলে দীর্ঘকালেও উহা শেষ হইবে না।

উদ্দেশ্যনিরূপণ ব্যতিরেকে কার্য্যারম্ভ অনেক সময় নিষ্ফল অধ্যবসায়ে পরিণত হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য হইলেও কিরূপে সেই উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে এখনও ঐকমত্য দেখা যায় না। কেহ কেহ পরিষদকে অনুবাদকসমাজের পথানুসরণ করিতে বলেন। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না, উহাকে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া না লইলে সম্যক্ ফললাভ ঘটে না। মনুষ্য এবং সমাজমাত্রেরই শক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধনীয় বিষয়টিকে শক্তির পরিমাণ মতে সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ভাষার উন্নতি ও সাহিত্যের উন্নতি বিবিধ উপায়ে হইতে পারে। বঙ্গদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত আছেন। কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, যাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সুসাধ্য নহে, তজ্জন্য ব্যক্তি-সমষ্টি বা সমাজের সমবেত শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। পরিষদের ন্যায় ব্যক্তিসমষ্টি এই সকল কর্ত্তব্যসম্পাদনেই নিয়োজিত হইয়াছেন। যাহা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সাধ্য, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, ব্যক্তিসমষ্টি কর্ত্তৃক সম্পাদনীয় কর্ত্তব্যে পরিষদের কার্য্য সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উদ্ধার-সাধন প্রভৃতি মহৎ কার্য্য পরিষদের কর্ত্তব্যের অন্তর্নিবিষ্ট। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধনির্ণয়, বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত বিবিধ প্রাদেশিক উপভাষার পরস্পর সম্বন্ধবিচার প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান হয় নাই, বলিলেই হয়। বীমস্, গ্রিয়ার্সন, হর্ণ্‌লি প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কতক কতক অনুসন্ধান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক কার্য্যক্ষেত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী-গণের সম্মুখে রহিয়াছে। পরিষদের আশ্রয়ে এই সকল গভীর তত্ত্বের অনুসন্ধান চলে, এই জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি। পণ্ডিতসমাজের যত্নে এইরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে কত দূর ফললাভ হইতে পারে, বাঙ্গালার এসিয়াটিক্ সোসাইটি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। আশা করা যায়, পরিষদ বয়োবৃদ্ধির সহিত আপনার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবেন। জ্ঞানসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানাদির আলোচনা বা বৈদেশিক গ্রন্থের অনু-বাদাদি কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের যত্নে সম্পাদনীয়। উহা ঠিক পরিষদের মত সমাজের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। তবে উপদেশ, আলোচনা বা আর্থিক সাহায্য দ্বারা স্থলবিশেষে পরিষদ ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের সহায় হইতে পারেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(সাহিত্য বিভাগ)

৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।] [১৩০৩, শ্রাবণ।

উড়িয়া ভাষা।

ভারতের সকল স্থানে আবহমান কালপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে হিন্দী, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মরাঠী এবং গুজরাটী প্রভৃতি আর্য্যভাষা কালের বিবর্ত্তনে আবির্ভূত হইয়াছে। যে ভাষা লইয়া আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের আগমন সময়ে সংস্কৃত নামে অভিহিত না হইলেও, পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত নামে প্রথিত, ব্যাকরণ-সংযত, বয়োবৃদ্ধ, লিখিত ভাষার শৈশবীয় অভিব্যক্তি কিম্বা পূর্ব্বরূপ মাত্র। আর্য্যদিগের ভারতবিজয়কালে সেই ভাষার কি নাম ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু তাহাই যে কথিত ভাষা-রূপে আর্য্যবংশীয়গণ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্যবহার করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। কালক্রমে লোকমুখে বিচরণশীল জীবন্ত ভাষার পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে ঐ প্রাচীন আর্য্যভাষা প্রাকৃতরূপে পরিণত হইয়া কোথাও শৌরসেনী, কোথাও মহারাষ্ট্রী, কোথাও বা পালি বা মাগধী নামে অভিহিত হইল। ঐ প্রাকৃত ভাষাই আধুনিক হিন্দী প্রভৃতির মাতা। সুতরাং মূল আর্য্যভাষাকে আধুনিক ভাষাগুলির মাতামহী বলিতে পারা যায়।

পশ্চিমে নাগপুর ও ছোটনাগপুর প্রদেশ, উত্তরে বঙ্গ, দক্ষিণে তৈলঙ্গ, এই সীমান্তর্গত বিস্তৃত ভূভাগে প্রায় এক কোটী লোক উড়িয়াকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। উড়িয়া ভারবাহক বেহারাদিগের দেশ এবং উড়িয়া সাহিত্য-বিবর্জ্জিত বর্ব্বর ভাষা—এই সংস্কার

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকের মনে বদ্ধমূল ছিল। এখনও উক্ত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে উভয় প্রদেশের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা দিন দিন অপসারিত হইতেছে। উড়িষ্যাবাসীদিগের মধ্যে আর্য্য-বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় লোকদিগের সংখ্যা অপর জাতীয় লোকদিগের তুলনায় অল্প নহে এবং উড়িয়া ভাষা যে বাঙ্গালার নিকটতম ভগিনী এবং প্রাচীন-সাহিত্যশালিনী, তাহা এখন অনেক বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলির মধ্যে আধুনিক উড়িয়ার সহিত বাঙ্গালার যতটা সাদৃশ্য এবং নিকট সম্বন্ধ, ততটা অন্য কোন ভাষার নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয়, বাঙ্গালার উপভাষা মাত্র; ভাষার গঠন এবং ইতিহাস উভয় দিক্ হইতে দেখিলে স্বাতন্ত্র্য বিশদরূপে উপলব্ধি হয়।

আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে ঠিক্ কোন্ সময়ে বা কোন্ পথে উড়িষ্যায় আগমন করেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সমকালবর্ত্তী সামন্তনৃপতি বৌদ্ধরাজা ঐরের[১] এবং তৎপরে বৌদ্ধ মহারাজ অশোকের সময়ে যে উড়িষ্যার সঙ্গে মগধের ঘনিষ্ট সংস্রব ছিল, সে বিষয়ে উদয়গিরির প্রস্তরলিপি, ধৌলিগিরির শিলাখোদিত অশোকানু-শাসন এবং গুম্ফা প্রভৃতি উড়িষ্যার নানা বৌদ্ধকীর্ত্তি অকাট্য প্রমাণরূপে বিরাজিত রহি-য়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধপ্রভাব বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু তাহার পরেও উড়িষ্যা মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের প্রতিষ্ঠিত বা অধীনস্থ কেশরীবংশীয়[২] রাজগণের শাসনে ছিল। সুতরাং বলিতে হইবে যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপর দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় চতুর্দ্দশ শত বৎসর উড়িষ্যা মগধের সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে সংসৃষ্ট ছিল। কেশরীবংশীয় নৃপতিগণের সময়েও মধ্যদেশ (প্রয়াগ অঞ্চল) এবং মগধ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-পরিবার উৎকলে আনীত হইবার প্রবাদ প্রচলিত আছে। অতএব উড়িয়া ভাষা যে প্রথমে মাগধীয় প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন এবং তৎপরবর্ত্তীকালে মধ্যদেশী এবং মাগধী-হিন্দীভাষার প্রভাবাক্রান্ত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বোধ হয় উৎকলের বৌদ্ধগণই (?) ওঢ় বা ওড় নামে পরিচিত। উৎকলের ভুবনেশ্বর-খণ্ডগিরি-সন্নিহিত অঞ্চলই বিশেষরূপে ওড় বা ওঢ়দেশ বা ওড়িশা নামে প্রখ্যাত এবং ঐ অঞ্চলেই বৌদ্ধদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এরূপ স্থলে 'বৌদ্ধ' (?)শব্দ হইতে ওড় শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হইতেছে না। শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পতনে তাহারা উড্র নামে পতিত ক্ষত্রিয়শ্রেণীতে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ ওঢ়গণের নামানুসারে 'ওড়িশা' ভূখণ্ড এবং উড়িয়া ভাষার নামকরণ হইয়াছে*।

১।২ ইত্যাদি সংখ্যা-নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে মন্তব্য, প্রবন্ধের শেষে ঐতিহাসিক টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

* যে দেশকে বাঙ্গালায় "উড়িষ্যা" বলে, তাহার প্রকৃত নাম "ওড়িশা" এবং ঐ নামেই লোকদিগের মধ্যে লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। সেইরূপ "উড়িয়া" না বলিয়া "ওড়িয়া" বলা যায়। দেশের সংস্কৃত নাম উড্র দেশ।

কেশরীবংশীয় রাজগণের পর গঙ্গাবংশীয়[৩] রাজগণের অভ্যুদয় এবং প্রাদুর্ভাব। গঙ্গা-বংশীয়েরা দ্রাবিড়কুলোদ্ভব বা তৈলঙ্গভাষী না হইলেও গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ হইতে উৎকলে আসিয়াছিলেন, সুতরাং দাক্ষিণাত্যপ্রভাব তাঁহাদিগের সময়ে উড়িয়া ভাষার উপর সংক্রান্ত হইতে লাগিল, কিন্তু সে প্রভাবের আরম্ভ সময়ে (একাদশ শতাব্দী) উড়িয়া ভাষা সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহা দ্বারা উড়িয়া ভাষার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে নাই। উড়িয়া ভাষার অক্ষর পূর্ব্বপ্রচলিত মাগধী কুটিল লিপির রূপান্তর মাত্র[৪]। কেবল তৈলঙ্গাক্ষর গোল বলিয়া উড়িয়া অক্ষর গোল হইয়াছে। ইহাই দাক্ষিণাত্য প্রভাবের ফল বলিয়া বোধ হয়। তাহার উপর তালপত্রে লৌহলেখনী সাহায্যে লিখন উহার গোল হইবার অপর কারণ অনুমিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের হিন্দীভাষী অঞ্চল উৎকলের সন্নিহিত। সেই কারণে বাঙ্গালা এবং হিন্দীর প্রভাব উড়িয়া ভাষার ভিতর লক্ষিত হইয়া থাকে। একে মধ্যদেশ এবং মগধ হইতে যে আর্য্যগণ উৎকলে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের সংস্রবে হিন্দীর প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল, তাহার উপর হিন্দীর সান্নিধ্য থাকাতে সেই প্রভাব বদ্ধমূল হইল। গঙ্গাবংশের চরম কালে চৈতন্য গোঁসাই উড়িষ্যায় আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমস্ত উৎকলে পরিব্যাপ্ত হইল এবং অনেক বাঙ্গালী উৎকলে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সূত্রে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ উড়িষ্যায় প্রচারিত হইল এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিল। ঐ সকল বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ উড়িয়া অক্ষরে লিখিত, এখনও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা বৈষ্ণবসংকীর্ত্তন এখনও উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। এইরূপে বোধ হয় কবিকঙ্কণাদি পুরাতন বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থের কোন কোন শব্দ এবং আধুনিক প্রচলিত কোন কোন উড়িয়া শব্দের মূল এক। যথা বাহুড়িয়া, ঠাট প্রভৃতি উড়িষ্যায় অতিশয় প্রচলিত। ইহার পর মুসলমান এবং মরাঠাদিগের প্রাধান্য কালে অনেক আরবী, পারসী এবং মরাঠী শব্দ উড়িয়া ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গঙ্গাবংশীয় নরপতিদিগের সময়ে কুটিললিপি এবং তৈলঙ্গ-লিপি উভয়ের সংযোগে উৎকলাক্ষর উদ্ভূত হয়[৪]। উড়িয়া অক্ষরে মাদলাপঞ্জী নামক ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রন্থ প্রায় ছয়শত বৎসর হইতে লিখিত এবং সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং লিখিত উড়িয়া ভাষা যে অন্ততঃ ছয়শত বৎসরের হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ৬ শত বৎসরের পূর্ব্বের কোন গ্রন্থ আছে কি না জানিনা। উড়িয়া ভাষা প্রাকৃতের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ, তাহা নিম্নলিখিত শব্দ নির্ঘণ্ট হইতে প্রতিপন্ন হইবে। তাহা হইতে উড়িয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

প্রাকৃত	উড়িয়া	সংস্কৃত
ঘিঅ	ঘিঅ	ঘৃত
মুহঁ	মুহঁ	মুখ
সাহু	সাহু	সাধু
গণ্ঠি	গণ্ঠি	গ্রন্থি
বীঅ	বীঅন	বীজ
ঠিআ	ঠিআ	স্থিত
সাখর	সাকর	শর্করা
খম্ভো	খম্ব	স্তম্ভ
পিঅর	পিঅর	পিতা
বোলই	বোলই	ব্রবীতি (বলে)
গোড়	গোড়	গোদ ? (পা)
পোথর	পোথরী	পুষ্করী
তুন্হী	তুনি	তুষ্ণী
সোঅ	সূঅ	স্রোত
পঢুম	পঢুআঁ	প্রথম
মহু	মহু	মধু
অচ্ছই	অছই	অস্তি
অছন্তি	অছন্তি	সন্তি
পিঅন্তি	পিঅন্তি	পিবন্তি
ভোখ	ভোক	বুভুক্ষা
হলিঅ	হলিআ	হালিক
সুআর	সুআর	সূপকার
পন্তি	পন্তি	পঙ্‌ক্তি
আপণ	আপণ	আত্মন্
এট্ঠা	এঠা	অত্র
কিস	কিস	কিম্
কহিঁ	কাহিঁ	কুত্র
যহিঁ	যহিঁ	যত্র
তহিঁ	তহিঁ	তত্র
গহীর	গহীর	গভীর
গেন্হই	ঘেনই	গৃহ্ণাতি
চৌঠী	চৌঠী	চতুর্থী
ছামুহ	ছামু	সম্মুখ
বেণ্ট	বেণ্ট	বৃন্ত
পুণ	পুণ	পুনঃ
মউড়	মউড়	মুকুট

প্রাকৃত	উড়িয়া	সংস্কৃত
মঝিঅাঁ	মঝিঅাঁ	মধ্যমা
রাউল	রাউল	রাজকুল
বাহা	বাহা	বাহু
বি	বি	অপি
শেজ	শেজ	শয্যা
বিহি	বিহি	বিধি
নঈ	নই	নদী
কাও	কাউ	কাক

উড়িয়া ভাষা যে প্রাকৃতেরই কন্যা, তাহা আরও শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে। এখন হিন্দি প্রভৃতি ভগিনী ভাষার, বিশেষতঃ বাঙ্গালার সহিত উড়িয়ার সাদৃশ্য দেখান হইতেছে। অনেক শব্দ হিন্দী এবং উড়িয়াতে অভিন্ন কিম্বা প্রায় অভিন্নরূপ। এইরূপ অনেক শব্দ বাঙ্গালা ও উড়িয়াতে এবং মরাঠী ও উড়িয়াতেও এক কিম্বা প্রায় অভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

হিন্দী	উড়িয়া		বাঙ্গালা	উড়িয়া	মরাঠী	উড়িয়া	
জুহার	জুহার	(নমস্কার)	তেঁতুল	তেঁতুলী	নাকডী	নাউড়ী	(মাঝি)
পয়র	পয়র	(পা)	আখ	আখু	আবলা	আউলা	(দাঁড়)
বিত্না	বিতিবা	(অতীত হওয়া)	সজিনা	সজিনা	মোকলা	মুকুলা	(মুক্ত)
বুঁদ	বুন্দ	(বিন্দু)	বউল	বউল	নিশনী	নিশুনী	(সিঁড়ি)
মহংগা	মহংগা	(মহার্ঘ)	বাড় (ভাতবাড়)	বাঢ়	পহুণে	পহুঁরিবা	(সাঁতার)
কাম	কাম	(কর্ম্ম)	ঝি	ঝিঅ	মাঞ্জর	মঞ্জারী	(মার্জ্জার)
ভণ্ডার	ভণ্ডার	(ভাণ্ডার)	ছাড়	ছাড়	পালী	পালী	(পালা)
কীড়া	কীড়া	(কীট)	চিল	চিল	আণ	রাণ	(শপথ)
কোইল	কোইল	(কোকিল)	বিছা	বিছা	ফণস	পণস	(কাঁঠাল)
কেওট	কেউট	(কৈবর্ত্ত)	মাছি	মাছি	ঝুরণে	ঝুরিবা	(বিলাপ)
লেওট	লেউট	(নিবৃত্ত)	বেঙ্গ	বেঙ্গ	ব্যাজ	ব্যাজ	(সুদ)
অরুআ	অরুআ	(আতপ)	পেচা	পেচা	পেঠ	পেঠ	(পট্টন)
পট্টা	পটা	(পাটা)	কামার	কমার	উশির	উছুর	(বিলম্ব)
আসরা	আসরা	(আশ্রয়)	সাধ	সাধ	শেলী	ছেলী	(ছাগল)
কৌড়ী	কৌড়ী	(কড়ি)	সাঁতলান	সন্তলিবা	তোঁড	তুণ্ড	(মুখ)
শগড়	শগড়	(শকট)	বাসি	বাসি	থাট	থাট	(সৈন্য)
ধিট	ধিট	(ধৃষ্ট)	জোত	জোত	বান্তি	বান্তি	(বমি)
গোত	গোত	(গোত্র)	টেরা	টেরা	পড়ল	পরল	(ছানি)

উচ্চারণ বিষয়ে উড়িয়া ও বাঙ্গলার মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। উড়িয়ার উচ্চারণ অনেকটা দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুরূপ। ঋ, ঌ, বাঙ্গালার রি, লি, কিন্তু উড়িয়াতে রু, লু, রূপে উচ্চারিত হয়। যথা—গৃহ শব্দ উড়িয়ায় উচ্চারণ গ্রূহ্। বাঙ্গালায় 'ণ' ও 'ন' এর উচ্চারণগত প্রভেদ নাই, কিন্তু উড়িয়াতে মূর্দ্ধন্য ণ এর সংস্কৃত উচ্চারণ সংরক্ষিত হইয়াছে।* বাঙ্গালায় একটী মাত্র 'ল', কিন্তু উড়িয়াতে দন্ত ও মূর্দ্ধণ্য 'ল' বিভিন্নরূপে লিখিত ও উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় 'কেন' এই শব্দের 'কে' র একার যেরূপ উচ্চারিত হয়, উড়িয়াতে একারের সেরূপ উচ্চারণ নাই। সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে 'ষ্ণ' এর উচ্চারণ বাঙ্গালাতে 'ষ্টঁ' এর মত, কিন্তু উড়িয়াতে 'ষ' এ দন্ত্য ন যোগ করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, সেইরূপ। বাঙ্গালায় 'ব' ফলা প্রায়ই উচ্চারিত হয় না, কিন্তু উড়িয়াতে 'ব' ফলার স্পষ্ট উচ্চারণ আছে। উড়িয়ার অকারান্ত শব্দগুলির অন্ত্য অ সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়। এই সকল উচ্চারণের প্রভেদ নিবন্ধন উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালীর নিকট রূঢ় ও কর্কশ বলিয়া বোধ হয়।

ব্যাকরণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালারই অনুরূপ। লিঙ্গপ্রকরণে স্ত্রীত্ব বুঝাইবার জন্য দেশজ এবং অপভ্রংশ শব্দস্থলে আণী ও উণী প্রত্যয় হয়। যথা, চাষুণী (চাষা জাতীয়া স্ত্রী), বণিয়াণী (বেনে জাতীয়া স্ত্রী)। উড়িয়াতে শব্দকে বহুবচনান্ত করিতে হইলে, একবচনান্ত শব্দের পরে 'মান' বিভক্তি প্রয়োগ করা যায়। 'মান' বিভক্তির উৎপত্তিসম্বন্ধে স্থিরাত্মক কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে "মান্য অর্থে বহুবচন" এই বাক্যকে উল্টাইয়া বহুবচনে 'মান' প্রয়োগ করিবার রীতি উদ্ভাবিত হওয়া অসম্ভব নহে। উড়িয়াতে কর্ম্ম এবং সম্প্রদান কারকের 'কু' বিভক্তি হিন্দীর 'কো' র লঘূকরণ বলিয়া বোধ হয়। উড়িয়া ভাষার অপাদানের 'রু' বোধ হয় প্রাকৃতের 'উ' র রূপান্তর। সম্বন্ধের বিভক্তি 'র' উড়িয়া এবং বাঙ্গলা উভয়তেই সমান। অধিকরণের বিভক্তি 'রে' প্রাকৃত 'এ' র ভিন্নরূপ বলিতে হইবে। 'এ' প্রত্যয় কখন আবার একত্ববোধক, কখনও বা বহুত্ব-বোধক হইয়া থাকে ; যথা, জনে (একজন), লোকে (লোকগণ)। উড়িয়াতে আখ্যাত বিভক্তিগুলির মধ্যে নিত্য প্রবৃত্ত বর্ত্তমানের এবং অনুজ্ঞার প্রথম পুরুষ বহুবচনান্ত 'অন্তি' ও 'অন্তু' প্রত্যয় সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত বা প্রাকৃত। বাঙ্গালার মত বর্ত্তমান এবং অনুজ্ঞার প্রথম ও মধ্যম পুরুষে একবচনে 'এ' ও 'অ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। উত্তম পুরুষে 'এঁ' প্রত্যয় হয়। উড়িয়াতে বিশুদ্ধ অতীত কালে প্রথম পুরুষে 'লা' ও 'লে', মধ্যম পুরুষে 'ল', উত্তম পুরুষে 'লি' ও 'লুঁ' বিভক্তি হয় ; যথা, সে কলা (সে করিল), সেমানে কলে

---

* এই পুরাতন উচ্চারণ বোধ হয় এখনও বাঙ্গলার বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দে দেখা যায়। বাঙ্গালায় ঐ সকল শব্দ বিষ্টু, কৃষ্টঁ ইত্যাদিরূপে উচ্চারিত হয়। 'ষ' এর নীচে 'ণ' যোগ করিলে 'ণ' উচ্চারণ 'ট' এর মত হইল কেন ?

(তাহারা করিল), তুমে কল (তুমি করিলে), মু কলি (আমি করিলাম), আম্ভেমানে কলুঁ (আমরা করিলাম)। প্রাগ্‌ভূত অতীতে একবচনে 'থিলা', 'থিলু', 'থিলি'; বহুবচনে 'থিলে', 'থিল' 'থিলুঁ' প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালাতে সেই সব স্থানে যথাক্রমে ছিল, ছিলি, ছিলাম; ছিলেন, ছিলে, ছিলাম প্রত্যয় হয়। কৃদন্ত প্রকরণে অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠনে 'ই', 'বাকু', 'উঁ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, যথা,—করি (করিয়া), করিবাকু (করিতে), দেখুঁ দেখুঁ (দেখিতে দেখিতে)। কৃদন্তে 'লা' বা 'অন্তা' প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—গলা কথা (গত কথা), দেবা লোক (দান করিবে যে লোক), চালন্তা গাড়ী (চলৎশকট)। তদ্ধিত প্রকরণে ইআ, উআ, আল, রা, পণ, যাক, যাএ, ক, তে, ড়ে প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়; যথা, জালিআ (জাল করে যে), নাটুআ (নৃত্য করে যে), রখুআল (রাখাল), পানরা (তাম্বূলী), সাধুপণ (সাধুত্ব), বাট যাক (পথ সমস্ত), দেউল যাএ (দেউল পর্য্যন্ত), দিনক (এক দিন), এতে (সংখ্যায় এত), এতে (পরিমাণে এত)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উড়িয়া ভাষা প্রাচীন সাহিত্যশালিনী। উড়িয়া সাহিত্যে শত শত পদ্য গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। সেই গ্রন্থগুলি পুরাণ, কাব্য এবং বিবিধ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির উদ্দেশ্যে নিম্নে তিনজন প্রধান প্রাচীন কবির তিন খানি কাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। উড়িয়ার সমস্ত পদ্য অক্ষর নিয়মানুসারে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কিংবা তাহাদিগের সংমিশ্রণজনিত নানাবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত হইয়াছে। উড়িয়ার সমুদয় পদ্যপাঠকালে স্বরসংযোগে পঠিত হইয়া থাকে। এজন্য পদ্যের প্রথমে রাগ রাগিণীর উল্লেখ থাকে।

'কবি দীনকৃষ্ণ দাসের রসকল্লোল' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

কম্বু-কটকছরে,[১]	নিলাদ্রিনগরে,	পাহান্তি[২] শঙ্খ বাজিলা।
কম্বু-চক্রধর	দেবরাজঙ্কর[৩]	নিদ্রা তুরিতে ভাজিলা॥
কনক-পলঙ্ক[৫]	কমলাঙ্ক অঙ্ক[৬]	তেজি সিংহাসনে বিজে।[৭]
কবাট ফিটাই[৮]	ত্বরা হোই যাই[৯]	খটিলে[১০] সেবক দ্বিজে॥
কুসুম মালকু[১১]	পকাই[১২] তলকু[১৩]	তড়প[১৪] লাগি[১৫] হোইলে।[১৬]

কাঠি-লাগি[১৭] পাই[১৮] চউকিরে[১৯] যাই তুরিতে[২০] বিজয় কলে[২১]॥

করি[২২] বাস জল শ্রীমুখ[২৩] পখাল কাঠি লাগি স্নান সারি[২৪]।

কমনীয়[২৫] বাস লাগি[২৬] হোই বেশ হেলে[২৭] নীলাদ্রিকেশরী॥

কোটি ব্রহ্মাণ্ডরে[২৮] এমন্ত[২৯] ঠাকুর থিবার[৩০] শুনিছ কাহিঁ[৩১]।

কিঞ্চিত[৩২] লোকহিঁ পরম পদকু[৩৩] লভন্তি যাহকু চাহিঁ[৩৪]॥

১ শঙ্খক্ষেত্রে, ২ প্রভাতি, ৩ দেবরাজের, ৪ ত্বরিতে, ৫ পালঙ্ক, ৬ কমলাক্ষ, ৭ বিরাজিত, ৮ খুলিয়া, ৯ হইয়া ১০ সেবা করিল, ১১ মালাকে, ১২ ফেলিয়া, ১৩ তলে, ১৪ বস্ত্র, ১৫ লগ্ন, ১৬ হইলেন, ১৭ দাঁতমাজা, ১৮ নিমিত্ত ১৯ চৌকিতে, ২০ বিরাজ, ২১ করিলেন, ২২ সুগন্ধ, ২৩ প্রক্ষালন, ২৪ সমাপ্ত করিয়া, ২৫ বস্ত্র, ২৬ হইয়া, ২৭ হইলেন, ২৮ ব্রহ্মাণ্ডে, ২৯ এমন, ৩০ থাকিবার, ৩১ কোথায়, ৩২ ক্ষুদ্র, ৩৩ পদকে, ৩৪ চাহিয়া।

কবি উপেন্দ্রভঞ্জের 'প্রেম সুধানিধি' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল শরদে বিরাজি, দিশে[১] যথা দর্পক[২] দর্পণে থিলে[৩] মাজি।

চাহিঁ[৪] কুমর[৫] কাতর, লেখ[৬] আরম্ভিলা বসি বিনয় পতর॥

জানকীবল্লভ পদ্মপাদে চিত্তথাউ[৭], রাজসুতা কৌশল্যাকু প্রীতির চিটাউ[৮]।

এবে মরু অছি ঝুরি[৯], দরিদ্র রতন পাই হরাইলা[১০] পরি[১১]॥

তু[১২] মো প্রতি চক্ষু যেনু[১৩] হোইছু[১৪] অন্তর[১৫], দিশু[১৬] নাহিঁ কিছি[১৭] কাহিঁ[১৮] আন[১৯] প্রতীকার।

নুআ[২০] অন্ধপ্রাএ[২১] হোই[২২] অনুক্ষণে আকুল বঢ়ুছি[২৩] প্রাণ সহি[২৪]॥

দূরে থিলে[২৫] পাশে অছি[২৬] এহা[২৭] থিবু[২৮] যেনি[২৯], কেতে[৩০] দূরে চন্দ্র কেতে দূরে কুমুদিনী।

প্রীতি অভেদ তাঙ্কর[৩১], যেতে[৩২] দূরে থিলে যে যাহার সে তাহার॥

১ দেখা যায়, ২ সিন্দূর, ৩ থাকিলে, ৪ চাহিয়া, ৫ কুমার, ৬ পত্রিকা, ৭ থাকুক, ৮ চিঠি, ৯ বিলাপ করিয়া, ১০ হারায়, ১১ প্রায়, ১২ মোর, ১৩ যেহেতু, ১৪ হইয়াছিস, ১৫ দূর বা পৃথক্, ১৬ দেখা যায় না, ১৭ কিছু, ১৮ কোথায়, ১৯ অন্য, ২০ নূতন, ২১ প্রায়, ২২ হইয়া, ২৩ বাড়িতেছে, ২৪ সই, ২৫ থাকিলে, ২৬ আছি, ২৭ ইহা, ২৮ থাকিবি, ২৯ বুঝিয়া, ৩০ কত, ৩১ তাহাদের, ৩২ যত।

কবি অভিমন্যুসামন্তের " বিদগ্ধচিন্তামণি " গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

নির্ধন শঞ্চলি[1] মোর দরিদ্র পসরা[2]। অন্ধ লউড়ি[3] বাবুরে[4] হৃদরত্ন হারা[5]।

মো জীব জীবন তুহি নয়নপ্রতিমা। তোতে কি পাসোরি[6] হেব মোর সুখসীমা।

* * * *

কণ্ট[7] করি থিলু[8] পরা[9] কাহিঁ[10] কি নইলু[11]। কাহা সঙ্গতরে[12] অবা[13] পুণি[14] কলি[15] কলু[16]॥

কি দূর বনকু গলু[17] তথ্য ন জানিলি[18]। মুঁ পাপিষ্ঠা কাহিঁ[19] পাই তো সঙ্গে নগলি[20]॥

রবিকর চাহুঁ অছি[21] ক্ষত মৃগী পরি[22]। দিন সরু[23] নাহি লব হেলা যুগ সরি[24]॥

কে যাই কহন্তা[25] তোতে[26] মোহোর[27] বেদনা। অবশ্য হঅন্ত[28] তুহি মাতৃস্নেহ ঘেনা[29]॥

দউড়ি যিবি[30] কি বনে হেউছি[31] আতুর। পয়োধর[32] ক্ষীর স্রবি[33] পড়ে ধার ধার॥

মন ছলছল[34] বল[35] নেত্রু[36] ন রহিলা। তো অইলা[37] পরা[38] ছাই[39] মোতে[40] প্রতে[41] হেলা[42]॥

১ সর্ব্বস্ব, ২ দোকানদারের সমস্ত দ্রব্য, ৩ যষ্টি, ৪ বাছা, ৫ হার, ৬ পসরা যায়। ৭ সময় নির্দ্দেশ, ৮ করিয়াছিল, ৯ বুঝি, ১০ কেন, ১১ এলিনা, ১২ সঙ্গে, ১৩ অথবা, ১৪ আবার, ১৫ ঝগড়া, ১৬ করিলি, ১৭ গেলি, ১৮ জানিলাম, ১৯ কেন, ২০ গেলাম, ২১ চেয়ে আছি, ২২ প্রায়, ২৩ ফুরায় না, ২৪ সদৃশ, ২৫ বলিত, ২৬ তোরে, ২৭ মোর, ২৮ হইতিস, ২৯ গ্রহণকরে যে, ৩০ দৌড়ে যাব, ৩১ হইতেছি, ৩২ পয়োধর হইতে, ৩৩ ঝরিয়া, ৩৪ উতলা, ৩৫ জল, ৩৬ নেত্র হইতে, ৩৭ তোর আসার, ৩৮ যেন, ৩৯ ছায়া, ৪০ আমার, ৪১ প্রতীত, ৪২ হইল।

আধুনিক উৎকলসাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুকরণ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ঐ কারণে উড়িয়া রচনা দিন দিন বাঙ্গালার মত হইয়া আসিতেছে। উপসংহারে আধুনিক সাহিত্যের নমুনা স্বরূপ দুইটী কবিতাংশ এবং একটী গদ্য প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। প্রথম কবিতাংশটী আধুনিক উৎকলের শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহাশয়ের "মহাযাত্রা" নামক কাব্য হইতে গৃহীত। উহা শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিবরের প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। দ্বিতীয় কবিতাংশ শ্রীযুক্ত বাবু ফকীরমোহন সেনাপতি মহাশয়ের "উপহার" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী গদ্য অংশ ৺ প্যারীমোহন আচার্য্য মহাশয়ের 'ওড়িশার ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত হইল।

(১)

পশ্চিমে[1] যাত্রিএ[2] সেহি বিকট[3] সংকটে

ছায়াময় [illegible] পূর্ণ-[illegible]

হেলীরে[৪] নীলবর্ণ ভৃগুমান্ গিরি
াড়ি[৫] হোই[৬] বেনি[৭] তীরে, একপরে এক
শিথা তোলি[৮] কলন্তি[৯] কি গগনর[১০] সীমা ?
দিগ্বারণ শুণ্ডাকারে কাহিঁ[১১] অবাছনীরে[১২]
মিশিছি[১৩] তির্য্যকে আসি শ্যামশৈল, নাসি[১৪]
ছায়ালোকে শবলিত হোই[১৫] ঠাবে ঠাবে[১৬]
কাহিঁ[১১] কল কল রবে গিরি নির্ঝরিণী
(সৃষ্টি কালুঁ[১৭] পড়ি নাহিঁ সৌরকর যহিঁ[১৭])
সুচিক্কণ কৃষ্ণ শিলা সোপানশ্রেণীরে[১৯]
তমোময় কন্দরারু[২০] আসই[২১] ওহ্লাই[২২]
অপ্রগল্‌ভে, অপ্রগল্‌ভে দীন সাধু যথা
সাধে পরহিত হোই[১৫] বীত-স্পৃহ যশে ;
নিবিড় কীচক কুঞ্জে ভিন্নাঞ্জনপ্রভ—
তিমিরে আচ্ছন্ন মহাঘোর শৈল খোলে
লুচি[২৩] একাকিনী কাহিঁ[১১] ঝুরই করুণে
কুররী,কি দুঃখে তাহা জানে সে দুঃখিনী।
শৃঙ্গ[২৪] যাএ শৈলতটে পরে পরে উভা[২৫]
বনদেবী সৌধাকৃতি বনস্পতি শাখে
পুরি সে বিজন, বীণাজিণা[২৬] কণ্ঠরবে
রাবুছন্তি[২৭] অষ্টকালে[২৮] কষ্ট ফেড় শুআ,[২৯]
নদীকুল[৩০] বন্ধু শ্যামা সার[৩১] চষা[৩২] পুএ।

১ পশিল, ২ যাত্রীগণ, ৩ সেই, ৪ কুহেলিকায়, ৫ শ্রেণী, ৬ হইয়া, ৭ দুই, ৮ তুলিয়া, ৯ পরিণাম করে, ১০ গগনের, ১১ কোথায়, ১২ অথবা, ১৩ মিশিয়াছে, ১৪ অন্তরীপ, ১৫ হইয়া, ১৬ স্থানে, ১৭ কাল হইতে, ১৮ যেখানে, শ্রেণীতে, ২০ কন্দরা হইতে, ২১ আসে, ২২ অবতরি, ২৩ লুকাইয়া, ২৪ পর্য্যন্ত, ২৫ দণ্ডায়মান, বীণা জিনিয়াছে যে, ২৭ রব করিতেছে, ২৮ অষ্টপ্রহর, ২৯ কষ্টফেড নামক শুকপক্ষী, ৩০ পক্ষীবিশেষ, ৩১ পক্ষী বিশেষ, ৩২ পক্ষীবিশেষ।*

কুসুমকলিকা থিলা[১] সৌরভর খনি
মধুময়ী হাস্যমুখী প্রেমলতামণি
দুই দিন পহিঁ[২] মায়া মমতা লগাই[৩]
হসি হসি[৪] গলা[৫] মোতে[৬] কন্দাই[৭] কন্দাই।

লীলা করুথিলা[৮] নীল বারিদে চপলা
দেখি তৃপ্ত হেউথিলা[৯] মোহ[১০] নেত্রডালা
অনন্ত আকাশে গলা[১২] সহসা উভাই[১৩]
হসি হসি[৪] গলা[৫] মোতে[৬] কন্দাই[৭] কন্দাই।

ঢালি দেউথিলা[১৪] সুধাপূর্ণ শশধর
দেখি তৃপ্ত হেউথিলা[৯] মো[১৫] চিত্তচকোর
অস্তাচলে শিরে নিজ দেহকু[১৬] লুচাই[১৭]
হসি হসি[৪] গলা[৫] মোতে[৬] কন্দাই[৭] কন্দাই।

সন্তাপরে[১৮] করুথিলা[৮] স্নেহবারিদান
মো চিত্তচাতক তাহা করুথিলা[৮] পান
যেনি গলা[১৯] বায়ু সেহি[২০] বারিদে উড়াই[২১]
হসি হসি[৪] গলা[৫] মোতে[৬] কন্দাই[৭] কন্দাই।

১ ছিল, ২ জন্য, ৩ লাগাইয়া, ৪ হেসে, ৫ গেল, ৬ মোরে, ৭ কাঁদাই, ৮ করিতেছিল, ৯ হইতেছিল, ১০ আমার, ১২ গেল, ১৩ অন্তর্হিত হইয়া, ১৪ ঢেলে দিচ্ছিল, ১৫ মোর, ১৬ দেহকে, ১৭ লুকাইয়া ১৮ সন্তাপে, ১৯ বয়ে গেল, ২০ সেই, ২১ উড়াইয়া।

চৈতন্যঙ্ক[১] মধুর বচনরে[২] মুগ্ধ হোই[৩] রাজ্যর[৪] উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক তাঙ্ক[৫] মতর[৬] অনুগামী হেলে[৭]। তৎকালীন সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারী, স্বয়ং রাজা মধ্য[৮], এহি[৯] ধর্ম্মর দীক্ষা গ্রহণ কলে[১০]। তাঙ্ক[১১] যত্নরে জগন্নাথমন্দিরর অনেক সেবা পূজা শৃঙ্খলাবদ্ধ হেলা[১২]। আজি পর্য্যন্ত বড় দেউলরে[১৩] যে গীতগোবিন্দ প্রত্যহ সংগীত হেউ অছি[১৪], তাহা তাঙ্ক[১১] চেষ্টারে[১৫] প্রথমে প্রবর্ত্তিত হোইথিলা। চৈতন্যঙ্ক সুমধুর সংকীর্ত্তন সমস্তঙ্ক[১৭] মন মোহিত করিথিলা[১৮]। সবু শ্রেণীর লোকে চৈতন্যঙ্ক মতর শিক্ষা স্বীকার কলে[১৯], কেবল ওড়িশা ব্রাহ্মণঙ্কর কঠোর নিষ্ঠাগত মন অপরিবর্ত্তিত রহিলা। এহি সময়রে[২০] ওড়িশারে[২১] সুদ্ধা[২২] জনে[২৩] ধর্ম্মপ্রভাত জাত হোইথিলে। সে ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ উড়িয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচয়িতা জগন্নাথদাস অটন্তি[২৫]। সে[২৬] মধ্য বৈষ্ণব ধর্ম্মকু এক আকাররে প্রচার করি থিলে। চৈতন্যঙ্ক মত সঙ্গরে তাঙ্ক মতর কেতেক অংশরে সৌসাদৃশ্য থিবার[২৭] জনা[২৮] যায়।

১ চৈতন্যের, ২ বচনে, ৩ হইয়া, ৪ রাজ্যের ৫ তাঁহার, ৬ মতের, ৭ হইলেন, ৮ ও, ৯ এই ১০ করিলেন, ১১ তাঁহার, ১২ হইল, ১৩ দেউলে, ১৪ হইতেছে ১৫ চেষ্টায়, ১৬ হইয়াছিল, ১৭ সকলের, ১৮ করেছিল, ১৯ করিলেন, ২০ সময়ে, ২১ উড়িষ্যায়, ২২ ও, ২৩ একজন, ২৪ হইয়াছিলেন ২৫ হয়েন ২৬ তিনি ও, ২৭ থাকিবার, ২৮ জানা যায়।

শ্রীমধুসূদন রাও।

কটক

উক্ত প্রবন্ধের ঐতিহাসিক টিপ্‌পনী।

লেখক মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে ঐতিহাসিক কথার আলোচনা করিয়াছেন, এখন আর সে সব কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না, সম্পূর্ণই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১। বৌদ্ধরাজ ঐরের নাম মূল শিলালিপিতে নাই, শিলালিপি অনুসারে সেই বৌদ্ধরাজের নাম 'খারবেল'*।

২। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে উৎকল মহাকোশলের শবররাজগণের অধিকারভুক্ত হয়†। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা জনমেজয় তিলঙ্গদেশ হইতে আসিয়া

* Proceedings of the International Congress of the Orientalist held at Lyden in 1883 দ্রষ্টব্য।

† অধ্যাপক কিলহর্ণ 'শবর' স্থানে 'শশধর' পাঠ করিয়া এই রাজবংশকে সোমবংশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন

উৎকল অধিকার করেন ‡। এই বংশীয় সপ্তম রাজার নাম উদ্যোতকেশরী। এই উদ্যোতকেশরী ভিন্ন জনমেজয়বংশীয় আর কোন রাজার নামে 'কেশরী' শব্দ যোগ নাই। সুতরাং জনমেজয় কি তৎপুত্র যযাতিবংশীয় রাজগণকে কেশরী বংশীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জনমেজয় প্রভৃতি স্ব স্ব তাম্রশাসনে সোমবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মেশ্বর ও খণ্ডগিরি হইতে রাজা উদ্যোতকেশরীর শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই লিপির অক্ষরবিন্যাস দৃষ্টে খৃষ্টীয় ১৬ শ শতাব্দীর লিপি বলিয়া স্বীকার করা যায়।

৩। 'গঙ্গাবংশ' নহে গঙ্গবংশ§। গঙ্গবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উৎকল অধীকার করেন।

৪। ওড়িশা হইতে ২য় নরসিংহদেবের সময়ে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছি, তদ্দৃষ্টে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি যে উৎকলাক্ষর প্রাচীন মৈথিল বা বঙ্গলিপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ** ।

৫। মাদলাপঞ্জী লিখিবার প্রথা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে অর্থাৎ প্রায় আট শতবর্ষ পূর্ব্বে চোড়গঙ্গের সময় হইতে প্রচলিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালাপাহাড়ের আক্রমণে সেই অমূল্য প্রাচীন পঞ্জী সমূহ নষ্ট হইয়াছে। এখন জগন্নাথের মহামন্দিরের দেউল করণদিগের তত্ত্বাবধানে যে প্রাচীনতম মাদলাপঞ্জী আছে, তাহাকে কালাপাহড়ের ওড়িশাবিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, সুতরাং তদ্দ্বারা ৬ শতবর্ষ পূর্ব্বে উৎকল ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যাইতে পারে না। তবে উৎকল ভাষা যে ৬ শত বর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎকলরাজ ৪র্থ নরসিংহদেবের ১৩০৫ শকে প্রদত্ত তাম্রশাসনে তৎকালপ্রচলিত যে উড়িয়া ভাষা লিখিত আছে, সেই ৫ শত বৎসরের উড়িয়ার সহিত এখনকার উড়িয়া ভাষার বিশেষ পার্থক্য নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম††।

কলাভোর উতরখণ্ড মধ্যে কিনরি গ্রামের নাম বিজয় নরসিংহপুর। রাউতপড়া

(Indian Antiquary, vol. XVIII. p. 180.) আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ফ্লিট সাহেব তাহার মতানুসরণ করিয়াছেন (Epigraphia Indica, vol III, p. 333.) কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহম্‌ যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন (Archæological Survey of India, vol XVII Plate xviii) এবং আমি মূল শিলাফলক হইতে যে অবিকল প্রতিকৃতি পাইয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট 'শবর' নাম আছে।

‡ বিশ্বকোষে ৬ষ্ঠ ভাগ ৫৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

§ বিশ্বকোষে "গাঙ্গেয়" ও "জগন্নাথ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

** Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol LXV. P. I. P. 232.

†† Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol LXIV. pl. I. P. 149.

পাথরর সংবন্ধ জিত চিআরিস পঞ্চাশ মাঢ় ৪৫০ চান্দলো পাথর সংবন্ধা চিআরিশ পংচাস মাঢ় ৪৫০ গা ব্রিহি অবদান মধ্য করি জিত নঅস ৯০০ মাঢ় কই পোরীশ্রীকরণ বড়দাসী মহাসেনাপতির সীমা কলা প্রমাণে।

পাঁচ শত বর্ষের পূর্ব্বেও যখন প্রায় এখনকার উড়িয়া ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন এই ভাষার প্রথম বিকাশ তাহারও বহু বর্ষ পূর্ব্বে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি।

গতবারের শেষ

সংবাদই (সম্বাদই)	সংবাদ করে	কান্তকাক-মুখে নাহি সংবাদই। ১৬৮-৩
সংবাদহ (সম্বাদহ)	সংবাদ কর	আব যদি যাই সম্বাদহ কান। ১৭০-৫
সকোপিত*	উদ্দীপ্ত	সাবহং-শবদে মদন সকোপিত। ১৪৯-২
সখিনী	সঙ্গিনী	সখিনী সঙ্গ সমেতা ২০২-৬
সগর	সকল	সগর বচন কহু নত করু মাথ। ৪১-৮
সংঙ্কীরণ	সঙ্কীর্ণ, মিশ্রিত?	করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ। ১২৫-৪
সঙ্গ	মিলন	রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ। ৬১-৮
সঙ্গাতি	সঙ্গতি, মিলন	ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গতি। ১০৩-১
সঞে	সঙ্গে	বালা জন সঞে যব রহই। ৩৯-৩
সঞে	হইতে	কর সঞে কঙ্কণ মুদরী। ৯০-১
সঞে	স্মরণ করিয়া (?)	রাধা সঞে যব গুণ তহি মাধব। ১৫৯-১২
সঞ্চরু	সঞ্চরণ করে	সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু। ২৩-১০
সঞ্জাত	সংযত	এ ধনি মানিনী করহ সঞ্জাত। ১০১-৩
সদনে	গৃহে?	কিঙ্কিণী-রোল করত পুন সদনে। ২১১-১০
সন্ততি	সতত	ঝঞ্ঝা-ঘন গরজন্তি সন্ততি। ১৭১-৮
সন্দেশ*	সংবাদ (?)	কাজরে সাজল মদন সন্দেশ। ১৮-৬
সব	গণ, সমূহ	এতদিনে সখী সব আছিল ঠাট। ৮০-১১
সবকোই	সকলেই	প্রেমক গুণ কহই সবকোই। ১৭৯-৭
সবহু	সকলই	সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি। ৫৩-৯
সবহুঁ	সকলকে	পুছই সবহুঁ। ১৭৯-১
সমতি	সম্মতি	না দেই সমতি। ১৯০-২
সমধানে	সন্ধানে	সারঙ্গ তসু সমধানে। ২৮-২
সমপিনু	সমর্পণ করিলাম	তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু। ২১৮-৭
সমাওত	সমাপ্ত (সমাহিত) হয়	তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত। ২১৯-৭

* সকোপিত—কাব্যবিশারদে "অতি কোপিত" আছে।

সমাজ	সমূহ	স্তম্ভিত রমণীসমাজে। ২১৮-৬
সমাধা	নিষ্পত্তি	কহ ধনি ইথে কি সমাধা। ৪৮-৮
সমাধা	শেষ	অব জীউ করব সমাধা। ১৯৩-৩
সমাধান	সিদ্ধান্ত	তাকর বচনে ভেল সমাধান। ১৪৫-৪
সমানে	সমানয়ন করে	তা পর মেরু সমানে। ২৭-৪
সমাপন	পর্য্যন্ত	মরণ সমাপন প্রেম বিথারি। ১৮৫-৮
সমাহল	সমাহিত করিল	কনক কদলী পর সিংহ সমাহল। ২৭-৩
সমুখ	সম্মুখ	গুরুজন সম্মুখই ভাবতরঙ্গ। ৪৬-১
সমুঝনু	বুঝিতে পারিলাম	সমুঝনু তব হাম স্থকপট সোয়। ১৩০-৮
সমুঝব	বুঝিতে পারিবে	কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ। ১৩০-৪
সমুঝবি	বুঝিবি	কিয়ে তুহু সমুঝবি মো চতুরাই। ১৩০-১২
সমুঝাই	বুঝাও	রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই। ১৫২-১২
সমুঝাইতে (সমঝাইতে)	বুঝাইতে	কানু সমুঝাইতে হাম চলি যাই। ১৭১-৪
সমুঝাওয়ে	বুঝায়	বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে। ১৮৮-১৩
সমুঝায়ব	বুঝাইব	কাহে সমুঝায়ব খেদ। ১৬৮-১৬
সম্বরি	সম্বরণ করে	ফুয়ল করবী না সম্বরি মাথ। ১৯১-৮
সম্বরু	ঢাকা	অম্বরে রচ নাহি সম্বরু গেল। ৯৪-৯
সম্বেশ	সন্নিবেশ	কিয়ে শশীমণ্ডল শিখণ্ড সম্বেশ। ২৪-৬
সম্ভায়ল	সম্ভূত হইল	তড়িত লতা-তলে তিমির সম্ভায়ল। ১৪৬-১
সম্ভেদ	মিলন	ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ। ৭১-১০
সরণা	পথ	ভীম ভুজঙ্গম সরণা। ৯১ ৩১
সরবস	সর্ব্বস্ব	দেহক সরবস লেহক সার। ২১২-১২
সরয়ে	সরে	লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল। ৮০-৫
সরস	সরোবর	চুম্বয়ে হরষ সরস-অবগাহ। ১৪৩-১৬
(স্থর.) সরি	(স্থর) সরিৎ শচী	মণিময় হার ধার বহু স্থরসরি। ২৭-৭
সহ	সহে	কত সহ পাপ পরাণ। ১৬৮-১
সহই	সহিতে	মদন বেদন হাম সহই না পার। ১৬-৪
সহই	সহে	প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই। ৯২-৪
সহজ	স্বভাবতঃ	একে ধনী পদ্মিনী সহজহি ছোটি। ৬০-৩
সহজ	বলপ্রকাশ না করিয়া	সহজে করিবি মধু পান। ৫৯-৫
সহত	সহ্য করিতে হয়	মাইহে কি সহত জীবক নাড়ি ৭৪-৩
সহয়ে	সহে	এ স্থখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট। ১৬৯-১১

শব্দ।		উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
সহাবি	সহাইবি, সহাইও	থোরি সহাবি ফুলধনু।	৫৯-১৪
সহি	সখি	ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিও কাণে।	১৬১-৩
সহব	সহিবে	সো নহি সহব হি হামার পরাণ।	৭৬-৪
সাঁচ	সত্য	বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।	৮২-৯
সাঁচে	সঞ্চিত করে	দুহু ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।	৮০-৭
সাঁঝ	সন্ধ্যা	সাঁঝকে বেরি সেব কোই মাগই।	২১৮-৩
সাখি	সাক্ষাৎ	পাওল মদন মহোদধি সাখি।	৭৪-১২
সাখী	সাক্ষী	রূপনারায়ণ সাখী।	৫১-১২
(ঘন) সাঙণমালা	শ্রাবণ মেঘমালা	জনু ঘন সাঙণ মালা।	১৫৪-১৫
সাঙরি (সোঙরি)	স্মরণ করিয়া	কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।	৬৫-১
সাজ	সাজে	কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।	২১৬-৭
সাজা	সাজে, শোভে ?	কণ্টরি জিনিয়া কুচ সাজা।	৮৭-২
সাজল	সাজিল	কাজরে সাজল মদন-ধনু।	৩৮-৮
সাঠি (সাঁটি)	দৃঢ় করিয়া সাঁটিয়া	যুগল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি।	৭৫-৩
সাথ	সহিত	কৈছনে মিলব মাধব সাথ।	৫৭-৮
সাধয়ে	সাধে	সাধয়ে চরণে রসিকবর কান।	১০২-১০
সাধবি	সাধিবে	মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে।	৫০-৮
সাধল	সাধিল	দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।	৭৮-৭
সাধস	সাধ্বস, ভয়	সাধস নাহি কর চলু পিয়া পাশ।	৮১-৪
সাধায়নু	আশ্বাস দিলাম	এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়নু।	১৬৮-৮
সান্ধি (সান্দি)	গহ্বর, সন্ধিস্থল	কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।	১০-৬
সারঙ্গ	কোকিল	সারঙ্গ বচন জনু।	২৮-১
সারঙ্গ	হরিণ	সারঙ্গ নয়ন।	২৮-১
সারঙ্গ	কমল	সারঙ্গ উপরে জনু।	২৮-৩
সারঙ্গ	ধনু, মদন	সারঙ্গ তনু সমধানে।	২৮-২
সারঙ্গ	ভ্রমর	দউ সারঙ্গ কেলি করই।	২৮-৩
সাহস	সহসা (?)	সাহসে উরে কর দেল।	১২৫-৭
সিঙ্গার (শিঙ্গার)	বেশ বিন্যাস	মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।	৩১-৫
সিধা	স্থির, সরল	আপে সিধা রহ কান।	১১৭-৮
সিধায়ল	প্রবেশ করিল	হিম শিখরে সিধায়ল।	১৬৯-৩

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
সিধারহ*	সরল কর	আপে সিধারহ কান।	৮২নং ১৫
সিনান	স্নান	ঝাটহি ভেটমু করত সিনান।	৩৪-৪
সিনেহ	স্নেহ	মনে গুণি পূরব সিনেহ।	১৮৯-১৪
সিরজল (সিরজিল)	সৃজিল	কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি।	৭৪-৪
সীম	সীমা, প্রান্ত	পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।	৫২-৩
সীমা	আচ্ছাদন	সজল চীর পয়োধর সীমা।	১৯-৫
সুখায়ব (শুকায়ব)	শুকাইবে	সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব।	১৭৪-২
সুজান	বিজ্ঞ	সো বর নাগর রসিক সুজান।	৫৭-৯
সুনেহ	স্নেহ	ধিক রহু ঐছন তোহারি সুনেহ।	১২৩-৪
সুরেহ	স্নেহ	ভণহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।	১২৯-৯
সুলেহ	স্নেহ	অপরূপ তোহারি সুলেহ।	১৫৯-৫
সুরঙ্গ	হিঙ্গুল	মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।	৩৮-৩
সুরতরু	কল্পতরু	সুরতরু বাঁঝ কি ছান্দে।	১৭৪-৯
সুত	সূত্র	যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত।	৫৩-৮
সুর (শূর)	সূর্য্য	তরল তিমির শশী শূর শরাসল।	১৪৬-১৩
সেঁ,	সে, = হইতে ; যথা ; "বিপিনসেঁ" "কানুসে"		৬৯—১১,২৬-৪
সেব	সেবক, সেবা	সাঁঝক বেরি সেবকোই মাগই।	২১৮-৩
সেব্‌	সেবা কর	বনহু পশুপতি সেব।	১৪২-১২
সেবি	পূজা করি	কহয়ে চলয়ে ধনি ভানুক সেবি।	১১২-৮
সেবিনু	সেবা করিলাম	তুয় পদ না সেবিনু।	২১৭-৮
সেয়ানী	চতুর	দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী।	৩৩-২
সোঁপনু	সমর্পণ করিলাম	তোঁহে সোঁপনু ধনী রাই।	৫৯-১
সোঁপব	সমর্পণ করিব	যব হাম সোঁপব করে কর আপি।	৫২
সোঁপল	সমর্পণ করিল	সোঁপল তোহার নয়নে।	১০-১০
সো	সে, তাহা	সো পুন ভৈগেল বীজকপোর।	৩৪-১
সোই	সেও	সোই লুঠত মহীঠামে।	১৭৭-৬
সোঙরণ	স্মরণ	পিউ পিউ সোঙরণ দেই তজু কোর।	১৬৬-১
সোঙরি	স্মরণ করিয়া	কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।	১৫৪-১
সোঙরিতে	স্মরণ করিতে	অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে।	১৫৯-১
সোনার	স্বর্ণকার	জনু সে সোনারে তেজলকনক রেহা।	২০২-১
সোয়	তাহাকে	সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয়।	১৩০-১

* সিধারহ—কাব্যবিশারদে "সিধা রহ" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা। পঙ্‌ক্তি।
সোয়	সে	তুয়াগুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয়।	১৮৮-
সোয়াথ	স্বস্তি, শান্তি	রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।	৯৪-৩
সোহ	সেই	ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।	১৭০-৭
সোহাগল (১)	শোভিত করিল	বদন সোহাগল শ্রম জলবিন্দু।	২১৬-৩
স্তম্ভ	স্তম্ভিত	প্রেমভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ।	১২৪-১
স্বপনে	স্বপ্ন	স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ।	১৩২—১
স্রবে	ঝরে	সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ।	১৯৯-৮
হউ	হউক	পাঁচ বাম অবলাথ বাম হউ।	২০৯-৭
হউ	হই	হাম নহু শঙ্কর হউ বর নারী।	১৫৭-২
হঙ	হইতাম	পাখী জাতি যদি হঙ।	১৬৫-১০
হজে*	গাঁজায় ?	বিরহ দারুণ হজে মদন সহায়।	১২১নং৪
হটিয়া (হঠিয়া)	সরিয়া, বল পূর্ব্বক	কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।	২০৭-৩
হঠ	সবলে	হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।	৬১-১
হঠ	বলপ্রকাশ	হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।	৭০-১
হঠ	অবিবেচনা	হঠ না করহ মহত রাথ মোর।	১১৬-২
হঠ সঞে	হঠাৎ	হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।	৪৫-৭
হস্তি (য়া)	হানে	সঘনে থর শর হস্তিয়া।	১৭১-১১
হব	হইবে	কতদিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।	১৮৫-৯
হয়ে	হয়	দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল।	৫৩-৬
হরখি	হর্ষে	অবগুণ পরিহরি হরখি হরু ধনী।	১২০-১১
হরখিত	হৃষ্ট	রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত।	৬২-১০
হরব	হরণ করিবে	তৈখনে হরব মো চেতনে।	২০৭-৭
হরল	হরণ করিল	হাম হরল গেয়ান।	৭০-১
হরি	সিংহ	হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল।	৬১-২
হরু	হরণ কর	হরুখি হরু ধনী।	১২০-১১
হরু	হৃত (?)	প্রেম পয়তাপে চেতন হরু দীনা।	১৫৪-৪
হসই	হাসে	ঐছে করবি যৈছে বৈরি না হসই।	১০৭-৪
হসইতে	হাসিতে	হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি।	৪৮-৯
হসি	হাসিয়া	বচন কহসি হসি।	১৬-১

(১) সোহাগল—তর্করত্নে "সোহায়ল" আছে।

* হজে—অর্থে "পঙ্ক ও গাঁজা।" অন্যান্য সংস্করণে হুজে আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
হাট	বাজার	চৌদিকে পশারব চাঁদ কি হাট।	২০৬-১০
হান	হানে	দুহুঁ পুন মাতল দুহুঁ পর হান।	১৫০-৭
হানল	হানিলু	মুঝে হানল নয়নবাণে।	১৫-৪
হানি	হানে	বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।	৫১-২
হাম (হম)	আমি	হাম অবধারলু শুন বর কান।	৪১-১১
হাম	আমার	দুঃখ হাম পাশ।	১৬৪-১৪
হামক	আমার	হামক মন্দিরে যব আওব কান।	২০৭-৯
হামক	আমাকে	করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।	২০৭-১৩
হামার (হমার)	আমার	অধর মধু পিয়ব হামারা।	২০৭-৬
হামে	আমাকে	হামে হেরি বিহসলি থোরি।	২৪-৩
হামে*	আমাতে	হঠ ভেল রস হামে।	৫২নং ৭
হাস	হাসি	কারণ বিণু ক্ষণে হাস।	৫১-৫
হাসত	হাসে	হাসত আপন পয়োধর হেরি।	৩২-৩
হাসনি	হাসি	ঈষৎ হাসনি সনে।	১৫-৩
হিমধামা	হিমধাম চন্দ্র	উয়ল হরিণী হীনহিমধামা।	৫-৩
হিয় (হিয়া হিয়ে)	হৃদয়, বক্ষ	তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।	৩৪-৫
হিলোল	হিল্লোল	নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল।	১১৮-৪
হুঁ †	হই	হাম নহি শঙ্কর হুঁ বরনারী।	১৫৮-২
হু	হইল, হইয়া	সুকাম নটনে তুরি যতিক হু।	১৪৭-১১
হুতাসে	হুতাশনে	ঘট পরবেশে হুতাসে।	৮-৯
হৃদয়জ	স্তন	হৃদয়জ মুকুলি হেরি ঘোর ঘোর।	৩৫-৭
হৃদি	হৃদয়	শুনি ধনী মনোহৃদি ঝুর।	১১৪-৭
হেরই	দেখে	নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।	৫২-২
হেরই	দেখিয়া, দেখিলে	লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই।	১০৫-৮
হেরইতে	দেখিতে	হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধী।	৪০-৬
হেরত	দেখে	হেরত না হেরত সহচরী মাঝ।	৩৭-১০
হেরণ	দর্শন	হেরণে কেমন মুখ না বুঝি বিছারি।	৭৫-৯
হেরনু	দেখিলাম	স্বপন হি হেরনু নাগররাজ।	২০৮-৬
হেরব	দেখিবে	কৈছনে হেরব বয়ান।	২৩-৪

* হামে—কাব্যবিশারদে এস্থলে "হাম" আছে।

† হুঁ—কাব্যবিশারদে "হউ" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
হেরব	দেখিব	দিঠি ভরি হেরব সে চাঁদ বয়ান।	২০৭-১০
হেরবি	দেখিবি	মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।	১৫১-১
হেরয়ে	দেখে, দেখিতে পায়	হেরয়ে জনি কেহ।	৪৫-১০
হেরল	দেখিল	সমুখে হেরল বর কান।	২৩-২
হেরসি	দেখিতেছ	অব নাহি হেরসি তাক বয়ান।	১০২-৮
হেরহ	দেখ	পাণি ধরি হেরহ * *	১৪২-৭
হেরহু	দেখ	হামারি শপথ যদি হেরহু মুরারি।	৭৬-১
হেরি	দেখে	মনমথে হেরি উজিয়ার।	৯০-৬
হেরিয়ে	দেখি	ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার।	১১৯-২
হেরিলোঁ	দেখিলাম	কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী।	১৯-৭
হেরু	দেখে	আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।	২০৩নং৫
হেরু	দেখা যায়	আধ পয়োধর হেরু।	২-৬
হোই	হইয়া	কাল হোই কিয়ে উপজল মোর।	১১-৬
হোই	হয়	তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই।	৭০-৬
হোঁত	হইত ?	অব নাহি হোত নিরাশ।	১৭৩-৮
হোতি (হোত)	হইতেছে, হয়	বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি।	১০১-২
হোয়	হয়, হইয়া থাকে	ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর।	৩৫-৮
হোয়	হইতে পারে	তা সঞে রহস কবহু নাহি হোয়।	৫৬-৮
হোয়ত	হয়	থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপে।	৬৩-১০
হোয়ব	হইবে	সফল জীবন তব হোয়ব মোর।	১৯৮১২
হোয়বি	হইবি	কাহে হোয়বি বিমুখ।	৮১-৮
হোয়ল	হইল	রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।	৭১-৩
হোয়ে	হয়	তিরপিত না হোয়ে নয়ান।	১৬৯-১০

হ—কথার মাত্রা। যথা—"সেহ" ৪২-৪ ; ৫৮-৭।
হ—অনুজ্ঞায়। যথা—"ধরহ" "রাখহ" ৩৭-৮ ; ৭৯-৪।
হি—নিশ্চয়ার্থে। যথা—"গেলহি" ৬৮-১০।
হি—অনুজ্ঞায়। যথা—"শুনহি" ৫৪-১৫।
হি—৭মী বাচক। যথা—"অধরহি" ৬৯-২।
হু (হুঁ)—নিশ্চয়ার্থে। যথা—"অতিহু" ৬৯-১২।
হুক (হক)—৬ষ্ঠী নিশ্চয়ার্থে। যথা—"মুণীহুক" ২১-২।
হু—৭মীবাচক। যথা—"বনহু" ১৪২-১২।

শ্রীঅ—দে

সমাপ্ত

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

(১৩০৩,—২৯শে আষাঢ় পঠিত)

আজ যে পুথি খানি পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত করিতেছি, ইহা এক খানি বাঙ্গালা মহাভারত। বিজয়পণ্ডিত ইহার রচয়িতা ও লেখক বাণেশ্বর দেবশর্ম্মা।

কাশীদাসের মহাভারতের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। বেশী দিনের কথা নয়, বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের আগ্রহে সঞ্জয়, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রামেশ্বর নন্দী ইত্যাদি কয়েক জনের মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিজয়-পণ্ডিতের মহাভারত খানি প্রাচীন রচনা হইলেও আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় এই গ্রন্থ খানির নামও শুনেন নাই। যখন দেখিতেছি, বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে ভাষা মহাভারত বাহির হইতেছে এবং অনেকে আগ্রহের সহিত মাসিক পত্রিকায় সেই সকল মহাভারতের অতি সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিতেছেন, তখন এ গ্রন্থখানির বিষয় জানিতে কাহারও কৌতূহল হইতে পারে, এই ভাবিয়া আজ এই মহাভারত সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। জানিনা, উপস্থিত সুহৃদ্‌বর্গ এই ছেঁড়া জীর্ণ শীর্ণ গলিত প্রায় পুথি খানির আলোচনায় প্রীতিলাভ করিবেন কিনা?

পুথিখানি যেরূপে আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আজ ছয় বৎসর হইল, পূজার পর, বিশ্বকোষের জন্য প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করি। প্রথমে আজিমগঞ্জে গিয়া আমার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। এখানে দুই চারি দিন পুথির অনুসন্ধানে ঘুরিয়া ছিলাম। তথাকার ডাকপিয়ন এক দিন এক মহৎ ব্যক্তির বাটীতে কীটদষ্ট জীর্ণ পুথি নাড়িতে দেখিয়া আমায় বলিয়াছিল, 'এ ছেঁড়া কাগজ লইয়া কি করিবেন? এরূপ কত ছেড়া কাগজ আমরা ভাগীরথীর জলে ফেলিয়া দিয়াছি। কত পাটা পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।' তাহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। এখন বলিতে পার, এরূপ ছেঁড়া কাগজ আর তোমার বাড়ীতে আছে কি?' সেও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, 'আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও বিশ পঁচিশ খানা পড়িয়া আছে। তবে মেয়ে লোকেরা সে গুলি জলাঞ্জলি করিয়াছে কিনা, বলিতে পারি না।' তাহার বাটীতে গিয়া পুথি গুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। সেই ডাকপিয়নের মুখে নিকটস্থ এক বৈরাগীর বাড়ীতে

বাঙ্গালা পুথির সন্ধান পাইলাম। বৈরাগীর নামটী আমার স্মরণ হইতেছে না। তাঁহার কুটীরে গেলে তিনি অতি যত্ন করিয়া আমাকে কএক খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন। সে গুলি বৈরাগীর হৃদয়ের রত্ন। বৈরাগী সব ত্যাগ করিতে পারেন, প্রাণ থাকিতে সে কয় খানি ছাড়িতে প্যারেন না। কাজেই লোভ থাকিলেও সে গুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহারই ঘরের এক কোণে দেখিলাম, কতকগুলি ছেঁড়া পুথির পাতা স্তূপাকারে রহিয়াছে। আমি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী অম্লান বদনে বলিলেন, 'কতকগুলি খণ্ডিত পুথি, অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে, গঙ্গায় ফেলিয়া দিব বলিয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়াছি।' সেই পরিত্যক্ত কাগজ গুলি দেখিতে আমার আগ্রহ হইল। কতকগুলি পাতা তুলিয়া দেখিলাম, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের পুথির কিয়দংশ। আমি দেখিয়াই বলিলাম, 'বাবাজী! এ গুলি ফেলিয়া দিবে কেন? যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমায় দিতে পার।' বৈরাগী সন্তুষ্ট চিত্তে আমায় সে গুলি প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও সে গুলি পুঁটলী করিয়া লইয়া আসিলাম। এতদিন সেই পাতাগুলি দেখিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি পরিষদ্ হইতে কবিকঙ্কণ চণ্ডীসম্পাদনার্থ নিযুক্ত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আমার নিকট কবিকঙ্কণের পুথির কথা বলেন। তাঁহাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর খণ্ডিত পুথি খানি বাহির করিয়া দিব ভাবিয়া সেই ছেঁড়া পাতাগুলি পত্রাঙ্ক অনুসারে সাজাইতে আরম্ভ করিলাম। এখন সেই পরিত্যক্ত কাগজ হইতে এই কয় খানি গ্রন্থ উদ্ধার হইয়াছে—

১। বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত (১১৫০ সনে লিখিত)।
২। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (১১০৫ সনে লিখিত)।
৩। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত)।
৪। কেতকাদাসের মনসার ভাসান (বটতলার ছাপা হইতে পাঁচ গুণ বড়)।
৫। রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের কথা (খণ্ডিত)।
৬। লোচনদাসের দুর্লভসার (খণ্ডিত)।
৭। কাশীদাসী মহাভারতের আদি ও সভা পর্ব্ব (খণ্ডিত)।

কবিকঙ্কণের পুথি খানি আমি বিদ্যানিধি মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছি। এখন আলোচ্য মহাভারত খানির কথাই বলিব। এই পুথির শেষে ঠিক এই রূপ লিখিত আছে—

"মহাভারতের কথা সুনে যেই জনে।
সকল অধর্ম্ম হরে পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে॥
বিজয়পণ্ডীতের কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥ ঃ ঃ॥

ইতি সমাপ্ত পুস্তক শ্রীবাণেশ্বর দেবশর্ম্মণো। সাক্ষর মিদং তত্র। ১১৫০ এগারোশয় পঞ্চাষ তারিখ—১৫ আশ্বিন যথা দৃষ্টং তথা লিখনং লিখনে দোষ নাস্তি শ্রীশ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র

রায়স্য নৃপঋসি ক্ষাতো ধর্ম্মসিল দেবগুরু ভক্ত মধুকরতুল্য দ্বিজপাল জথোচিত প্রতিপাল্য পুস্তক শ্রীবাণেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ।”

উক্ত শেষ কয় ছত্রে গ্রন্থকার ও লিপিকরের যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, এ ছাড়া আর কিছু জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থ খানি তুলট কাগজে লেখা, অতি জীর্ণ অবস্থা, অনেক পাতের ধার গলিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অনেক অক্ষর অস্পষ্ট ও অনেক অক্ষর স্খলিত হইয়াছে। পুথি খানির অবস্থা দেখিলে দেড়শত বর্ষের অধিক পুরাতন বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়।

১১৫০ সনে আমরা রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে নবদ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখি। পুথিতেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম রহিয়াছে। এই সঙ্গে আবার বাণেশ্বর দেবশর্ম্মার নাম পাওয়া যাইতেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিরাজ করিতেন, মৃত বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা এক বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নাম পাই, দ্বিতীয় বাণেশ্বরের নাম নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরকে বড় ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই কাছে রাখিতেন, বাণেশ্বরও একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের অদ্বিতীয় মেধাশক্তির পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আপনার প্রতিপালক ভাবিয়া আনন্দিত হইতেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের শেষেও লেখক বাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিপালিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পুথির মাঝে মাঝে আরও তিন জায়গায় ‘স্বাক্ষর মিদং শ্রীবাণেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ’ এই রূপ লিখিত আছে। ইহা হইতে উভয় বাণেশ্বরকে অভিন্ন বলিয়া বোধহয়। কারণ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে শুদ্ধ নাম শ্রবণে চিনিত না, বা তাঁহার নাম শুনে নাই বঙ্গের পণ্ডিতসমাজে তখন এমন লোক ছিল না। এরূপ স্থলে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কেবল স্বাক্ষর দ্বারা যে আপনার পরিচয় দিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। বোধহয় তিনি নিজ পুস্তকে আর অধিক পরিচয় লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

পুথিখানিতে যথেষ্ট বর্ণাশুদ্ধি আছে। দেখিলে কোন পণ্ডিতের লেখা বলিয়া আর বোধ হয় না। বাণেশ্বরের মত এক জন পণ্ডিত যে এরূপ বানান ভুল করিবেন, তাহা যেন সহজেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু লেখক বাণেশ্বর আপনার দোষ কাটাইয়া বলিয়াছেন, তিনি যেমন আদর্শ দেখিয়াছেন, ঠিক তেমনি লিখিয়াছেন! তিনি একথা না লিখিলেও বোধ হয় দোষ হইত না। কারণ আমি অনেক বড় বড় অধ্যাপকের হস্তলিপি দেখিয়াছি, তাঁহারা সংস্কৃত লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধির দিকে অনেকটা দৃষ্টি রাখেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা লিখিবার সময় বানানের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না, এমন কি, ‘আমি’ লিখিবার সময় ম এয়ে ‘ী’ দেন, মনুষ্য লিখিবার সময় ‘স’ ব্যবহার করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য কেবল উচ্চারণের দিকে। উচ্চারণ বা স্বর অনুসারে তাঁহারা লিখিয়া থাকেন। বাণেশ্বরও এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত মধ্যেও বানান ভুল থাকায় বাণেশ্বরের লেখায় কিছু সন্দেহ

জন্মে। তবে কি দুই ব্যক্তির হাতের লেখা? শেষে যেখানে সন তারিখ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম লেখা আছে, এই অংশের লেখা পুথির অপর সমস্ত অংশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এজন্যও শেষ অংশ টুকু অন্যের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বোধ হয় বাণেশ্বরের পুথিতে শেষে কেহ ঐ অংশ যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবে।

এত বর্ণাশুদ্ধি আছে বলিয়া পুথি খানি অনাদরের জিনিষ নহে। পূর্ব্বে কত পণ্ডিতও বাঙ্গালা ভাষার আদর করিতেন, তাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতেন, আমরা এই আলোচ্য পুথিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; এ জন্যও এ পুথি খানি আমাদের আদরের জিনিস।

এখন লেখককে ছাড়িয়া গ্রন্থের একটু আলোচনা করিব।

পুথিখানিতে মোট ১৮০ পাতে এবং পয়ার ও ত্রিপদীতে প্রায় ৬৫০০ শ্লোক আছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ৩৭০০০। সুতরাং বর্ত্তমান পুথি খানি কাশীদাসী মহাভারত অপেক্ষা এক চতুর্থাংশেরও কম।

পরাগলী মহাভারত ও ছুটিখাঁর মহাভারতের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, যে উচ্চ-পদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারিগণও অতি সমাদরে ভাষা মহাভারত শুনিতে ভাল বাসিতেন। সেইরূপ বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট মহাভারত শুনিতেন। আলীবর্দ্দী কোন্ মহাভারত শুনিতেন, তাহা ইতিহাসে প্রকাশ নাই। সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র এই বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতই শুনাইতেন। এই বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থের উপর রাজেন্দ্র কৃষ্ণ-চন্দ্রের অনুরাগ ছিল, সেই জন্যই তাঁহার প্রিয় সভাসদ্ পণ্ডিত বাণেশ্বর স্বহস্তে গ্রন্থ খানি নকল করিয়াছিলেন। এখনও অনেক মহামহোপাধ্যায় ভাল গ্রন্থ সুবিধা মত স্বহস্তে নকল করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে বাণেশ্বর একজন মহাপণ্ডিত হইয়াও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাঠার্থ একখানি সুললিত বাঙ্গালা গ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিবেন, তাহা অসম্ভব নয়। কেহ বলিতে পারেন, বাণেশ্বর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রায় সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণ দেশভাষার আদর করেন না, এরূপ স্থলে সংস্কৃত কবি বাণেশ্বর বাঙ্গালা কবির গ্রন্থ নকল করিবেন, ইহা কি সম্ভব? বাণেশ্বরের বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগ ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যে রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রায় গুণাকর, কবিরঞ্জন, রসসাগর প্রভৃতি বঙ্গ কবি বিরাজ করিতেন, যে কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত কবিগণের রচনা অতিশয় ভাল বাসিতেন, সেই বঙ্গভাষানুরাগী রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় বাণেশ্বর পণ্ডিত বাঙ্গালার আদর করিতেন না, তাহা কিরূপে বলিব? গুপ্তিপাড়ানিবাসী সুকবি কালীমীর্জা আপনাকে বাণেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কালীমীর্জার আধ্যাত্মিক বাঙ্গালা গানের মধ্যেও বাণেশ্বর কবির গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এই প্রমাণ দ্বারাও বাণেশ্বরের বাঙ্গালা কবিতার উপর অনু-রাগ ছিল, ইহা বলা অসঙ্গত হইতে পারে না।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও রামেশ্বর নন্দীর যে মহাভারত বাহির হইয়াছে, তাহাদেরও

শ্লোক সংখ্যা আমাদের আলোচ্য মহাভারত অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং উক্ত মহাভারত কয় খানি অপেক্ষা এখানি আয়তনে ছোট ও সংক্ষিপ্ত।

আলোচ্য পুথিখানির প্রারম্ভের বাক্য* এই—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
শুদ্ধ-বুদ্ধিং চর্ম্মাম্বরং সুরমুনিং দুর্ল্লভং কবীন্দ্রং।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাং॥
নহি তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
যৈ র্নশ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ প্রধানঃ।
মুখে হুতং যৈর্ন ধরামরাণাং
তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমানাং॥
যো সততং কনকশৃঙ্গমধুরবেদং
বিশ্বাস (পুরঃ) সর শ্রীতার †
পুণ্যাঞ্চ ভাগবতং কথাশ্রুতাঞ্চ।
নিত্যং তুল্যফলং ভগবতী তস্য চ তস্য চ॥
অথ ভাগবতপ্রসঙ্গো লিখ্যতে।
কৃষ্ণত্বদীয়পদপঙ্কজপুঙ্গবাস্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥
অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণভেষজাৎ।
নশ্যন্তে সকলা রোগাঃ সদ্যঃ সদ্যো বদাম্যহং॥

পুথির প্রারম্ভের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ যে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে, অনেক কথক কথকতার আরম্ভে ঐ শ্লোক কয়টী গান করিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ হয় কোথাও কোথাও কথকতা বা গানের জন্য এই বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত প্রচলিত ছিল।

---

* যে সকল বাক্য পরে উদ্ধৃত হইয়াছে, কেবল তাহার বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হইল, তাহার উপর হাত দেওয়া হয় নাই।

† অস্পষ্ট।

শ্লোক কয়টীর পর ভাষা আরম্ভ—

"প্রণমহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গুণের নিধান॥
সঙ্গীতি নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিশত॥
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভাগবত॥
শাস্তি লক্ষ ত্রিশত নব লক্ষ কৈল শ্লোক। (?)
(কহিল) নারদ মুনি শুনে সর্ব্বলোক॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে শুনি।
পিতৃলোকে পঠন্তি শুনিলেন মহামুনি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রাক্ষস (যক্ষগণে)।
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক শুনে সাবধানে॥
পঞ্চ সহস্র শ্লোক মহামুনি প্রতিষ্ঠিত।
ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন কৈল যেন রীত॥
জন্মেজয় (খণ্ডিত)
দৈবে ব্যাসমুনি তথা আইলা সত্বরে॥
নানা বিধি প্রকারে পূজিল মহীপতি।
ইতিহাস কথা মুনি কহ মহামতি॥" ইত্যাদি

প্রাচীন বঙ্গ কবিগণ যেমন প্রতি বিবরণের শেষে এক একটী ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের বিজয়পণ্ডিতও স্থানে স্থানে এই রূপ ভণিতা দিয়াছেন—

১। মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
পদে পদে বৈসে যার ধর্ম্ম অবতার॥
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি॥ (৬পৃষ্ঠা)

২। বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্য কথা অনুপাম
অমৃত বরিষে নিরন্তর।
সুবর্ণ কলসী ভরি মহাজল পান করি
করহ না যায় যমঘর॥ (১৪৬ পৃষ্ঠা)

৩। মহাভারতের কথা যেন অমৃতের ধার।
পদে পদে বৈসে যার ধর্ম্ম অবতার॥
বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥ (১৫৫পৃঃ)

যে তিনটী ভণিতা তুলিলাম, ইহার ১ম ও ২য়টী বিজয়পণ্ডিত অনেক স্থলে প্রয়োগ

করিয়াছেন। এই দুইটী ভণিতা কাশীরামদাসের মহাভারতের অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কোন স্থলে দুই একটী শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে (২)। যেমন—

১। মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি॥ আদিপর্ব্ব ২২ পৃঃ

২। ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভব সিন্ধুতরি॥" সভাপর্ব্ব ২৫৪ পৃঃ

আবার কোথাও কাশীরাম অবিকল লিখিয়াছেন যেমন স্ত্রী পর্ব্বে। ৭১০ পৃষ্ঠায়

"বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥"

কাশীদাসের অমৃতলহরী বাঙ্গালীর হৃদয়-সরোবরে এখনও আঘাত করিতেছে,—তাঁহার পুণ্য কথায় এখনও বাঙ্গালীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতেছে। তাঁহার সেই অমৃতময়ী পুণ্য কথা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে বলিবেন, ঐ দুটী ভণিতা কাশীদাসের নিজস্ব, তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত। বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থে ঐ দুটী ভণিতা দেখিয়া হয়ত বলিবেন, 'বিজয় পণ্ডিত কাশীরামের মহাভারত হইতে অতি সুললিত ভাবিয়া ভণিতা চুরি করিয়াছেন।' কিন্তু এখন আমি প্রমাণ করিতেছি,—কাশীরাম মহাকবি হইয়াও বিজয়-পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে ভণিতা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চাশ জায়গায় 'বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী' এই ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি ভণিতায় পাণ্ডবদিগের বিজয়-কথা লেখাই কাশীদাসের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি 'বিজয়পাণ্ডবকথা' এই রূপ শব্দ বিন্যাস না করিয়া 'পাণ্ডববিজয়কথা' এই রূপ করিতেন। যাঁহাদের অল্পমাত্র ব্যাকরণ জ্ঞান আছে, তাঁহারাও আমার কথার যথার্থতা নিরূপণ করিতে পারিবেন। বিজয়পণ্ডিতের নামানুসারেই তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের নাম 'বিজয়পাণ্ডবকথা' রাখিয়াছেন, এই জন্যই তাহার ভণিতায় 'বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী'র উল্লেখ দেখি। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, কাশীরাম যদি বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে ভণিতা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি এ কথা লিখিতেন, কিন্তু কোন স্থানে তিনি এ কথা স্বীকার করেন নাই। জানি না, কেন তিনি এ কথা স্বীকার করিলেন না। স্বীকার করিলে হয়ত তিনি ভাবিয়া ছিলেন, তাহার গ্রন্থের সেরূপ আদর হইবে না। এই জন্য বোধ হয় সাধারণের অজ্ঞাতসারে বিজয়ের নাম স্মরণ করিয়া আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া ছিলেন। বাস্তবিক যে কখন বিজয়পণ্ডিতের নাম অথবা তাঁহার মহাভারত পাঠ করে নাই, সে কখন কাশীরামের ভারত পাঠ করিয়া বলিতে পারিবে না যে, কাশীরাম অপরের গ্রন্থ হইতে ভণিতা লইয়াছেন, এই টুকুই কবি কাশীরামের বাহাদুরী। আমি দেখিয়াছি, কেবল ভণিতা

(২) পূর্ণচন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রিত মহাভারত ৭, ২১, ৭৮৯, ৭৮৬, ৭৯৮, ৮০৪, ৮১৫, ৮২০, ৮৩০, ৮৩৭, ৮৪৪ পৃষ্ঠায় ভণিতা দেখ।

কেন, কাশীরাম স্থানে স্থানে বিজয়পণ্ডিতের কবিতা প্রায় একটু আধটু সংশোধন করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজয়পণ্ডিত (কর্ণ পর্ব্বে) 'কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাজয়প্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন—

"দুঃশাসনে জিনিল নকুল মহাবীর।
কর্ণ সৈন্য অগ্রে গেল নির্ভয় শরীর॥ ১
আপনি নিবারি কর্ণ হাতে ধনুক করি।
দর্প (করি) নকুল বলিল আগুসরি॥ ২
অনর্থের মূল তুমি করিলা প্রবেশ।
তোমার প্রসাদে হইল কুরুবংশ শেষ॥ ৩
আজি তোরে রণ মধ্যে করিমু সংহার।
কৃতকৃত্য হইব ভাই ধর্ম্ম অবতার॥ ৪
হাসিয়া বলেন ভাই তুমি অল্প বুদ্ধি।
শিশু হইয়া না বুঝসি বিক্রমের শুদ্ধি॥ ৫
কর্ম্ম না করিয়া প্রশংস আপনারে।
আজি তোরে সংহারিমু দৈব বিপাকেরে॥ ৬
এ বলিয়া বাণ বিঁধে কর্ণ মহাবীর।
চতুর্ব্বিংশতি বাণ বিঁধে নকুল শরীর॥ ৭
সে সব সহিয়া নকুল মহাবীর।
বহু বাণে বিঁধেন কর্ণের শরীর॥ ৮
আর সব মারিয়া কাটি পাড়ে ধনু।
আর বাণ মারিয়া বিন্ধিলেক তনু॥ ৯

(বিজয়—মহাভারত ১৩৩ পৃঃ)

এই স্থানে কাশীরাম ঠিক এই রূপ লিখিয়াছেন—

"দুঃশাসনে জিনিয়া নকুল মহাবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয় শরীর॥ ১
বুভুক্ষু ভুজঙ্গ যেন নকুল প্রচণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে মহাবীরে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
আপনা নিরোধে বীর অস্ত্র হাতে করি।
দর্প করি নকুল বলয়ে আগুসরি॥ ২
যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হইতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ॥ ৩

আজি রণ মধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্ম অবতার॥ ৪
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্প বুদ্ধি।
কিছু না জানিস্ তুই বিক্রমের শুদ্ধি॥ ৫
কি কর্ম্ম করিয়া প্রশংসহ আপনাকে।
আজি ছন্ন হইবেক কর্ম্মের বিপাকে॥ ৬
এত বলি নকুলে রুষিল কর্ণবীর।
পঞ্চশত শরে বিন্ধে তাহার শরীর॥ ৭
শর হানি কর্ণ তার কাটিলেক ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেক তনু॥ ৯
(কাশীদাসী মহাভারত ৬২৯ পৃঃ)

এই রূপ আরও দুই এক স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

বিজয়পণ্ডিত সমস্ত ভারত খানি লিখিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অবসানের পর যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া মঙ্গল গীত গাহিয়া আপনার বিজয়পাণ্ডব কথা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাশীরামও এই পর্য্যন্ত আদর্শ স্বরূপ বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত ভাষা জৈমিনি ভারত * ও কথকের কথা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাশীরাম প্রকৃত কবি ছিলেন, বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। তিনি আপন প্রতিভাবলে কল্পনা-প্রসূনে অভিনবরূপে মহাভারতকে সাজাইয়াছেন। তাঁহার সেই মধুর বর্ণনা ও ভাষার ওজস্বিতা পাঠ করিলে যেন এক অভিনব ভাব আসিয়া হৃদয়-মন্দির অধিকার করে, তাহাতে কাশীরামের বর্ণনা সকলই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক কাশীরামের অসামান্য প্রতিভা থাকিলেও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান ছিলনা, তিনি মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মূল মহাভারত কখন দেখেন নাই। তাহা হইলে তিনি তাঁহার আদর্শ বিজয়পণ্ডিতকে লঙ্ঘন করিয়া কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া মূল ভারতে যাহা নাই, এরূপ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক অনেক কথা লিপি বদ্ধ করিতেন না। তিনি মূল মহাভারতের অনুবর্ত্তী হন নাই বলিয়াই তাঁহার সেই পূর্ব্ব আদর ক্রমেই লোপ পাইতেছে, তাঁহার 'অমৃত সমান' কথা আর বড় কেহ শুনিতে চায় না, এখন তাই বিদ্বৎসমাজে ৺ কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারতের আদর।

* কাশীরামের পূর্ব্বে সঞ্জয় ও শ্রীকরনন্দী প্রভৃতি জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ভারত-সংহিতার সহিত তাহাদের গ্রন্থের ঐক্য নাই।

কাশীরাম কিরূপে তাঁহার আদর্শ পুস্তকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহার দুই একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মূল মহাভারতে লিখিত আছে, অভিমন্যুবধের পর যুধিষ্ঠির শিবিরে আসিয়া ভূমে বসিয়া অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে থাকেন, তখন ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে মৃত্যু-প্রজাপতি সংবাদ বলিয়া তাঁহার শোক অপনোদন করেন। বিজয়পণ্ডিত মূলেরই অনুসরণ করিয়াছন; কিন্তু কাশীরাম এখানে ব্যাসদেবের মুখে অভিশপ্ত চন্দ্রের অভিমন্যু-রূপে জন্ম ও তাঁহার শাপমোচনকথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করেন, একথা মূল মহাভারতে নাই।

মূল মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে অশ্বথামার মত লইয়া দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতিপদে বরণ করেন, এই রূপ লিখিত আছে। বিজয়পণ্ডিতও তাহাই করিয়াছেন। (কর্ণ পর্ব্ব ১১শ অধ্যায় ও বিজয় মহাভারত ১৩১ পৃঃ)। কিন্তু কাশীরাম অশ্বথামার স্থানে শকুনিকে বসাইয়াছেন। (কাশীদাসী ৬২৭ পৃঃ)। কাশীরাম লিখিয়াছেন, অশ্বথামা দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডব ভাবিয়া পাঁচ জনের মুণ্ড মৃত্যুশয্যাশায়িত দুর্য্যোধনের কাছে লইয়া আসেন; তাহাতে দুর্য্যোধন অতিশয় হর্ষলাভ করেন, কিন্তু যখন সেই পাঁচ মুণ্ড টিপিয়া বুঝিলেন যে সে গুলি পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড নহে, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের মুণ্ড, তখন হরিষে বিষাদে দুর্য্যোধন প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মূল মহাভারতে এরূপ অসঙ্গত কথা নাই। অশ্বথামা পূর্ব্ব হইতেই দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে চিনিতেন। তিনি পঞ্চ মুণ্ড আনেন নাই। যখন দুর্য্যোধন অন্তিম শয্যায় শায়িত, সেই সময় কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বথামা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মূল ভারতে সৌপ্তিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

"অশ্বথামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ।
দুর্য্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ং।
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ॥ ৪৮॥
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শারদ্বত স্তথা॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ।
পাঞ্চালা নিহতা সর্ব্বে মৎস্যশেষাশ্চ ভারত॥ ৫:
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াং।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৩
ন মেঽকরোত্তদ্গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা।
য ত্বয়া কৃপভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্যমে কৃতং॥ ৫৪
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ। ৫৬

ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং সঃ কুরুরাজো মহামনাঃ।
প্রাণমুপাস্যজদ্বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎস্জন্॥” ৫৭

(সৌপ্তিক ৯ অ্যাধয়)

বিজয়পণ্ডিত এখানে লিখিয়াছেন—

“উচ্চৈঃস্বরে অশ্বত্থামা বলিল বচন॥
প্রাণ রাখ দুর্য্যোধন কর অবধান।
অশ্বত্থামার বাক্য যেন অমৃত সমান॥
পাণ্ডবের বলে অবশিষ্ট সপ্ত জন।
কৃষ্ণ সাত্যকি আর পঞ্চপাণ্ডব জন॥
তোমার বলে অবশিষ্ট হইল তিন।
কৃতবর্ম্মা কৃপ আর মুঞি ভাগ্যহীন॥
সর্ব্ব সহোদর সঙ্গে পঞ্চাল নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সংহারিল আজিকার রাতি॥
পঞ্চাল বংশের আর নাহি এক জন।
আমার হাতে হইল আজি তাহার নিধন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দেব অবতার।
আজি রাত্রি তাহা সবা করিলাম সংহার॥
এ বোল শুনিয়া রাজা পাইল চেতন।
সুহৃদের বাক্য শুনি বলে ততক্ষণ॥
ভীষ্ম মোর না করিল এত উপকার।
না করিল কর্ণ বীর প্রতাপ অপার॥
মহাসত্ব দ্রোণবীর সেহো না করিল।
তুমি মোর মর্ম্মবৈরী বলেতে মারিল॥
অন্তকালে সেনাপতি মারিল প্রধান।
ইন্দ্রসভাতে আমি করিব ব্যাখান॥
স্বস্তি থাকহ তোমরা চলি যাও ঘর।
আমি স্বর্গে যাই এই ত্যজি কলেবর॥
এ বলিয়া দুর্য্যোধন নিঃশব্দ হইল।
শরীর ছাড়িয়া ইন্দ্রের ভুবনে চলি গেল॥

(বিজয়—মহাভারত ১৬৫ পৃঃ)

উপরের মূল ও বিজয় পণ্ডিতের ভাষা উভয় মিলাইলে সহজেই স্বীকার করিতে হইবে বিজয়পণ্ডিত প্রকৃত চরিত্র ও মূলের প্রকৃত ভাব রক্ষা করিতে কত চেষ্টা করিয়াছেন ও

কতদূর সফল হইয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের কবিতায় অশেষ মাধুর্য্য থাকিলেও মূলের সহিত তাহার কতদূর পার্থক্য ঘটিয়াছে ও চরিত্র কতদূর বিকৃত হইয়াছে! কোথায় ব্যাস লিখিয়াছেন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের নিধনে মহাসুখী হইয়া দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কাশীরাম লিখিয়াছেন কি না—

"নির্ব্বংশ করিলা তুমি ভাই পঞ্চ জনে।
কুরুকুল বংশহীন হইল এতদিনে॥
এত বলি বিষাদ করিল বহুতর।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর॥"

(কাশীদাসী মহাভারত ৬৮৯ পৃঃ)

এইরূপ কাশীদাসীর অমৌলিকতা অনেক দেখান যাইতে পারে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম মহাভারতের মূল চরিত্র কাশীরামের হাতে পড়িয়া বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। সেই সকল উচ্চ বীর চরিত্র কাশীরাম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কাশীরামের গ্রন্থকে মহাভারত না বলিয়া বাঙ্গালায় একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত।

এখন দেখিতে হইবে, বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে? আড়াই শত বর্ষের অধিক হইল, কাশীরাম দাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যখন বিজয় পণ্ডিতের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন যে বিজয়পণ্ডিত কাশীরামদাসের পূর্ব্বে ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কত দিন পূর্ব্বে ছিলেন, তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

বিজয়পণ্ডিতের সময় বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, কাশীরামের সময় তাহার অনেক উন্নতি ও রূপান্তর দেখা যায়। যেমন (১) মোক বলিলে মোরে, (২) করহু= করিব, (৩) কহসি=কও, (৪) বেড়ান্ত=বেড়ায়, (৫) করন্তি=করে; এ ছাড়া=করিব করিবে, মারিব=মারিবে। চাতর, পরাভর প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ ঐ সকল শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) "অর্জ্জুন বলেন কর্ণ আজ্ঞা কর মোক।
কোন কর্ম্ম করিলে পাইব স্বর্গলোক॥" (বিজয় মহাঃ ১৩২ পৃঃ)

(২) "এই দুঃশাসনের করহু রক্তপান।"

(৩) "অনায়াসে মিথ্যা কথা কহসি বর্ব্বর।" (১১৬ পৃঃ)

(৪) "এক শত পঞ্চ ভাই একত্র বেড়ান্ত।
শিশুক্রীড়া করে সবে কারে না ডরান্ত॥"

(৫) "রাজা সব দেখিয়া করন্তি উপহাস॥
ভীমেরে বেড়িয়া সবে বরিসন্তি শর॥" (১১ পৃঃ)

(৬) "জিনিতে পারিব তুমি শুন নরপতি॥

পাণ্ডুর তনয় সব সংহার করিব।
পঞ্চাল সোমক বংশ সবাকে মারিব॥" (১৪৭ পৃঃ)

(৭) "প্রজালোকে ঘরে ঘরে চাতরে চাতরে।" (৬ পৃঃ)

(৮) "একো একো হানিয়া বীর সংহারিল শর।
সর্ব্বলোক দেখিল সৈন্যের পরাভর॥" (১৩৮ পৃঃ)

প্রায় ৪০০ বর্ষ গত হইতে চলিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন। তাঁহারা যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, যেরূপ তৎকাল প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে সেই রূপ শব্দ বিন্যাস ও সেই রূপ সরল ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ স্বরূপ যে কএকটী প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছি, গৌড়াধিপ হোসেন শাহের সময়ে রচিত পরাগলী ও ছুঁটি খানের মহাভারতে ঐরূপ প্রয়োগ বিস্তর আছে। এমন কি পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থানে আমাদের আলোচ্য মহাভারতের সহিত মিল দেখা যায়। এখানে একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

"তে কারণে আইলাঙ বিরাট নগর।
সত্য কথা কহিলাঙ তোমার গোচর॥
সুদেষ্ণা বলন্তি তবে শুন বর নারী।
মাথায় করিয়া তোমায় রাখিবারে পারি॥
স্ত্রীগণ দেখিলে তোমা নারে পাসরিতে।
কেমনে পুরুষ মন পারিব রাখিতে॥
তোমারে দেখিলে রাজার মজিবেক মন।
বলে ধরিয়া নিব রাখিবে কোন জন॥"

(বিজয়—বিরাট পর্ব্ব ৪৫ পৃঃ)

পরাগলী মহাভারতে আছে—

"সুদেষ্ণা এ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আমি পারি॥
নারী সবে তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমতে পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন। ১
বল করি ধরিতে রাখিবেক কোন জন॥
রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি॥

নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে॥"
(পরাগলী ভারত বিরাট পর্ব্ব)

এখন আবার আমরা আর এক গোলে আসিয়া পড়িলাম। কোথায় দেখাইতেছি যে কাশীরাম বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত আদর্শ করিয়া তাহার উপর আপন কবিত্ববলে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক অভিনব ভারত রচনা করেন; এখন উপরে যে কএকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়, বিজয়পণ্ডিত নয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর উভয়ের মধ্যে এক জন অপরের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন। কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত গৌড়াধিপ হোসেন শাহের সময় রচিত হয়, কিন্তু আমাদের বিজয় পণ্ডিতের ভারত কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা স্থির জানা যায় না। এরূপ স্থলে কবীন্দ্র ও বিজয় পণ্ডিতের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী ও কে পরবর্ত্তী নির্ণয় করিতে হইলে উভয়ের গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপরে যে কয় ছত্র তুলিয়াছি, তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে, পরাগলী ভারতের ভাষা অপেক্ষা বিজয়ের ভাষা কতকটা প্রাচীন ধরণের। বিজয় লিখিয়াছেন বলন্তি, পরাগলী ভারতে আছে বোলেন্ত, এখানের দুএরই অর্থ বলে। পরাগলী ভারতে আছে 'রাখিবে কোন জন', ও বিজয় ভারতে আছে 'রাখিব কোন জন' উভয় স্থলে একই অর্থ। যাহারা প্রাচীনতম বাঙ্গলা ভাষা মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, পরাগলীর 'বোলেন্ত' ও 'রাখিবে' প্রয়োগ অপেক্ষা বিজয়ের 'বলন্তি' ও 'রাখিব' প্রয়োগ সমধিক প্রাচীন‡। এ ছাড়া উভয় ভারত সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, পরাগলী অপেক্ষা বিজয় পণ্ডিতের ভারত মূল গ্রন্থ অনুসারে ঠিক লিখিত হইয়াছে। দ্রোণ-বধের পর যখন অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে আসেন, তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামার আগমন সংবাদ দিয়া গুরুর জন্য এইরূপ বিলাপ ও যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিয়া ছিলেন।

"উপচীর্ণো গুরুর্মিথ্যা ভবতা রাজ্যকারণাৎ।
ধর্ম্মজ্ঞেন সতানাম সোঽধর্ম্মঃ সুমহান্ কৃতঃ॥ ৩৩
অবৃণীত সদা পুত্রান্মামেবাভ্যধিকং গুরুঃ॥ ৪৬
অহো বত মহৎপাপং কৃতং কর্ম্ম সুদারুণং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন দ্রোণোঽয়ং সাধুঘাতিতঃ॥ ৪৯
অক্ষীয়মাণো হুস্তাস্ত্রস্তদ্বাক্যেনাহবে হতঃ।
নহি তং যুধ্যমানং বৈ হন্যাদপি শতক্রতুঃ॥ ৪৭

‡ সময়াভাব ও স্থানাভাবে এখানে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও প্রাচীন বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
রামে বালিবধাদ্যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥ ৩৪
গুরুং মে যত্র পাঞ্চাল্যঃ কেশপক্ষে পরামৃষৎ।
তন্ন জাতু ক্ষমেদ্দ্রৌণি র্জানন্ পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ৩২
সো ২দ্য কেশগ্রহং শ্রুত্বা পিতুর্ধক্ষ্যতি নো রণে ॥ ৪১
রক্ষত্বিদানীং সামাত্যো যদি শক্লোষি পার্ষতং ॥ ৩৯
গ্রস্তমাচার্য্যপুত্রেণ ক্রুদ্ধেন হতবন্ধুনা।
সর্ব্বে বয়ং পরিত্রাতুং ন শক্যামো২দ্য পার্ষতং ॥ ৪০
(দ্রোণপর্ব্ব ১৯৭ অধ্যায়)

অর্জ্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা নোচুস্তত্র মহারথাঃ। ১
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্ভীমসেনো২ভ্যভাষতঃ।
কুৎসয়ন্নিব কৌন্তেয়মর্জ্জুনং ভরতর্ষভ ॥ ২
মুনির্যথা২রণ্যগতো ভাষতে ধর্ম্মসংহিতাং। ৩
যত্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য হৃতং রাজ্যমধর্ম্মতঃ।
দ্রৌপদী চ পরামৃষ্টা সভামানীয় শত্রুভিঃ ॥ ৯
বনং প্রব্রজিতাশ্চ স্ম বল্কলাজিনবাসসঃ। ১০
ক্ষত্রধর্ম্মপ্রসক্তেন সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতং।
তমধর্ম্মমপাক্রষ্টুং স্বত্বা২দ্যসহিতস্ত্বয়া ॥ ১১
বাসুদেবে স্থিতে চাপি দ্রোণপুত্রং প্রশংসসি।
যঃ কলাং ষোড়শীং পূর্ণাং ধনঞ্জয় ন তে২র্হতি ॥ ১৮
(দ্রোণপর্ব্ব ১৯৮ অধ্যায়)

বিজয় পণ্ডিত মুলের ঠিক ভাব বজায় রাখিয়া এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"ধর্ম্ম প্রবোধিয়া বলে বীর ধনঞ্জয়।
কুটবুদ্ধি বধিলা তুমি দ্রোণ মহাশয় ॥
তুমি ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্ম সোষর।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি রাজরাজেশ্বর ॥
প্রত্যয় করিয়া দ্রোণ পুছিল তোমাতে।
তুমি মিথ্যা বল হেন প্রত্যয় কাহাতে ॥ ৩৩
কোন করিলা মোর গুরুরে সংহারি।
রাজ্যলোভে হেন মত অধর্ম্ম আচরি ॥ ৩৩
পুত্র হইতে আচার্য্য আমারে স্নেহ করি।
আমা স্বা হেন কোথা পাপদুরাচারী ॥ ৪৬

রাজ্যলোভে না গুণিনু গুরুর সংহার।
পরলোক না গুণিনু নরক অপার॥ ৪৯
বালিবধে অপকীর্ত্তি রামের তরে গাহে।
দ্রোণবধে অপকীর্ত্তি তোমার তরে কহে॥ ৩৪
অশ্বত্থামা বধ্য নহে পৃথিবী ভিতরে।
কি করিতে পারে তারে দেব পুরন্দরে॥ ৪৭
আচার্য্যের কেশ ধরে দ্রুপদ নন্দন।
ক্রুদ্ধ হইল অশ্বত্থামা তাহার কারণ॥
যে মোর গুরুর কেশ ধরিলেক দাপে।　　} ৩২, ৪১
সৈন্য রাখুক ধৃষ্টদ্যুম্ন আপন প্রতাপে॥
আমা হইতে না হইব সৈন্য পরিত্রাণ।
মোর যুদ্ধ নাহি অশ্বত্থামা বিদ্যমান॥　　} ৩৯, ৪০
অর্জ্জুনের বাক্যে কেহো না দিল উত্তর।
কোপে বীর দাপে বলে বীর বৃকোদর॥ ১
হেন মহাসত্ব হইয়া বল বিপরীত।
নৃপতিরে গঞ্জিলা না বুঝ হিতাহিত॥ ২
তপস্বীর বচন তোমার যত বোল। ৩
ক্রোধে দৃষ্টি দিয়া ক্ষমারে দেহ কোল॥
জাতি ব্রাহ্মণ দ্রোণ ক্ষমা দিল রণে।
নিরস্ত হস্ত নহিলে তাহারে জিনে কোন জনে॥
জাতি ক্ষত্রির ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর।
ছিদ্র পাইয়া সংগ্রামে কাটিল তার শির॥
এক বাক্য বলিলা নৃপতিরে দুরাচার।
তাহার ক্রমে কিসেরে বল অবিচার॥
মিথ্যা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নিল হরি।
তখনে কি না ছিল ধর্ম্ম অধিকারী॥
রজস্বলা দ্রৌপদীরে সভায় আনিল।
জৌগৃহ দাহন তুমি সব পাসরিল॥　　} ৯, ১০
বনবাসে যত দুঃখ পাশরিলা মনে।
যত দুঃখ সহিলাম আসি বিরাট ভবনে॥
সপ্ত রথি মিলিয়া অভিমন্যু মারি।
সব পাশরিলা তুমি আপনা পাশরি॥

জনার্দ্দন সম্মতে আমার যত কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের উচিত কিসের অধর্ম্ম॥ ১১
তোমার শতেক ভাগ বীর্য্য নাহি রহে।
কোন্ গুণে প্রশংসা করহ তুমি তাহে॥
দেব দৈত্য রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষগণে।
কার শক্তি যুদ্ধ করিতে পারে তোমার সনে॥ } ১৪

(বিজয়-ভারত ১২৮ পৃঃ)

উপরে ভারতের যে অংশ উদ্ধৃত হইল, কাশীরামের ভারতে উহার অনুমাত্র উল্লেখ নাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিজয় পণ্ডিতের ঠিক অনুকরণ করিলেও, তাঁহার গ্রন্থে মূল সংস্কৃতের ভাব ঠিক রক্ষিত হয় নাই।

এই সকল কারণে আমরা পরাগলী ভারতকে বিজয়পণ্ডিতের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বরং সংস্কৃতানভিজ্ঞ কবি কাশীরাম যে ভাবে বিজয় পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত ভারতকথার সাহায্যে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, পরাগলী ভারতও সেই প্রণালী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

বিজয় পণ্ডিতের ভারত অতি সংক্ষিপ্ত বোধ হয়, এই জন্য তদপেক্ষা কিছু বড় পরাগলী ভারত রচিত হইলে পরমেশ্বর কবীন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "আমরা যত পুস্তক পড়িয়াছি, তন্মধ্যে পরাগলী মহাভারতের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন ভাষার পুস্তক আর দেখি নাই। ভাষার প্রাচীনত্বে এই পুস্তক এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়াছে *।" কিন্তু পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, ভাষার প্রাচীনত্বে বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ পরাগলী ভারত অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। পরাগলী ভারত প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়। এ রূপ স্থলে বিজয় পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত ভারতকথা ৪০০ বর্ষেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মহাভারত খানি যে বঙ্গভাষার একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। চারিশ বর্ষেরও পূর্ব্বে বঙ্গভাষার গঠন কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী লেখকগণের দোষে দুই এক স্থানে বিকৃত হইলেও আমরা সেই প্রাচীন রূপের যথেষ্ট প্রমাণ এই সংক্ষিপ্ত ভারত হইতে প্রাপ্ত হই। মূল মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ, তাহা সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূল বিষয়-গুলি মনে রাখা সহজ কথা নয়; এমন কি মহাভারতের বিস্তীর্ণ অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল ভারতের যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্য এখনও দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। বিজয়পণ্ডিত সেই অভাব দূর করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের মুখ্য ঘটনা গুলি সংক্ষেপে যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি ভেজাল মিশাইতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্গ-বাসীকে খাঁটী জিনিস দেখাইয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গভাষাকে উপকৃত

* সাহিত্য ১৩০১ সাল, ২৫১ পৃঃ।

করিয়াছেন। আরও বলিতেছি, যাঁহার সময় অল্প, অথচ মূল ভারতের বিষয় গুলি জানিতে অভিলাষী, তিনি এই সংক্ষিপ্ত ভারত কথা পাঠ করিয়া কতক শান্তি লাভ করিবেন।

[বারান্তরে বিজয়পণ্ডিতের বিজয়পাণ্ডবকথা ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বিজয়'গুপ্তের মনসার পাঁচালী।

(১৩০৩ সালের ১ লা ভাদ্র, সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে সহ-সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত)।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বিজয়-গুপ্তের মনসার পাঁচালী সম্বন্ধে আমার নিকট কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্ন কয়টীর উত্তর যথাসাধ্য বিবৃত হইল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রশ্ন কয়টী এই—

(ক) বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালীর কাল-নির্ণয়, গ্রন্থ হইতে জানিবার উপায় আছে কি ?

(খ) বিজয়গুপ্তের পরিচয় বিদিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার নিবাস কোন্ গ্রামে ? কোন্ জেলায় ?

(গ) তৎপ্রদত্ত আত্মপরিচয় যদি পুঁথিতে লিখিত থাকে, তবে তাহা হইতে তদীয় পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তান্ত প্রভৃতি জানিবার পক্ষে কোন উপায় বা সুযোগ ঘটিতে পারে কি না ?

(ঘ) " গুপ্ত " উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে বৈদ্য মনে হইতেছে। তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক্ কি না ?

প্রশ্ন কয়টীর উত্তর যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর। কাল-নির্ণয়।

আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বিজয় গুপ্তের-গ্রন্থ খানির পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থ হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় অতীব দুরূহ ব্যাপার। অনুলিপিকার-গণের ভ্রম-প্রমাদবশতঃ মূল গ্রন্থের অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেহ কেহ স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে এই গ্রন্থমধ্যে অন্য কবির রচিত কবিতা হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ বা কবিত্ব শক্তির কণ্ডূয়নে উত্তেজিত হইয়া তন্মধ্যে স্বরচিত কবিতা সংযোজিত অথবা গ্রন্থস্থ কোন অংশের পরিবর্ত্তে স্বরচিত পদ-সমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই রূপে গ্রন্থ খানি নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় তথ্য-নির্ণয়ে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা এ পর্য্যন্ত

৮।৯ খানি পুথি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে অনেক পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়াছে। এমন কি কোন দুই খানি পুস্তকেই সম্পূর্ণ অভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয় না।

বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালীর সময়-সম্বন্ধে আমাদের সংগৃহীত আটখানি পুথির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভণিতি দৃষ্ট হয়।

(১) একখানি পুথিতে ভণিতি আছে ;—

"ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।"

(২) দুই খানি পুথিতে আছে ;—

"ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক॥"

(৩) অপর এক খানিতে আছে ;—

"ঋতু সিকে বেদ শশী পরিমিত শক"

(৪) আর এক খানিতে আছে ;—

"ঋতু বসন্তদেব নিশি পরিমিত।"

(৫) অবশিষ্ট তিন খানি পুথিতে এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই।

উপরি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পুথি মধ্যে, (১) প্রকারের ভণিতিপাঠে বোঝা যায়, গ্রন্থ-রচনার প্রারম্ভ সময় ১৪১৬ শক ; (২) প্রকারের ভণিতি পাঠে বোধ হয়, ১৪০৬ শকে গ্রন্থরচনা আরব্ধ হইয়াছিল। আমরা (৩) প্রকারের ভণিতির অন্তর্গত "সিকে" শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই ; কিন্তু এই "সিকে" শব্দ অর্থাৎ দশক স্থান ব্যতীত অন্যান্য অংশ গুলি (১) ও (২) ভণিতির অনুরূপ মাত্র। (৪) প্রকারের কবিতা দ্বারা জানা যায়, প্রতিলিপি-লেখক "ঋতু শশী" অথবা "ঋতুশূন্য" ইত্যাদি শব্দের অর্থ না বুঝিয়া হয়তো উহাকে অশুদ্ধ মনে করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থ-বিশিষ্ট "ঋতু বসন্তদেব নিশি" এই স্বরচিত পদসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। (৫) প্রকারের পুঁথি দেখিয়া বোধ হয়, প্রতিলিপিলেখক ঐ সকল বাক্যের অর্থ না বুঝিয়া উহা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত পাঁচ প্রকারের ভণিতি হইতে আমরা সন্ধান পাইলাম, ১৪১৬ অথবা ১৪০৬ শকাব্দে গ্রন্থের রচনা আরব্ধ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ভণিতিটী সমুদায় গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়,—

"শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা পঞ্চমী।
তৃতীয় (১) প্রহর নিশি (২) নিদ্রা যায় স্বামী॥
নিদ্রার আবেশে না জাগে কোন জন (৩)।
হেন কালে বিজয়গুপ্ত দেখিল স্বপন॥

পাঠান্তর।—(১) দ্বিতীয়।
(২) রাত্রি।
(৩) নিদ্রার ব্যাকুল লোক না জাগে এক জন।

স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্ত নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
শ্রীহরি গোবিন্দ বলি উঠিয়া বসিল॥
প্রভাত সময়ে প্রকাশিত দশ দিগ।
স্নান করি বিজয়গুপ্ত মনসা পূজিত॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া লিখিতে কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥ (৪)

ইহা হইতে বোঝা যায়, বিজয়গুপ্ত রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিন তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়, যে বৎসর বিজয়গুপ্ত গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসর মনসাপঞ্চমী অর্থাৎ কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি রবিবারে ছিল। দিন-চন্দ্রিকা-মতে জ্যোতির্গণনা দ্বারা দেখা যায়, ১৪০৬ শকে ১২ই শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পরে মনসা-পঞ্চমীর আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৪১৬ শকাব্দে মনসাপঞ্চমী ২২ শে শ্রাবণ রবিবার কয়েক দণ্ড পরে আরব্ধ হয় এবং তৎপর দিবস ২৩ শে শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি থাকে। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে পঞ্চমীর আরম্ভ হয় না। কিন্তু তৎপর দিবস সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চমীর স্থিতি থাকে; এ জন্য মনসা-পূজা পর দিবস (অর্থাৎ সোমবারে) কর্ত্তব্য হয়; কিন্তু মনসাপঞ্চমী রবিবারেই প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রন্থারম্ভের কাল ১৪০৬ শকাব্দ স্বীকার করিলে উল্লিখিত ভণিতির সহিত ঐক্যতা থাকে না; কিন্তু ১৪১৬ শকাব্দকে গ্রন্থারম্ভের কাল স্বীকার করিলে উল্লিখিত ভণিতির সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। তাহা হইলে উপরোক্ত ভণিতিটী এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,—

কবি ১৪১৬ শকের ২২ শে শ্রাবণ রবিবার মনসাপঞ্চমীর দিন তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তৎপর দিন ২৩ শে শ্রাবণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মনসাপূজা প্রাতঃ-সময়াবধি পূর্ব্বাহ্নের কর্ত্তব্য হওয়াতে প্রাতঃস্নানান্তেই ৺ মনসাপূজা করেন এবং পূজান্তে মনসার পাঁচালী রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহা যুক্তি-সঙ্গতও বটে। যে যে দেবতার উদ্দেশে গ্রন্থ রচনা করিতে হয়, তাঁহার স্বপ্নাদেশ-অনুসারে তাঁহাকে পূজা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা ভক্ত কবির উপযুক্ত কার্য্য, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থারম্ভ-কাল-সংক্রান্ত ভণিতিতে অধিকাংশ পুস্তকেই এই রূপ লিখিত আছে;—

* * * * * *

সুলতান হোসেন সাহ পৃথিবীপালক।

পাঠান্তর।—(৪) 'স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্তের দূরে গেল নিদ।
হরি হরি নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ॥
প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশা।
স্নান করি বিজয়গুপ্ত পূজিল মনসা॥
হরি নারায়ণ ভাবি নির্ম্মল করে চিত।
রচিতে আরম্ভ করে মনসার গীত॥'

সমরে দুর্জ্জয় রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা, রূপে কাম-সম।
রাজার পালনে প্রজা সুখী সর্ব্বক্ষণ॥

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাসে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা হোসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"হোসেন সাহ কামৎপুরের (কোচবেহারের) রাজাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন এবং তাঁহার রাজধানী বিনষ্ট করেন। * * * হোসেন সাহ বিহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিলেন এবং দিল্লীশ্বর সেকেন্দর লোদী জোয়ানপুর অধিকার করিলে রাজ্যচ্যুত সুলতানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রজাপ্রিয়, তেমনই অপর লোকের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন।"

ইতিহাসের লিখিত বর্ণনার সহিত কবির বর্ণনাদৃষ্টে বোধ হয়, উভয়ে এক ব্যক্তির বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

৺ রাজকৃষ্ণ বাবুর ইতিহাসে লিখিত আছে, হোসেন সাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২১ অথবা ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ হইতে ১৪৪৩ অথবা ১৪৪৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪০৬ শককে গ্রন্থারম্ভের কাল বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত ভণিতির শেষার্দ্ধের "সুলতান হোসেন সাহ পৃথিবী-পালক" এই বাক্যের সহিত ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট সময়ের বিরোধ উপস্থিত হয়; কিন্তু গ্রন্থারম্ভ কাল ১৪১৬ শকাব্দ স্বীকার করিলে এ বিষয়ে ইতিহাসের সহিত ঐক্যমত রক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, ১৪০৬ শকাব্দ, গ্রন্থ-রচনারম্ভের কাল নির্দ্দিষ্ট হইলে অপর এক স্থানের সহিত একতা থাকে না; কিন্তু ১৪১৬ শকাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইলে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রক্ষিত হয়। এতদবস্থায় ১৪১৬ শকাব্দকে গ্রন্থারম্ভের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাই যুক্তিসঙ্গত।

গ্রন্থ-লিখিত ভণিতি ভিন্ন ইহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী দৃষ্টেও ইহা অতি প্রাচীন কালের রচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহা যে সময়ের রচিত, সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। তখন সাধারণ অলঙ্কার ও যৎসামান্য পরিচ্ছদই, বাঙ্গালা ভাষার সাজ-সজ্জার উপকরণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উজ্জ্বল মনোরম অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জায় তখন বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত না। বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালিতে 'করন্তি,' 'কহন্তি,' ইত্যাদি সংস্কৃতের অপভ্রংশ ক্রিয়াপদ এবং 'আখাল,' 'ঝাকার,' 'পো,' 'দিমু,' 'ভাকর,' 'কৈল,' 'ভাটাতুকা,' 'লড়' ইত্যাদি অসংখ্য দেশজ গ্রাম্যেতর ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটী অলঙ্কার যুক্ত-বাক্য উদ্ধৃত হইল;—

"যে কথা শুনিলে মুনি পাপবিমোচন।
রাহু ছাড়ি গেলে যথা চন্দ্রের কিরণ॥"

" শুকনা বনেতে যেন লাগিল অগিনি।
পলাইয়া যায় যত নাগ, ধরিয়া খায় অমনি ॥ "
" ব্রাহ্মণ দেখ্‌লে ধরে যেন কেঁদুয়ার বাঘ ॥ "
" হিন্দু সকল লাগ পাইলে, মারে বেড়া গুর।
শিয়াল ঝাপায় যেন খেকুয়া কুকুর ॥ "
" আঠুর তলে মাথা নিয়া মারি উভা কীল।
ঝড়ে যেন আকাশ হইতে পড়ে দারুণ শিল ॥ "
" সাক্ষাতে যমের সঙ্গে মনুষ্যের ঘাটা।
ফুটিলে সে বুঝা যায় জলের মধ্যে কাঁটা ॥ "
" জলন্ত অনল যেন শরীরের মূর্ত্তি।
পূর্ণ শশধর যেন হরিদ্রা আকৃতি ॥ "

উপরি-উদ্ধৃত অলঙ্কারযুক্ত বাক্যগুলি ও গ্রন্থের পরিভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় এরূপ স্থলে চৈতন্যদেবের ৯ বৎসর বয়সের সময় এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। চৈতন্য ২৫ বৎসর বয়সে (এই গ্রন্থারম্ভের ১৬ বৎসর পরে) ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে সংসার পরিত্যাগ করেন। বৃন্দাবন-দাস প্রভৃতি তাহারও পরে চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া চৈতন্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ, বিজয়গুপ্তের গ্রন্থারম্ভের বহুকাল পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ফলতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা ও রচনার পারিপাট্য ইহা অপেক্ষা যেরূপ সুমার্জ্জিত, তাহাতেই অনুমিত হইতেছে, এই গ্রন্থ বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত গ্রন্থসমূহের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিতবর ৬ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়কপ্রস্তাব নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা-ভেদে আদি, মধ্য ও ইদানীন্তন কাল এই তিনটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে বিজয়গুপ্ত মধ্য কালের প্রথম ভাগে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী; কিন্তু বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরামদাস ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ শব্দ-সম্পদ্ ছিল না। এই জন্যই এই গ্রন্থে অলঙ্কার ও রচনা-পারিপাট্যের ত্রুটি দৃষ্ট হয়। এই সময়ে পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটী ছন্দঃমাত্রই পদ্যে ব্যবহৃত হইত। বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালীতেও পয়ার ত্রিপদী ভিন্ন অন্য কোন ছন্দ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালী গীতি-কাব্য; এজন্য সঙ্গীতের সুশ্রাব্যতার অনুরোধে তিনি যে স্থানে আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, সেই স্থানেই যতি স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে কোন কোন স্থলে অক্ষর

সংখ্যা অধিক হইয়াছে; কোথাও কম হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ণের মিলন বিষয়েও তিনি তত মনোযোগী ছিলেন না।

ক	খ
গ	ঘ
চ	ছ
ত	থ
ব	ভ
গ	ত
শ	ক

ইত্যাদি যে যে বর্ণের উচ্চারণ-বিষয়ে যৎসামান্য সাদৃশ্য আছে, তাহাদেরই পরস্পর মিল রাখিয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থের ভাষা, শব্দ-প্রয়োগ, রচনার পারিপাট্য ও ছন্দোব্যবহার ইত্যাদি. তখনকার সময়োপযোগীই হইয়াছিল।

বিজয়গুপ্তের পাঁচালীতে এমন কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ নাই, যাহা ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের পরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস লইয়া কবি স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সে সমুদায়ই ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে সঙ্ঘটিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(১) অতিশয় নিপুণতার সহিত কবি, ব্রহ্মদেশীয় মগ, ভোগবিলাসী মুসলমান ও হিমালয় পর্ব্বতস্থ বাণপ্রস্থাশ্রমগত মুনিদিগের আচার ব্যবহার বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাতির কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও বহুস্থানে ফিরিঙ্গি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি বঙ্গদেশে আইসেন নাই এবং তাঁহারা এতদ্দেশে তাদৃশ বিখ্যাতও ছিলেন না।

(২) গ্রন্থে দেব-দেবী-বন্দনাতে কবি অনেক দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও প্রসঙ্গত ক্রমে চৈতন্য-দেবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিত তৎকালে সাধারণ্যে এত আলোচ্য বিষয় ছিল যে, কবি চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হইলেও তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যের কোন প্রকার উল্লেখ না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। শ্রীচৈতন্য ১৪৩২ শকে গৃহ ত্যাগ করেন। ১৪৩২ শকের পূর্ব্বে তিনি সাধারণ্যে বিখ্যাত ছিলেন না।

(৩) কবি, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হিন্দু দেবদেবীর উপর অত্যাচারকাহিনীর যে রূপ জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কবি বিজয়গুপ্ত, সুলতান

মাহ্মুদ ও মহম্মদ ঘোরীর অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৪) এই গ্রন্থে খোজা ও ক্রীতদাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"এক শত খোজা দিল সঙ্গতি করিয়া।"

৺ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালা ইতিহাসে লিখিত আছে;—

"নাসিরুদ্দীনের পুত্র বর্ব্বকসা রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবসী (আবিসিনীয়) ক্রীতদাস নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে এমন পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় প্রভুকে বধ করিয়া উহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালার অধিপতি হন।"

ইহা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বোধ হয় কবি এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-অবলম্বনেই উল্লিখিত কবিতাটী রচনা করিয়া থাকিবেন।

উপরি উদ্ধৃত চারিটী ঐতিহাসিক বিবরণ মধ্যে ১ম ও ২য়টী ১৪১৬ শকাব্দের পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত বিখ্যাত হইলেও গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ কিছুই লিখিত হয় নাই। ৩য় ও ৪র্থটী ১৪১৬ শকাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ঘটিয়াছিল, গ্রন্থে তাহাদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ১৪১৬ শকাব্দকে গ্রন্থ-রচনার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বিরোধ হয় না।

গ্রন্থ কোন্ সময়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও ভণিতি গ্রন্থের কোথাও দৃষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। বিজয়গুপ্তের পরিচয়।

গ্রন্থকর্ত্তা বিজয়গুপ্ত বৈদ্যকুলে জন্মিয়াছিলেন। যে স্থানেই তিনি স্বীয় নামের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রায়শঃ সেই স্থানেই নামের পূর্ব্বভাগে "বৈদ্য" শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। যথা;—

১। "বৈদ্য বিজয়গুপ্তে গায় মনসার গীত।"

২। "বৈদ্য বিজয়গুপ্তে কয়, হৈল ভাবের উদয়।"

৩। "বৈদ্য বিজয়গুপ্তে কহে সুরস পাঁচালী।"

৪। "বৈদ্য বিজয়গুপ্তে পূজে মনসার পায়।"

ইত্যাদি প্রকারের ভণিতি প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাঁহার উপাধি "সেন গুপ্ত" ছিল; এক স্থানের ভণিতি দেখুন;—

"মনসার শ্রীচরণ, শিরে করি আভরণ,—
বৈদ্য বিজয়গুপ্ত সেনে ভাবে।"

বোধ হয় "গুপ্ত" উপাধিটী বৈদ্য সাধারণের ব্যবহার্য্য বলিয়া উপাধিবোধক শব্দের পূর্ব্বেও "সেন" উপাধিটী কবির বিশেষ উপাধি বলিয়া উহা পশ্চাৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আপন জন্মস্থান সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন ;—

"মুলুক ফতেয়াবাদ উত্তম ভুবন ॥
পশ্চিমে কুমার নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যেতে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত-নগর ॥
চারি বেদ পাঠ করে যতেক ব্রাহ্মণ।
অন্য জাতি যত আছে নিজ বিদ্যমান।
দেখিতে সুন্দর অতি অমর সমান ॥
যাহার প্রসাদে গীত করিহে রচন।
লোকেতে বাখানে তারে বারাণসী স্থান ॥
স্থান-গুণে যেবা জন্মে সব গুণময়।
ফুল্লশ্রী গ্রামেতে বাস করিছে বিজয় ॥"

অন্য এক স্থানে আছে ;—

"ফুল্লশ্রী গ্রামেতে ঘর,　বিজয়গুপ্ত কবিবর,
পদ্মাবতীর ঘুচিল বিষাদ (১)।"

বাস্তবিক বিজয়গুপ্তের জন্মস্থান বলিয়া ফুল্লশ্রী গ্রাম অদ্যাপি জনসমাজে বিশেষ বিখ্যাত আছে। উহা বাখরগঞ্জ (বরিশাল) জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। বিজয়গুপ্তের জন্মস্থান বলিয়া উক্ত গ্রাম সাধারণের নিকট তীর্থ স্থানের ন্যায় সম্মানিত ও বিখ্যাত। উক্ত গ্রামে একটী বৃহৎ বাটী অদ্যাপি 'বিজয়গুপ্তের বাটী' বলিয়া সর্ব্ব-সাধারণের বিদিত। তথায় প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে সুশোভিত বহু বিস্তীর্ণ একটী প্রাচীন সরোবর আছে। সরোবরের পূর্ব্বতীরে একখানি মনসাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ঐ দেবী, বিজয়গুপ্তের আরাধ্যা ও তৎকর্ত্তৃক সংস্থাপিতা বলিয়া অদ্যাপি বিখ্যাত। চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুপ্তের কীর্ত্তির কিছু মাত্র হানি হয় নাই। অদ্যাপি বিজয়গুপ্তের স্থাপিতা মনসাদেবী প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। দূর-দেশ হইতে অসংখ্য নরনারী নানাবিধ রোগমুক্তি অথবা অন্যপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিজন্য এই গ্রামে এই মনসাদেবীর পূজার্থ সমাগত হইয়া থাকেন। পর্ব্বোপলক্ষে এই বাটীতে বহুলোকের সমাগম হয়, এবং তখন সময়ে সময়ে সরোবরের অপর পার্শ্বত্রয়ে মেলা হইয়া থাকে। অদ্যাপি বাখরগঞ্জ জেলার অধিকাংশ স্থানে, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে শ্রাবণ মাসে ও অন্যান্য সময়ে মনসা পূজা-উপলক্ষে তান লয়-বিশুদ্ধ স্বরে বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালি গীত হইয়া থাকে। ইহা কবির অল্প গৌরবের বিষয় নয়। বিজয়গুপ্তের ভাষাতেও তাঁহাকে বাখরগঞ্জ-নিবাসী

(১) নাচাড়ি রচিল কুতুহলে। পাঠান্তর।

বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গের অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, অথচ পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহৃত কোন শব্দই দৃষ্ট হয় না। যে সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই পূর্ব্ববঙ্গের চলিত ভাষা হইতে গৃহীত।

১। আস্খাল।	৫। ঝ্যাকার।	৯। লড়।	১৩। চাবায়।
২। বাধার্ত্ত।	৬। শুক্না।	১০। খোরল।	১৪। মুইট।
৩। উম।	৭। কৈল।	১১। লাও।	১৫। যুকিয়া।
৪। দর।	৮। দিমু।	১২। বাসুম।	১৬। ডাকর।

'ভেরুয়া' ইত্যাদি শব্দ কেবল পূর্ব্ববঙ্গের কথোপকথনের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। আবার কতকগুলি শব্দ কেবল বাখরগঞ্জ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশেই শুনা যায়।

১। লাছিয়া।	। চেওয়ায়
২। ছামনি করে।	৫। বাহুয়া।
৩। উছন।	৬। ইয়ত।

এই শব্দগুলি এবং নিম্নলিখিত বাক্যসমুদয় যথা,—

৭। আর কাঁদ কিয়া।	৯। তুই কেন আসিলাহে যুদ্ধ করিবারে।
৮। মৈরা যাও তুই।	১০। পায় খাড়ু দিয়া রাখ্মু না করামু বিয়া।

ইত্যাদি শব্দ ও ভাষা বাখরগঞ্জ ও তৎ-সন্নিহিত প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। ইহাতেও বুঝা যায়, বিজয়গুপ্তের বাসস্থান বাখরগঞ্জ জেলাতেই ছিল। কবিবর বিজয়গুপ্ত, জন্মভূমির এত অনুগত সন্তান ছিলেন যে, তিনি আপন অজ্ঞাতসারে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য দ্রব্যেও স্বকীয় জন্মভূমির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের বাসস্থান বর্দ্ধমান* জেলার অন্তর্গত চম্পক নগরে ছিল। তথা হইতে তিনি যে সকল জিনিস বিক্রয়ার্থ সুদূর সাগর অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তাহা বর্দ্ধমানাঞ্চলে অতি অল্পই উৎপন্ন হয়; কিন্তু বাখরগঞ্জের উর্ব্বরা ভূমিতে তাহা বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নারিকেল, গুয়া, কলই, চিকণ চাউল, কাউন, মুগ, ছোলং ('লেবু-বিশেষ) এই সকল দ্রব্য বাখরগঞ্জ অঞ্চলে যেরূপ জন্মে, অপর কুত্রাপি সেরূপ জন্মে না। কবি স্বদেশানুরাগ ভরে কল্পনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অজ্ঞাতসারে স্বদেশের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে; ফলতঃ স্বদেশে আপন জন্মভূমিতে আসিয়া ভিন্ন দেশীয় ভাষা ব্যবহার করা যেমন অনেক সময় বিসদৃশ হইয়া থাকে, ভিন্ন দেশের প্রকৃতি বর্ণন সময়ে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদি, স্বদেশানুরাগী, বিশেষতঃ স্বদেশবাসী কবির মনে স্বতঃই জাগরিত হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটী স্থিরীকৃত হইল।

* ৺রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের" ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বিজয়গুপ্ত ১৪১৬ শকে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।
(২) তিনি বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার উপাধি "সেন গুপ্ত" ছিল।
(৩) তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে বাস করিতেন।

আমরা বহু সন্ধানেও তাঁহার বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ বিষয় পুথিতেও কিছু লিখিত হয় নাই। ফুল্লশ্রী গ্রামে গিয়া তাঁহার বংশানুচরিত ও অন্যান্য অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। আমরা ফুল্লশ্রী গ্রামে যাইয়া বিজয়গুপ্তের বংশ ও অন্যান্য বিবরণ অনুসন্ধান করিবার সংকল্প করিয়াছি।

প্রাচীন পুথি সঙ্কলন কার্য্যে মূল পাঠ উদ্ধার অতীব কষ্টকর হইলেও উহা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা ১০।১২ খান পুথি দেখিয়া উহার মূল পাঠ উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে কয়টী প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল। বিস্তার ভয়ে এই প্রবন্ধে গ্রন্থ হইতে অধিক স্থল উদ্ধৃত করা যায় নাই। গ্রন্থ রচনা কালে ভাষা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শনার্থ উদ্ধৃত কবিতাগুলির কোন স্থলের ভাষাগত সংশোধন আবশ্যক বোধ করি নাই।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ।

—•—

(১৩০৩ সালের ২৯ এ ভাদ্র পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

প্রকৃতি যাঁহাদিগকে প্রতিভার শক্তিতে শক্তিমান্ করেন, জগতের সহস্র বিপদ্ বাধা তাঁহাদের পথ রোধ করিতে পারে না। প্রতিভাবান্ অবলীলায় কালসমুদ্রের সৈকতে পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সমকালবর্ত্তী মানব স্তিমিতনেত্রে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হয়; অধস্তন জনগণ তাঁহাদিগকে দেবানুগৃহীত মনে করিয়া দূর হইতে প্রণাম করে। সুদূর অতীত হইতে বঙ্গভূমি এইরূপ অসংখ্য প্রতিভাবান্ মহাপুরুষের জন্মে ধন্য। অন্য সম্পদ্ থাকুক্ না থাকুক্, বঙ্গের কাব্যসম্পদ্ অতুলনীয়। বঙ্গভূমি কবিজননী, ইহার প্রতি প্রদেশ প্রতি পরগণা প্রতিভাবান্ কবির আবির্ভাবে পবিত্র। বঙ্গে এমন কোন উচ্চবর্ণের গৃহস্থ নাই, যাঁহার গৃহে অনুসন্ধান করিলে কাষ্ঠ-ফলকাবদ্ধ দুই চারি খানি প্রাচীন গীতকাব্য পাওয়া না যায়। কত পুণ্য প্রীতির কথা,

কত ভক্তি দয়া বাৎসল্যের কথা, কত আত্মত্যাগ বৈরাগ্য কর্ম্মফলের কথা, মধুর কোমল গীত কবিতাকারে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার একই কথা একই গ্রন্থ, যে কত জনে কতরূপে রচনা করিয়াছেন, তাহাও নির্ণয় করা সহজ নহে। এক রামায়ণ মহাভারতের আট দশ থানি পৃথক্ রচনার সংবাদ জানা গিয়াছে। এক কাশীখণ্ডের ৪।৫ থানি, এক মনসার উপাখ্যানের ২৬।২৭ থানি পৃথক্ রচনার কথা শিক্ষিত সমাজের কর্ণগোচর হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গবাসীর এক থানি প্রধান গ্রন্থের কথা আজিও সুগুপ্ত রহিয়াছে। সেথানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

চণ্ডী বঙ্গবাসী হিন্দুর পরম আদরের ধন। এক হিসাবে চণ্ডীকে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম দুর্গোৎসবে চণ্ডী, বাঙ্গালীর শান্তিস্বস্ত্যয়নে চণ্ডী, বাঙ্গালীর গৃহে চণ্ডী, মণ্ডপে চণ্ডী। চণ্ডী ব্যতীত দুর্গাপূজা হয় না, চণ্ডীপাঠ ব্যতীত অমঙ্গল দূর হয় না, ভক্ত শাক্ত চণ্ডীপাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। গৃহে চণ্ডী থাকিলে অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, দৈব বা ভৌতিক উপদ্রব হইতে পারে না বলিয়া বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যখন বিবিধ স্বরসংযোগে ভক্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে থাকেন, তখন যেন সত্য সত্যই মহর্ষি মেধসের সেই পুষ্পিত শান্ত তপোবন আবির্ভূত হয়, আর যেন দানবদলনী মহামায়া সিংহাসনে আসীন হইয়া ভক্তকে বরাভয় দিতে থাকেন। ভক্তপূজক কবির অমৃত কবিতায় অন্তরের শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া পরম শান্তিলাভ করেন। সংসারের শত যাতনায় জর্জ্জরিত, সহস্র বিপদে অবসন্ন, শত শক্রবেষ্টিত মানব চণ্ডীপাঠে অসুরনাশিনীর অভয় হস্ত দেখিয়া আশ্বস্ত হয়। বিষয়াসক্ত মায়াবদ্ধ জীব চণ্ডীপাঠে বিশ্বপ্রহেলিকা অবগত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে। বাঙ্গালীর জীবনে, বাঙ্গালার সংসারে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে চণ্ডীর প্রভাব বড় বেশী।

জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ এই দেবীমাহাত্ম্য বাঙ্গালা গীত-কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। ভবানীপ্রসাদ নিজে শক্তিভক্ত ছিলেন। একে জন্মান্ধ, তাহাতে শিশুকালেই মাতৃপিতৃহীন হইয়া ভবানীপ্রসাদ দুঃখদারিদ্র্যের অগাধসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। ইহার উপর আবার জ্ঞাতিবর্গের অত্যাচার! দুঃখে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া দেবীর নিকট আত্মবিবরণ জানাইবার মানসে কবি দুর্গার মাহাত্ম্য গীতে কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। দুর্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া কবি প্রচলিত রীতি অনুসারে গ্রন্থের 'দুর্গামঙ্গল' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার আদিম অবস্থার গীত কাব্যমাত্রেই কোন না কোন দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উদ্দেশ্যে রচিত। যে গ্রন্থে যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দেবতার নামের পর 'মঙ্গল' শব্দ যোজনা করিয়া কাব্যকর্ত্তা গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের শ্রেণীবিভাগে এই সকল গীতকাব্য মঙ্গলাখ্য বলিয়া এক শ্রেণী ধরা যাইতে পারে। রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ভারতমঙ্গল প্রভৃতি নাম দেখিয়াই বোধ হয়, ভবানীপ্রসাদ চণ্ডীর অনুবাদের নাম চণ্ডী না রাখিয়া 'দুর্গামঙ্গল' রাখিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী আটীয়া পরগণার কাঁটালিয়া গ্রামে ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয়। ভবানীপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য, উপাধি 'কর'। কিন্তু 'রায়' খ্যাতি দ্বারাই এই করবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে দেশে পরিচিত। সম্ভবতঃ এই রায় খ্যাতি ইঁহারা আটিয়ার সদাশয় জমিদারদিগের নিকট হইতে পাইয়া থাকিবেন। বহু দিন হইতেই আটীয়ার পাঠান জমিদারগণ উদারতা, দানশীলতা, ও হিন্দুপ্রীতির জন্য বিখ্যাত। ইঁহাদের দান ও হিন্দুপ্রীতির কথা শুনিলে এই হিন্দু মুসলমানের বিরোধের দিনে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহারা পরগণার প্রায় ছয় আনা অংশ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর ও মহত্রাণ রূপে হিন্দুদিগকে নিষ্কর দিয়াছেন। জ্ঞানী গুণী ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে ইঁহারা যথোচিত যত্ন করিয়া আপন অধিকারে বাস করাইতেন। মুসলমান হইয়াও ইঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। হিন্দু ভিন্ন প্রায় প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন না। এই জন্য আটিয়ায় বহু গুণী ও জ্ঞানীর উৎপত্তি হইয়াছিল। কেবল কৃষ্ণ বসু, রূপনারায়ণ ঘোষ, দ্বিজ সৃষ্টিধর প্রভৃতি বহু কবি এই জমিদারদিগের উৎসাহেই আপন আপন প্রতিভার বিকাশ করিয়াছিলেন। ভবানীপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই জমিদারদিগের দ্বারাই সৎকৃত হইয়া কাঁটালিয়ায় বাস করেন।

ভবানীপ্রসাদের পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি শিশুকালেই মাতাপিতা বিহীন হইয়াছিলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি আজন্ম অন্ধ, শৈশবে পিতৃমাতৃহীন এবং দারুণ দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়াও মুখে মুখে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। ভবানীপ্রসাদ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিবর্গের অত্যাচারে ও অন্ধতায় তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দুর্গামঙ্গলে তিনি আপনার সে দুরবস্থার কথা ভবানীর নিকট জানাইয়াছিলেন, সে কাহিনী পাঠ করিলে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। আমরা তাহার দুই একস্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ।
জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত।
মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান।
জ্ঞাতি ভ্রাতা আছে আমার নামে কাশীনাথ।
তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ।
জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত্ত।
তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত॥

কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত।
পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত॥
বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ।
পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ॥
দীর্ঘটানে সদা তেঁহ থাকেন মগন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥
তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা।
খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা॥
এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥
দুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥
আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়।
শরণ লৈয়াছি মাত তব রাঙ্গা পায়॥

অন্যত্র—ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল॥
কাঁটালিয়া গ্রামে কর বংশে উৎপত্তি।
নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥
কেবল ভরসা কালী চরণ তোমার।
বন্ধুহীন হইয়াছি করহ উদ্ধার॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিলাম আমি অন্য নাহি জানি।"

নিঃসংশয়িতভাবে ভবানীপ্রসাদের জন্মকালনির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থশেষে তিনি গ্রন্থরচনার যে কালজ্ঞাপক পয়ার লিখিয়াছেন, তাহা হইতে ১০৭১ অব্দ পাওয়া যায়। ভবানীপ্রসাদ ৩০ বৎসরের সময় দুর্গামঙ্গল রচনা করিয়াছেন, বলিয়া ধরিলে তাহার জন্ম ১০৪১ সনে হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভবানীপ্রসাদকে মোটামুটী ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

ভবানীপ্রসাদের ভাষা বড় সরল, ভক্তিপ্রবণ ও দীনতাব্যঞ্জক। তিনি কবিত্ব প্রকাশের জন্য কিম্বা প্রশংসা বা পুরস্কার পাইবার কবি নহেন। অন্ধতা হেতু দেবীর অর্চ্চনা করিতে না পারিয়া তদুপরি বিবিধ সাংসারিক কষ্টভোগ করিয়া জীবন দুর্ব্বহ

হওয়াতে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছেন। গ্রন্থের সকল স্থলেই তিনি মূলের অনুবাদ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"শ্লোক ভাঙ্গিয়া লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয়।"

আপনার অন্ধতা ও নিরক্ষরতার জন্য সর্ব্বত্রই ভবানীপ্রসাদ দীনতা ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন—

"জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে।
ভবানীর পাদপদ্ম করি একান্তিক।
বুদ্ধি অনুসারে করিলাম * *
মোর দোষ গুণ সবে না করিবা মনে।
প্রণতি করিয়ে আমি সবার চরণে॥"

কিন্তু তিনি সেই প্রাচীন সময়ে অন্ধ হইয়াও যাহা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে চক্ষুষ্মানের পক্ষেও তাহা অতীব শ্লাঘার বিষয়। জন্মান্ধ তিনি, কিরূপে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

ভবানীপ্রসাদ সকল স্থলে শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ না করিলেও অধিকাংশ স্থলেই ভাবগ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে একবারে অক্ষরে অক্ষরে সুন্দর সরল অনুবাদ হইয়াছে।

দুর্গামঙ্গলে কি কি বিষয় বর্ণিত হইবে, গ্রন্থারম্ভে কবি পয়ারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যেরূপে হইল পূজা অকালে আশ্বিনে।
মন দিয়া সেহি কথা শুন সর্ব্বজনে॥
যে মতে আসিলা দেবী বাপের নিবাস।
ই তিন ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ॥
সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভবিনাশ।
মৈষাসুর বধ দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ॥
রক্তবীজবধ শুম্ভ নিশুম্ভনিধন।
দেবতার স্তুতি বাণী সুরথমোক্ষণ॥
যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দশভুজা রূপে পূজা করিলা চণ্ডীরে॥
নিদ্রা হৈতে ভগবতীকে চৈতন্য করিয়া।
লঙ্কাজয়ী হৈল রাম তোমাকে সেবিয়া॥

গিরিপুরী হৈতে দেবী চলিলা কৈলাস।
যেরূপে রহিলা দেবী শিবের নিবাস॥
ই সব মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রকাশ।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে—"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ" হইতে গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্গামঙ্গলে তাঁহা করা হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থারম্ভে এক সুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া অগস্ত্যমুখে রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সে উপাখ্যান এই—

সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় যাইবার নিমিত্ত বানরেরা গাছপাথরে সাগরসেতু বন্ধনের চেষ্টা করিতেছে। গাছ পাথর যার যত সাধ্য আনিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সাগর বাঁধা হইতেছে না। অনুপায় দেখিয়া বানরগণ রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিবরণ জানাইল। সীতার উদ্ধার হইলনা বলিয়া রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে দেশে যাইবার জন্য বিদায় দিলেন। নিজে সীতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন স্থির করিলেন। রামচন্দ্রকে এই রূপ বিষণ্ণ ও হতাশ দেখিয়া মন্ত্রী জাম্বুবান্ কহিলেন—

"এহি মতে বিষাদিত হইলা শ্রীরাম।
হেন কালে আগু হৈয়া কহে জাম্বুবান্॥
কি কারণে চিন্তা কর রাম নৃপবর।
স্মরণ করহ গোসাঁই অগস্ত্য মুনিবর॥
মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য মহামুনি।
শিশু কাল হৈতে তার গুণের বাখানি॥
কুম্ভেতে জনমাইল বনের * *
এহিত সমুদ্র মুনি গণ্ডুষে কৈল পান॥
তুমি প্রভু নারায়ণ বিষ্ণু অবতার।
স্মরণে নিকটে মুনি আসিবে তোমার॥"

জাম্বুবানের উপদেশে রাম অগস্ত্যমুনিকে স্মরণ করিলেন, স্মরণ মাত্রে অগস্ত্য রামের নিকট যাত্রা করিলেন।

"শিরেতে পিঙ্গল জটা লম্বমান দাড়ি।
পরিধান কৃত্তিবাস চর্ম্ম কড় মড়ি॥
দীর্ঘ নখ দীর্ঘ গোঁফ দেখিতে সুন্দর।
তেজঃপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় যেন দিবাকর॥
রুদ্রাক্ষভূষিত অঙ্গ মন্দ মন্দ হাস।
হৃদয়ে জপিছে, মুনি সদা কৃত্তিবাস॥

সূর্য্য যেন ভ্রমিয়া যাইছে শূন্য পথে।
হেন মতে যাইছে মুনি রামের সাক্ষাতে॥"

অগস্ত্য উপস্থিত হইলে রাম, পঞ্চবটী বাস হইতে সেতুবন্ধন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত মুনির নিকট বলিয়া তাঁহাকে সমুদ্র পান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অগস্ত্য পান করিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন—

"পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়।
অপরাধ বিনে কিছু পুণ্য লোপ হয়॥
তুমি প্রভু নারায়ণ বিষ্ণু অবতার।
অল্প তপস্যায় সিদ্ধি হইবে তোমার॥
পরাৎপর পরব্রহ্ম দেবী মহামায়া।
ভজ ভজ ভবানীপদ একান্তিক হৈয়া॥
করিলে অম্বিকাপূজা সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
হেলায় বান্ধিবা সেতু হবে লঙ্কাজয়॥"

অগস্ত্য রামকে মহামায়ার পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্র অগস্ত্যকে পূজার বিধি ও দেবীর মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্রের প্রার্থনায় অগস্ত্য সবিস্তর মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কবি ভবানীপ্রসাদ এই রূপ উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া অগস্ত্যমুখে রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত মার্কণ্ডের চণ্ডী কীর্ত্তন করাইয়াছেন। মার্কণ্ডেয়চণ্ডী-বর্ণিত বিষয় ব্যতীত গৌরীর হিমালয় আগমন নামক একটী অধ্যায় ইহাতে অধিক আছে।

কবির রচনা সম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো"—ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ—

চণ্ডির চরণে করি শত নমস্কার।
কহিছে মার্কণ্ড মুনি করিয়া বিস্তার॥
সাবর্ণিক নামে হৈল সূর্য্যের তনয়।
হইল অষ্টম মনু সেহি মহাশয়॥
শুন শুন মুনিগণ উৎপত্তি তাহার।
কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার॥
সাবর্ণিক নামে মনু রবির তনয়।
মহামায়া প্রাদুর্ভাবে মনু সেহি হয়॥
চৈত্রবংশসমুদ্ভূত সুরথ রাজন।
সকল পৃথিবীপতি মহা পরাক্রম॥

কুলে শীলে দান ধর্ম্মে অতি অনুপম।
পুত্রের সমান রাজা পালে প্রজাগণ॥
মহাসুখে আছে রাজা পুরে আপনার।
পরদলে নিয়া গেল রাজ্য অধিকার॥
দৈবের নির্বন্ধ কথা কি কহিব আর।
অমাত্য সকলে চাহে রাজা মারিবার॥
কিমতে রাখিব প্রাণ ভাবেন রাজন।
ঘোটকে চড়িয়া যায় গহন কানন॥
একা একি অশ্বচড়ি চলি গেলা বন।
প্রবেশ করিলা রাজা গহন কানন॥
দুঃখিত হইয়া রাজা ফিরে বনে বন।
স্ত্রী পুত্র কারণে প্রাণ কান্দে অনুক্ষণ॥
অমাত্য সকলে রাজাকে দিছে খেদাইয়া।
তা সবার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া॥
তা সবার লাগি সদা অস্থির রাজন।
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হৈল দরশন॥
বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করে সুরথ রাজন।
আদি হৈতে কহে বৈশ্য আত্মবিবরণ॥
তাহা শুনি অসম্ভব হৈল নৃপবর।
আপনার দুঃখ কহে বৈশ্যের গোচর॥
যেমত দুঃখের দুঃখী সুরথ রাজন।
সেহি মত দুঃখ কহে বৈশ্যের নন্দন॥
যার যার দুঃখ যত কহে দুই জনে।
দোঁহের মিলন হৈল সেহি ঘোর বনে॥
রাজা বলে শুন বৈশ্য বচন আমার।
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়ে সদা * *॥
বৈশ্য বলে মহারাজ করি নিবেদন।
আমার কান্দিছে প্রাণ স্ত্রীপুত্রকারণ॥
ভাই বন্ধু সবে মোরে দিছে খেদাইয়া।
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নাহি পাই।
দুই জনে উঠি গেলা মেধসের ঠাঁই॥

ফলে ফুলে শোভিয়াছে মুনির কানন।
পৃথিবীর যত সুখ আছে সেহি বন॥
ধ্যানযোগে মহামুনি আছেন তথায়।
নৃপতি যাইয়া প্রণমিলা তার পায়।
মুনি বলে কহ তুমি সুরথ রাজন। ১০
একেলা হইয়া কেন অসিয়াছ বন॥
রাজা বোলে মুনিবর কি কহিব আমি।
পর দলে নিল রাজ্য শুন মহামুনি॥
মৃগয়ার ছলে আমি পলায়া আসি বনে।
রাজ্য ছাড়ি পলালাম ভয় পাইয়া মনে।
অমাত্য সকলে মোরে দিছে খেদাইয়া॥
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী আছে কোন স্থানে।
ঐরাবত হস্তীর ঘাস দিবে কোন জনে॥
কোথা বা রহিল মোর উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
স্বপুত্র সহিত তারা কি মতে আছয়॥
আমার অনুগত ছিল　যত সহচরী।
কি মতে আছয়ে তারা আমা পরিহরি॥
এহি মতে প্রাণ মোর পীড়ে অনুক্ষণ।
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হৈল দরশন॥
যেহি দুঃখে বনে বনে ফিরি একেশ্বর।
সে সবদুঃখের দুঃখী এহি বৈশ্যবর॥
করিয়া অধর্ম্ম যেহি জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
রাজ্য ধন নিল কাড়ি আসিলাম বন॥
তা সবার লাগি প্রাণ কান্দে কি কারণ।
বুঝিতে না পারি মুনি এই বিবরণ॥
যদি কৃপা কর মোরে মুনি　*　*
ইহার বৃত্তান্ত কহ আমার গোচর॥”

যাঁহারা চণ্ডী না পড়িয়া বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ পড়িয়াছেন, তাঁহারাও “নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ” জানেন। চণ্ডীর সেই লোকপ্রসিদ্ধ শক্তি-স্তোত্রের অনুবাদ এই—

“যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥

যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥ ইত্যাদি।

দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড দেবীকে হিমালয়ে দেখিয়া আসিয়া রাজাকে বলিতেছে—

"রাজার চরণে যাইয়া করি নমস্কার।
যোড় হাতে দুই দৈত্য লাগে কহিবার॥
পৃথিবী বেড়ায়া আমি গেনু হিমাচলে।
কন্যারত্নে দেখিলাম পর্ব্বত উপরে॥
এমত সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাই।
জিজ্ঞাসা করিলে কহে আর কেহ নাঞি॥
সেহি কন্যা যদি তুমি পার আনিবার।
সর্ব্বরত্ন পূর্ণ হয় ভাণ্ডার তোমার॥
পারিজাতপুষ্প আছে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ঐরাবত হস্তী আছে তোমার আলয়॥
পৃথিবীতে যত রত্ন আছে সমুচিত।
কন্যারত্ন হৈলে হয় সকল পূর্ণিত॥"

শুম্ভ দূতমুখে দেবীর রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য সুগ্রীব নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন। সুগ্রীব দেবীর নিকটে যাইয়া কহিল—

"পাঠাইয়া দিল শুম্ভ তোমার গোচর।
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই সহোদর॥
বাহুবলে জিনিলেক অমরা নগর।
চন্দ্র সূর্য্য সকলের নিল অধিকার॥
যজ্ঞ ভাগ কাড়ি নিল যত দেবতার।
মণি মাণিক্য আছে ভাণ্ডারে তাহার॥
পারিজাত পুষ্প আছে কি কহিব আর।
এতেক সম্পদ্ আছে রাজার ভাণ্ডার॥

চলহ আপনে যাই তাহার ভুবন।
পরিণীতা হও যায়া তাহার সদন॥
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর সেহি দুই মহাশয়।
ভজহ তাহারে ইচ্ছা যাকে মনে লয়॥"

সুগ্রীবের কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন—

"দেবী বোলে আরে দূত শুন সমাচার।
আমার মনের ইচ্ছা তাকে ভজিবার॥
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভ দুইজন।
আমিহ যেমন নারী তাহারা তেমন।
কিন্তু শিশুকালে আছে প্রতিজ্ঞা আমারে।
যুদ্ধ করি যেই জন হারাইবে মোরে॥
প্রতিবল যেহি জন হইবে আমার।
তবে সেহি জন স্থানে হইব স্বয়ংবর॥
সংগ্রাম করিয়া যেহি করিবে পরাজয়।
সেহি জন আমার পতি হইবে নিশ্চয়॥
তুমি যাইয়া এহি কথা কহিবা রাজারে।
করুক আমারে বিভা করিয়া সমরে॥

দেবস্তুতি।

"মুনি বোলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
যেমতে করিলা স্তব যত দেবগণ॥
অসুর করিলা হত দেবী ভগবতী।
একত্র হইয়া সব দেবে করে স্তুতি॥
হরের প্রসঙ্গে হবে জগত ঈশ্বরী।
যার পাদপদ্ম হৃদে ধরে ত্রিপুরারী॥
চরাচর গতি তুমি জগত আধার।
প্রসন্ন হইয়া কর জগত নিস্তার॥
সকলের বল বীর্য্য অনন্তরূপিণী।
বিশ্ববীজ রূপে তুমি মায়াপ্রকাশিনী॥
সকল সংসার মোহে তোমার মায়ায়।
সংসারে প্রসন্না দেবী হও মহামায়।

তোমার মায়ায় মোহ প্রাণী যত ইতি।
সকল বিদ্যার মূল তুমি ভগবতী॥
ভেদাভেদরূপে তুমি আনন্দরূপিণী।
তুমি পরে সংসারেতে অন্য নাহি জানি॥
তোমা না চিনিয়া লোক অন্য পথে ধায়।
এ সব তোমার মায়া বুঝন না যায়॥
তুমি বিনা পৃথিবীতে কিছু সত্য নয়।
অনিত্য সংসার সব নিত্য কেহ নয়॥
বুদ্ধি রূপে সকল জীবের হৃদে বাস।
স্বর্গ অপবর্গ আদি তোমাতে বিলাস॥
সুখ মোক্ষ গণে জীব ইচ্ছায় তোমার।
নারায়ণি! তোমার চরণে নমস্কার॥
নিমিষ পলেতে হয় মুহূর্ত্ত প্রমাণ।
কলা কাষ্ঠা আদি হয় * *
ই সবার মূল তুমি পরিণাম আর॥
ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব ইচ্ছায় তোমার।
বিশ্বের পরম শক্তি আনন্দরূপিণী।
প্রণাম করি যে পদে তুমি নারায়ণি।"

ইত্যাদি।

শ্রীরসিক চন্দ্র বসু।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।

(সমালোচনা* ।)

——:——

মানব কল্পনায় ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, স্নেহ ও দয়ার আদর্শ চরিত্র যদপেক্ষা উচ্চতর, গভীরতর, মহত্তর হইতে পারে না, কবি-কল্পনার সেই চরম সৃষ্টি, বিষ্ণুর অবতার, শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলিয়াছিলেন, "ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাস্মভ্যং ন রোচতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ভগবানের মুখনিঃসৃত এই মহাবাক্য যে দেশের নরনারীকুল হাড়ে হাড়ে বুঝে, যে দেশের দেবারাধনায় 'মা' অথবা 'মাতঃ' শব্দটী বীজমন্ত্রের স্বরূপ, আজ সে দেশের এতই দুর্ভাগ্য, সে দেশের লোক এতই অধঃপতিত, এতই পাপে নিমগ্ন, এমনই মোহান্ধ, এমনই জ্ঞান হারা, যে তাহাদিগকে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ, নানা শাস্ত্রের আদেশ দ্বারা সাতকড়ি বাবুকে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছে যে, 'মাতৃভক্তি এবং মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।' বিষয়টী যেমন কোমল ও মধুর, লেখক ও সেইরূপ ললিত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "মা" শব্দ স্বয়ং উদ্ভূত; ভূমিষ্ট হইয়াই শিশু মা শব্দ উচ্চারণ করিয়া রোদন করে, জিহ্বার জড়তা প্রযুক্ত তখন তাহা সুস্পষ্ট হয় না। বাস্তবিক শিশুকে সব কথা—'বাবা' 'দাদা' 'দিদি' প্রভৃতি শিখাইতে হয়, কিন্তু 'মা' কথাটি তাহাকে শিখাইতে হয় না। কিন্তু সাতকড়ি বাবু যে 'মা' শব্দটী সমভাবে সকল ভাষাতেই বিরাজমান বলিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। ব্যুৎপত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু 'মা' র মত এত স্নেহভরা, এত শান্তিপূর্ণ, এমন অভয়প্রদ শব্দ ভাষান্তরে দেখা যায় না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে করুণা-মমতা-দয়া-বিজড়িত ভাবের এমন অভিব্যক্তি কি ইংরাজের Mamma, আরবীয়ের 'উম্মী,' পারসীকের 'নেনা,' উর্দ্দু ভাষীর 'আম্মা' শব্দগুলিতে হইয়া থাকে? ব্যুৎপত্তি ধরিলে মাতার গুরুত্ব সকল দেশের সকল ভাষাতেই প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা যেমন পূর্ণভাবে উহা প্রমাণ করে, অন্য কোন ভাষাতে ততটা করে না। যাহা হউক, যাঁহার অপেক্ষা নিঃস্বার্থ-ভাবে ভালবাসিতে পিতাও পারেন না, পতিপ্রেমে তন্ময়া সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীরও নিঃস্বার্থ ভালবাসা যে স্নেহের নিকট পরাজিত, যাঁহার কষ্ট, যন্ত্রণা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও চিন্তার ঋণ সমস্ত জীবনেও কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারা যায় না, যাঁহার মত ক্ষমা কেহ করিতে পারেন না, সেই মাতার প্রতি, সেই মহাদেবীর প্রতি আমাদের ভক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে কেন? কি জন্য মাতার এত লাঞ্ছনা, মাতার এই দুর্দ্দশা, মাতার প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা বাড়িতেছে? আমরা দিন দিন পত্নীসর্ব্বস্ব ও পত্নৈকমনা হইতেছি বলিয়াই কি এই অনর্থ ঘটিতেছে না?

---

* বর্ত্তমান নিয়মাবলী স্থির হইবার বহু পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ পরিষদে প্রেরিত হয়, সেই জন্য বর্ত্তমান নিয়মের বিরুদ্ধ হইলেও প্রকাশিত হইল। সা, প, স।

* শ্রীসাতকড়ি গোস্বামী প্রণীত। মূল্য।• চারি আনা মাত্র।

ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। আমাদের অকৃতজ্ঞতার, আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ করিতেছি। অকৃতজ্ঞতা অপেক্ষা পাপ বুঝি আর জগতে নাই। যতদিন আমরা মাতার কৃতজ্ঞ সন্তান ছিলাম, ততদিন আমাদের মন বিশাল, উন্নত ও প্রশস্ত ছিল। সেই উদার, বিশাল হৃদয়ে তখন যেন আনন্দ ধরিত না, উছলিয়া পড়িত। প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায়, প্রতিক্ষণে মাতৃ-আজ্ঞা বহন করিয়া আমরা কেবল যে ধন্য হইতাম, পবিত্র হইতাম, পরকালের কার্য্য করিতাম, তাহা নহে, আমাদের মন তখন সর্ব্বদাই তেজে ও উৎসাহে ভরিয়া থাকিত। যে মাতৃভক্ত তাঁহার অন্তরে যত বল, এত বল কি কাহারও আছে? মাতৃভক্তের সকল কার্য্যেই অদম্য উৎসাহ, বিপুল তেজ, অমিত ভরসা। আর মাতৃভক্ত মাতৃনাম স্মরণ করিয়া প্রতিকার্য্যেই সফল-মনোরথ হন। সে এক দিন ছিল! কিন্তু এখন? এখন মাতার প্রতি যতই আমাদের অবজ্ঞা বাড়িতেছে, যতই তাঁহাকে আমরা কোন কার্য্যে, কোন পরামর্শে ডাকি না, তাঁহাকে জানাইয়া কোন কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করি, যেন তিনি আমাদের শত্রু, তাঁহার দ্বারা যেন কতই অনিষ্ট হইবে এবং সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে যতই অবজ্ঞা করি ও সামান্য পালনীয়ার মধ্যে গণ্য করিয়া রাখি, ততই আমাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যে এক টাকার স্থলে দশ টাকা ব্যয় হয়, এক দিনের কার্য্য দশ দিনে হয় না; সকল কার্য্যে বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি, উপস্থিত হয়। এখন কোথায় বা কার্য্যের শৃঙ্খলা, কোথায় বা কাজের বাঁধুনী! কেবল তাহাই নহে, আমাদের মনও দিন দিন সঙ্কীর্ণ ও নীচ হইয়া যাইতেছে; সদাই মনে অশান্তি ও অসুখ বিরাজ করিতেছে। চিত্তের সে ভূমা আনন্দই বা কোথায়, সে আত্মপ্রসাদই বা কই! কোন কার্য্যে আর তেমন উৎসাহ নাই, তেজ নাই, সাহস নাই। কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বেই সন্দেহ, সঙ্কোচ, ভয় ও নৈরাশ্য মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে ভরসাও নাই, সাহসও নাই। যেখানে সাহস নাই, সেখানে উৎসাহ ও তেজ থাকিবে কিরূপে? সেই খানে যে ভয় ও নৈরাশ্য স্বতঃ আসিয়া স্বীয় রাজ্য বিস্তার করে।

কিন্তু কেন আমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, কেন আমরা হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিলাম! ইহার কয়েকটী কারণ আমাদের অন্তরে উদয় হইয়াছে। ১ম, আমরা অধঃপতিত, লক্ষ্মীছাড়া হইতেছি বলিয়াই লক্ষ্মী-শ্রীর প্রধান নিদর্শন মাতৃভক্তি ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। ২য়, আমাদের সমাজের অধঃপতনের সহিত সমাজের অঙ্গ যে মাতা তাঁহারও অধঃপতন ঘটিয়াছে। মাতার সে নিঃস্বার্থ ভাব, সে বিপুল উদারতা, মনের সে সমুদ্র-সদৃশ প্রশস্ততা তেমন আর নাই; আদর্শ হিন্দুর রমণীর মহান্ ধর্ম্মভাব হইতে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্যুত। তাঁহার মনে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। পুত্রবধূ প্রভৃতি সংসারের পরিজনবর্গের প্রতি তাঁহার প্রীতি, স্নেহ ও দয়ার পরিবর্ত্তে অপরিমিত প্রভুত্ব, দুর্জ্জয় শাসন ও বিষম কঠোরতা লক্ষিত হইতেছে।

৩য়, আমাদের শিক্ষা বিজাতীয়, সংস্কারও বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু মাতার শিক্ষা, চিরাগত প্রাচীন ভাবে সম্বদ্ধ, সংস্কার, পূর্ব্বপুরুষগণের সদৃশ। ইহার ফল, মাতার প্রতি অজ্ঞতার আরোপ এবং শ্রদ্ধার বিশেষ অভাব। ৪র্থ, নূতন শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগের মন অহঙ্কারে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে। অহঙ্কারী হইয়া আমরা মাতাপিতা প্রভৃতিকে বিলক্ষণ অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি; তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে যেন অতিশয় লজ্জা বোধ হয়। তাঁহারা মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁহারা অজ্ঞান বলিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রত্যেক কার্য্যে, প্রতি কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি। ৫ম ও শেষ কারণ, অনুকরণবশে আমরা শিখিয়াছি, স্ত্রীই সংসারের সর্ব্বস্ব, পৃথিবীতে তাঁহারই আদর সর্ব্বাপেক্ষা বৈধ ও করণীয়। তাঁহার নিকট স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতাও ছোট। সুতরাং সেই পত্নীর অনুরোধে বা তাঁহার সুখের জন্য, অথবা তাঁহার প্ররোচনায় সেই মাতার নির্যাতন বিশিষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার বিষময় পরিণাম সংসারের দুর্গতি এবং আমাদের বর্ত্তমান মানসিক ও নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন!

এক বিষয়ে সাতকড়ি বাবুর সহিত আমাদের মতদ্বৈধ আছে। তিনি যে লিখিয়াছেন, "স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়া ও কটুভাষিণী মাতৃগণ সহজে কলহে প্রবৃত্ত হন না অথবা অকারণে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া লোকের মনে বেদনা দেন না।" একথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। হায়! এই অধঃপতনের দিনে যদি হিন্দুললনাকুল বুঝিতেন যে, তাঁহাদের সদৃষ্টান্তে সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশালী কৃতী পুত্র সকল গঠিত হইবে; যদি তাঁহারা বুঝিতেন, যে তাঁহাদের বিষম ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ বীজ, বিকীর্ণ হইয়া হিন্দুগৃহ, হিন্দুসমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা-হইলে হিন্দুসমাজ আজ নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিত। তাঁহাদের অপক্ষপাতিতা ও নিঃস্বার্থভাব নাই বলিয়া, তাঁহাদের গুরুজনে বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়া, তাঁহাদের সেই চিরন্তন, অপার, অপরিসীম প্রীতি ও সহানুভূতির দিন দিন অভাব হইতেছে দেখিয়া, তাঁহাদের সন্তানগণও স্বার্থপর, আত্মপরায়ণ, অবিশ্বাসী, ভক্তিহীন ও অহঙ্কারী হইতেছে। এখন কি গৃহে, কি বাহিরে প্রতি কার্য্যে, প্রতি অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়া কেহ কাজ করিতে চাহেন না; সকলেই প্রভু হইতে উন্মুখ। প্রত্যেকেই অন্য সকলের অপেক্ষা আপনাকে পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বহুদর্শী মনে করেন। নিজের মনোমত কোন কার্য্য না হইলেই, নিজের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিলেই, আর তাঁহার সে অনুষ্ঠানে আস্থা থাকে না, এক নিমিষে অপরিমিত সহানুভূতি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; কারণ প্রকৃত সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ে এখন আর জন্মে না; কৃত্রিম জিনিস এক মুহূর্ত্তে প্রজ্বলিত, পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত হয়। আমাদের মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, হৃদয় নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদটুকুও আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা যদি মাতার উদার প্রশস্ত হৃদয়ের দৃষ্টান্ত পাইতাম, তবে সেই উদারতাবলে, সেই মহত্বগুণে সকল বাদপ্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতাম; ভাবিতাম না এই প্রতিবাদেই আমি অজ্ঞানী, অপণ্ডিত ও অশ্রদ্ধেয় প্রতীয়মান হইব। এতটুকু বিশ্বাস নাই বলিয়া,—কিছুমাত্র আত্মনির্ভর নাই বলিয়া আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, নিরপেক্ষ সমালোচনা সহিতে অক্ষম।

শৈশব হইতে শিক্ষালব্ধ ঈর্ষা ও হিংসা, অবিশ্বাস ও অপ্রীতি সমালোচক ও সমালোচ্য ব্যক্তির চিত্ত অভিভূত করিয়া ফেলে। সভাসমিতি বল, ব্যবসা বাণিজ্য বল, ধর্ম্ম কর্ম্ম বল, সকল বিষয়েরই সভাপতি ও সভ্যগণ, ও সহকারিগণ, গুরু ও শিষ্যগণ—সকলেরই দৃঢ় ধারণা হওয়া আবশ্যক যে অনুষ্ঠানটি প্রত্যেকেরই চেষ্টার ফল, ও প্রত্যেকের সাধ্যমত যত্ন ও প্রাণপণতার উপর নির্ভর করিতেছে। এক মন, এক প্রাণ, এক চিত্ত হইয়া কার্য্য করাই,—হৃদয়ের এক-তন্ত্রীতাই —সিদ্ধির মূল মন্ত্র।

কিন্তু আমাদের মাতৃগণ স্বার্থপর সঙ্কীর্ণহৃদয়া ও ঈর্ষাহিংসাপরায়ণা হইয়াছেন এবং তাহার ফলে আমরা তদ্রূপ হইয়াছি বলিয়া কি আমরা তাঁহাদিগকে আরও অশ্রদ্ধা, আরও অযত্ন এবং আরও অভক্তি করিব? না, কখনই নহে। আমাদের অভক্তি ও অযত্নই তাঁহাদিগকে হতাশ ও দারুণ ব্যথিত করিয়াছে, তাঁহাদিগকে এত স্বার্থপর, এত আত্মপরায়ণ করিয়াছে। এখানে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, নতুবা প্রমাণ করিতাম যে ভক্তি হইতেই যত গুণের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তদভাবে সকল দোষের জন্ম ও পরিপুষ্টি। ভক্তি বৃত্তি আমাদের অন্য সমস্ত সদ্বৃত্তির জনয়িত্রী। মাতৃভক্তি হইতেই ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। স্থান থাকিলে বুঝাইতাম, ভক্তি ভক্তকে উন্নত, উদার-বিশ্বাসী ও সম-বেদনা পূর্ণ করে, ভক্তির পাত্রী মাতাও ভক্তি পাইয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার উপযুক্ত করিতে উৎসুক হন। যে স্থানে ভক্তি বিরাজ করে, সেস্থানের বায়ু পর্য্যন্ত পবিত্র ও মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ হয়।

এই দুরবস্থার দিনে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গোস্বামী মহাশয় "মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের সমূহ উপকার করিয়াছেন। মাতার মহিমা এরূপ উজ্জ্বল রূপে, এরূপ সুকৌশলে, এপ্রকার সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, যে সম্প্রদায়ের লোক হউন না কেন, যিনি পুস্তক খানি পাঠ করিবেন তাঁহারই হৃদয় মাতৃ-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, মন ভক্তি স্নেহে বিগলিত হইয়া যাইবে। মাতার উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি হইতে পারে, এপক্ষে তিনি যে সকল শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল যুক্তি হিন্দু বা বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান, কাহারই পরিহার্য্য নহে; কারণ ঐগুলি সাধারণ ও সর্ব্ববাদিসম্মত নীতিমূলক। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে যে বর্ত্তমান কালে মাতার প্রতি ভক্তিহীনতা, মমতাশূন্যতা, সহানুভূতির অভাব ও অবজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি আস্তিক, কি নাস্তিক, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান সকলের প্রতিই প্রযোজ্য; কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি লক্ষ্য নহে। শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত।

পারিভাষিক সমিতি।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ণ কার্য্য এত দিনে সম্পন্ন হইল। পারিভাষিক সমিতি কর্ত্তৃক এই পরিভাষা প্রণীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০১ সালের ১৪ই শ্রাবণ (১৮৯৪।২৯ শে জুলাই) তারিখে রবিবারে ঐ বৎসরের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পারিভাষিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, ঐ সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন (১)।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্ (সভাপতি)
২। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল্
৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। " বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ
৫। " শারদারঞ্জন রায় এম এ
৬। " রজনীকান্ত গুপ্ত
৭। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
৮। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ
৯। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

এই দশ জনের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত আট জন সমিতির প্রতিষ্ঠা কালে নির্ব্বাচিত হন; এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, উহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে ১৩০২ সালের ১০ই কার্ত্তিক তারিখে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিনি প্রথমতঃ সমিতির সভ্যরূপে ও পরে সভ্যও সম্পাদক-রূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ১৩০২ সালের ২৭শে শ্রাবণে সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন (২)। আর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, এই বৎসরের (১৩০৩ সালের) প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৮ই বৈশাখে) পরিষদের ও সেই সঙ্গে এই সমিতির ও সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন (৩)।

সমিতি প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা অর্থাৎ ইংরাজী ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নিরূপণে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম ভাগ, ১ সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০২ সাল কার্ত্তিক মাস, ৩৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৩) সাহিত্য-পরিষদের (১৩০৩ সালের) নিয়মাবলীর ১৯ উনবিংশ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

শব্দসমূহের একটী মুদ্রিত তালিকা প্রস্তুত হয় ও সমিতির সভ্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রেরিত হয়।

১৩০১ সালে এই সমিতির পাঁচটী অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অধিবেশনে—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এল্
বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এল্
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ
" রজনীকান্ত গুপ্ত
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই ছয় জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ অধিবেশনত্রয়ে Air (এয়ার্) হইতে cirrus cloud (সিরস্ ক্লাউড্) পর্য্যন্ত ইংরেজি শব্দগুলির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ স্থিরীকৃত হয়। পরবর্ত্তী অধিবেশন দ্বয়ে carbon (কার্বন্) হইতে epoch (ইপক্) পর্য্যন্ত শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ নিরূপিত হয়।

গত বর্ষে (১৩০২ সাল, ৬ই মাঘ) একটী মাত্র অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সভ্য-দিগের মধ্যে কেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই দুই জন উপস্থিত হন। তাঁহারা উভয়ে Freezing (ফ্রীজিঙ্) হইতে Point (পয়েণ্ট) পর্য্যন্ত ইংরাজি ভৌগোলিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নিরূপণ করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে (১৩০৩ সালে) দুটী অধিবেশনে হইয়াছিল। ২১শে বৈশাখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত না হওয়ায়, সমিতির কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পায় নাই। তদনন্তর ১লা আশ্বিন (১৮৯৬,১৬ই সেপ্টম্বর) বুধবার সংস্কৃত কালেজে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাই এই সমিতির শেষ অধি-বেশন। তাহাতেই ইহার অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবারে কেবল বিচারপতি ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই দুই জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদের যে সকল সভ্য সমিতিতে উপস্থিত না হইয়া পত্র দ্বারা স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতাস্থিত সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যাপারে যেরূপ যত্ন ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন তাহাতে পরিষদ্ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ আছেন।

ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতির অনুমোদিত শব্দ।

ইংরাজী শব্দ।	বাঙ্গালা শব্দ।
Air	বায়ু।
Affluent, Tributary	উপনদী।
Altitude (of a hill)	উৎসেধ।
„ (of a star)	উন্নতাংশ।
Aqueous vapour	জলীয় বাষ্প।
Antarctica	অবাচিকা।
Arctic ocean	উত্তর মহাসাগর।
Antarctic ocean	দক্ষিণ মহাসাগর।
Antarctic circle	উদীচ্যোত্তরবৃত্ত।
Arctic circle	উদীচ্য বৃত্ত
Archipelago	দ্বীপপুঞ্জ।
Astronomy	জ্যোতিষ।
Average	গড়।
Atmosphere	বায়ু-মণ্ডল।
Axis (of rotation)	মেরুদণ্ড, অক্ষদণ্ড (১) ধ্রুবযষ্টি-সিদ্ধান্ত,শিরোমণি।
„ (of an ellipse)	
„ major	দীর্ঘ ব্যাস বা দীর্ঘ দণ্ড।
„ minor	হ্রস্ব ব্যাস বা হ্রস্ব দণ্ড।
Area	ক্ষেত্রফল।
Avalanche	হিম-পাতিকা।
Aurora Borealis	উদীচি উষা বা সুমেরুজ্যোতিঃ।
„ Australis	অবাচী উষা বা কুমেরুজ্যোতিঃ।
Ammonia	নিসাদল-ক্ষার।
Anticyclone	প্রতীপ বাতাবর্ত্ত।
Alluvial	পাললিক।
Antipodes	কুদলান্তর (২)।

(১) অক্ষ শব্দেরও এই অর্থে ব্যবহার আছে ; যথা—'স্বাক্ষভ্রমণং'—শ্রীরা।

(২) অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়ামনুষ্যা ইব নীরতীরে—সিদ্ধান্ত শিরোমণি—শ্রীরা।

ইংরাজী শব্দ।	বাঙ্গালা শব্দ।
Angular distance	কৌণিক অন্তর।
Bay	উপসাগর।
Bight	উপসাগর।
Bank	কূল, তট।
Basin	অববাহিকা।
Branch (of a river)	শাখা।
Bed (of a river)	গর্ভ।
Base-line	তল-রেখা বা ভূমি-রেখা
Bore	বান।
Breeze	মন্দানিল।
„ land—	স্থলানিল।
„ sea—	জলানিল।
Barometer	বায়ুমান।
Breaker	ভগ্নোর্ম্মি, ভঙ্গ।
Boundary	সীমা।
„ artificial	কাল্পনিক সীমা।
„ natural	প্রাকৃতিক সীমা।
Belt of Calms	নির্বাত-মণ্ডল।
Boiling	স্ফোটন।
Boiling point	স্ফোটনাঙ্ক।
Boulders	গণ্ডশৈল।
City	পুর বা নগর।
Country	দেশ।
Continent	মহাদেশ
County	প্রদেশ।
Cape	অন্তরীপ।
Cyclone	বাতাবর্ত্ত।
Current	প্রবাহ।
Coast	উপকূল।
Coast-line	তটরেখা।

ইংরাজী শব্দ।			বাঙ্গালা শব্দ।
Climate	...	...	জলবায়ু।
Carnivora	...	...	ক্রব্যাদ।
Constitution	...	...	শাসনতন্ত্র।
Carbonic Acid	...	...	অঙ্গারাম্ল বা অঙ্গার-দ্রাবক।
Cumulus	...	...	স্তূপমেঘ।
Chart	...	...	নক্সা বা চিত্র।
Chartography	...	...	চিত্রীকরণবিদ্যা।
Condensation	...	...	ঘনীভবন।
Cliff	...	...	ভৃগু।
Chemical	...	...	রাসায়নিক।
Crystal	...	...	স্ফটিক।
Crystallography	...	...	স্ফটিকবিদ্যা।
Cataract	...	...	জলপ্রপাত।
Crater	...	...	অগ্নিগহ্বর।
Cascade	...	...	নির্ঝরিকা।
Catchment basin	...	...	নির্দ্দিষ্ট অববাহিকা।
Channel	...	...	প্রণালী।
Canal	...	...	খাল।
Cirrus cloud	...	...	ঊর্ণামেঘ।
Carbon	...	...	অঙ্গার।
Carboniferous	...	...	অঙ্গারগর্ভ বা অঙ্গারোৎপাদক।
Coal	...	...	পাথুরিয়া কয়লা বা মৃদঙ্গার।
Calms, (Belt of)	...	...	নির্ব্বাত-মণ্ডল।
Crust (of the earth)	...	...	ভূপঞ্জর।
Conduction	...	...	পরিচালন।
Convection	...	...	পরিবাহন।
Coral island	...	...	প্রবালদ্বীপ।
Circle	...	...	বৃত্ত, মণ্ডল।
„ great	...	...	বৃহৎ বৃত্ত।
„ small	...	...	লঘু বৃত্ত।
Circumference	...	...	পরিধি বা বেষ্টন।

ইংরাজী শব্দ।			বাঙ্গালা শব্দ।
Colure	...	...	অয়নান্ত বৃত্ত, অয়নপ্রোত বৃহৎবৃত্ত বা অয়নান্তের অহোরাত্র বৃত্ত।
Capital	...	...	রাজধানী।
Cable	...	...	ধাতব রজ্জু।
Constant winds	...	...	নিয়তবাহী বায়ু।
Defile	...	...	গিরি-সঙ্কট।
Delta	...	...	'ব'দ্বীপ।
Desert	...	...	মরুভূমি।
Distribution	...	...	সংবিভাগ।
Density	...	...	সান্দ্রতা।
Diameter	...	...	ব্যাস।
Degree	...	...	অংশ।
„ (of temperature)		...	তাপাংশ।
„ (of angular measure)		...	কৌণিক অংশ।
Deposit	...	...	সংস্থিতি।
Dredge	...	...	তলকর্ষণী।
Dew	...	...	শিশির।
Dew-point	...	...	পরিষেকাঙ্ক।
Drainage	...	...	অববাহন।
Drainage basin	...	...	অববাহিকা।
Elevation	...	...	উচ্চতা।
Empire	...	...	সাম্রাজ্য।
Earth	...	...	পৃথিবী।
Earthquake	...	...	ভূমিকম্প।
Eruption	...	...	অগ্ন্যুৎপাত।
Extinct	...	...	নির্ব্বাণ।
Erosion	...	...	খাতি।
Evaporation	...	...	বাষ্পীভবন।
Equinox	...	...	বিষুব, ক্রান্তিপাত।

ইংরাজী শব্দ।	বাঙ্গালা শব্দ।
Equinoctial points	বিষুবদ্বিন্দু
Equator (Terrestrial) ...	নিরক্ষবৃত্ত।
Celestial	বিষুবদ্ বৃত্ত।
Equinoctial circle	নাড়ীবলয়।
Ellipse	বৃত্তাভাস, দীর্ঘবৃত্ত—(সুধাকর শাস্ত্রী।)
Ellipsoid	অপবর্ত্তুল।
Ecliptic	ক্রান্তিবৃত্ত।
Eccentricity	উৎকেন্দ্রতা, অন্ত্যফলজ্যা, মন্দপরিধির ব্যাসার্দ্ধ।
Estuary	খাড়ী।
Elements	রূঢ় পদার্থ।
Epoch	যুগ, কল্প।
Freezing	ঘনীভবন, সংহনন।
Freezing point	সংহনন বিন্দু।
Focus	নাভি।
Fossil, ...	শিলাভূতাবয়ব।
Ferrugenous	আয়স-কণীয়।
Frost	নীহার।
Fall	জলপ্রপাত, ঝরণা, প্রস্রবণ।
Fog	কুজ্ঝটিকা।
Fluid	তরল দ্রব্য, দ্রব দ্রব্য।
Frith	সঙ্কীর্ণ সাগর শাখা।
Firth	সাগর শাখা।
Fiord	সাগর শাখা বিশেষ।
Gas	বাষ্প।
Gulf	সাগরশাখা, উপসাগর।
Culfstream	উপসাগরীয় স্রোত।
Groundswell	সামুদ্র বিবর্ত্ত।
Geyser	উষ্ণ প্রস্রবণ।

ইংরাজী শব্দ।			বাঙ্গালা শব্দ।
Glacier	...	...	হিমসংহতি, হিমানী।
Glaciation	...	...	হিম-সংহনন।
Glacial period	...	...	হিমানী যুগ।
Geology	...	...	ভূপঞ্জর-বিদ্যা।
Geological Time	...	...	ভূপঞ্জরীয় যুগ।
Geography	...	...	ভূগোল।
,, mathematical	...	...	গণিত ভূগোল।
,, astronomical	...	...	জ্যোতি ভূগোল।
,, physical	...	...	প্রাকৃতিক ভূগোল।
,, general	...	...	ভূগোল।
,, political	...	...	রাজ্যতন্ত্রীয় ভূগোল।
Geocentric	...	...	পৃথ্বীকেন্দ্রক।
Globe	...	...	গোলক, মণ্ডল।
Good Hope	...	...	উত্তমাশা।
Government	...	...	রাজ্যতন্ত্র।
Hill	...	...	পাহাড়, গিরি।
Height	...	...	উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।
Harbour	...	...	পোতাধিষ্ঠান, বন্দর।
Haven	...	...	বন্দর।
Hemisphere	...	...	গোলার্দ্ধ।
Horizon	...	...	চক্রবাল, দিগ্বলয়, ক্ষিতিজ, কুজ।
Heliocentric	...	...	সূর্য্যকেন্দ্রক।
Heleocentric longitude	...	...	মন্দস্পষ্ট গ্রহ।
Horizontal	...	...	কুজীয়।
Horizontal plane	...	...	ক্ষিতিজ ক্ষেত্র।
Hydrogen	...	...	অজনক, উদজান, উদজনক।
Heat	...	...	তাপ।
Hotspring	...	...	উষ্ণ প্রস্রবণ।
Hygrometer	...	...	সিক্ততা-মান।
Halo	...	...	মণ্ডল।
High water	...	...	জোয়ার।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

ইংরেজী শব্দ।			অর্থ।
Insectivora	...	...	পতঙ্গভুক্‌।
Ice	...	...	বরফ।
Iceberg	...	...	হিমশিলা।
Isobar	...	...	সমভার রেখা।
Isothermal	...	...	সমোষ্ণীয়।
Inland Sea	...	...	অন্তঃস্থল সমুদ্র।
Junction	...	...	সঙ্গম।
Land	...	...	স্থল।
Latitude	...	...	অক্ষাংশ, পলাংশ।
„ parallel of	...	...	স্পষ্ট ভুপরিধি, অথবা অক্ষাংশীয় সমান্তরালবৃত্ত।
„ Celestial	...	...	শর।
Longitude	...	...	দেশান্তর।
Celestial „ for planets		...	ভোগ।
„ „ for stars	...	...	ধ্রুব, ধ্রুবক।
Level	...	...	সমতল।
Lake	...	...	হ্রদ।
Leap year	...	...	প্লবকবর্ষ।
Limited monarchy	...	...	নিয়ম তন্ত্র রাজ্য।
Llanos	...	...	প্রান্তর বিশেষ।
Lava	...	...	ধাতুদ্রব।
Landslip	...	...	ভূমিপাত।
Low water	...	...	ভাঁটা।
Latent heat	...	...	গূঢ় তাপ, প্রচ্ছন্নতাপ।
Liquid	...	...	তরল।
Language	...	...	ভাষা।
Lagoon	...	...	বদ্ধজল।

ইংরেজী শব্দ।			অর্থ।
Minute (of time)	...	...	মিনিট।
Minute (of arc)	...	...	কলা।
Mount	...	...	পর্ব্বত।
Mountain	...	...	পর্ব্বত।
Mountain Range	...	...	পর্ব্বত শ্রেণী।
Mouth	...	...	মোহানা।
Map	...	...	মানচিত্র।
Mineral	...	...	আকরিক, খনিজ।
Mineralogy	...	...	খনিজ বিদ্যা।
Mechanical	...	...	যান্ত্রিক।
Monsoons	...	...	আর্ত্তববায়ু।
Mean	...	...	গড়।
Meaning	...	...	দ্রবণ, বিলয়ন।
Mist	...	...	কুজ্ঝটিকা, কোয়াসা।
Meteors	...	...	উল্কাপিণ্ড।
„ aqueous	...	...	জলীয় উল্কা।
Meteorology	...	...	বায়ুমণ্ডল বিদ্যা।
Migration	...	...	স্থানান্তর গমন।
Melting point	...	...	দ্রবণাঙ্ক।
Mine	...	...	আকর।
Moraine	...	...	উপত্যকা।
Mirage	...	...	মরীচিকা।
Moist	...	...	আর্দ্র।
Moisture	...	...	আর্দ্রতা।
Meridian (Terrestrial)		...	যাম্যোত্তর বৃত্ত।
„ Celestial	...	...	ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত।
„ Prime,	...	...	মধ্যরেখা।
Mediterranean Sea	...	...	ভূমধ্যসাগর।
Maximum	...	...	ঊর্দ্ধসীমা, পরমসীমা।
Minimum	...	...	অধঃসীমা।
Nadir	...	...	অধঃস্বস্তিক।

ইংরেজী শব্দ।	অর্থ।
Nimbus	বৃষ্টিপ্রদ।
Nitrogen	যবক্ষারজান।
Nebula	নীহারিকা।
Nebular Threory	নীহারিকাবাদ।
Ocean	মহাসাগর।
Oasis	অন্তর্মরুগ্রাম।
Oceania	সামুদ্রিকা।
Orbit	কক্ষ।
Oxygen	অম্লজান।
Oxidation	অম্লজান যোগ।
Observatory	বেধালয়।
Ozone	অম্লজানসার।
Organism	জীবাবয়ব।
Organic matter	জীবিয় পদার্থ।
† Pole	পৃষ্ঠ কেন্দ্র ও মেরু।
" North	সুমেরু।
" South	কুমেরু।
Polar Diameter	যামোত্তর ব্যাস।
Plane	ক্ষেত্র।
Planet	গ্রহ।
Planetoid	ক্ষুদ্র গ্রহ।
Period of rotation	আবর্ত্তন কাল।
" of revolution ...	ভগণকাল।
Projection	ছেদ্যক।
Pressure	চাপ।
Protoplasm	জীববীজ।
Pot-hole	মণ্ডলাকার গর্ত্ত।
Pacific Ocean	প্রশান্ত মহাসাগর।

† পৃথিবীর পোলের নাম মেরু, অন্যগ্রহের স্থানে পৃষ্ঠকেন্দ্র শব্দের ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিষুবৎ বৃত্তের পোলের নাম ধ্রুব; ক্রান্তিবৃত্তের পোলের নাম কদম্ব, ক্ষিতিজের পোলের নাম খস্বস্তিক ও অধঃস্বস্তিক। সংস্কৃত জ্যোতিষে পোলের কোন সাধারণ নাম নাই, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নাম আছে। শ্রীরা।

ইংরেজী শব্দ।	অর্থ।
Peninsula	উপদ্বীপ।
Plain	সমতল ভূমি, সমক্ষেত্র, সমতল ক্ষেত্র।
Port	বন্দর।
Plateau ...	মালভূমি।
Prairie ...	প্রান্তর বিশেষ।
Province ...	প্রদেশ।
Pampas ...	প্রান্তর বিশেষ।
Population ...	লোক সংখ্যা।
Peak ...	শিখর, চূড়া।
Promontory ...	শৈলান্তরীপ।
Polynesia ...	পলিনেশিয়া।
Pagan ...	প্রতিমাপূজক।
Plants ...	উদ্ভিদ্।
Pass ...	বর্ত্ম, গিরিসঙ্কট।
Point ...	বিন্দু।
Quarters (The Four)	ভূখণ্ড, চতুর্ভূখণ্ড।
Quadrumana ...	চতুর্হস্ত।
Quadruped ...	চতুস্পদ।
Quarry ...	পাষাণ কর্ত্তন স্থান।
Rodent ...	তীক্ষ্ণদন্ত।
Ruminant ...	রোমন্থক।
Radiation ...	বিকিরণ।
Republic ...	সাধারণ তন্ত্র।
Rock ...	প্রস্তর।
„ Crystalline ...	
„ Plutonic ...	বারুণ।
„ Igneous ...	আগ্নেয়।
„ Fossilized ...	শিলাভূত জীবজ।
„ Submarine ...	অন্তঃসমুদ্র।
„ Stratified ...	স্তরীভূত।
„ Metamorphic	পারিণামিক।

ইংরেজী শব্দ।			অর্থ।
Rotation	...	...	আবর্ত্তন, ঘূর্ণন।
Revolution	...	...	প্রদক্ষিণী করণ।
Regions	...	...	প্রদেশ, মণ্ডল।
„ Zoological	...	...	প্রাণী বিশেষের।
„ Botanical	...	...	উদ্ভিদ বিশেষের।
„ of Constant winds		...	নিয়মবাহী বায়ুমণ্ডল।
„ Rainless	...	...	নির্বর্ষদেশ।
„ of variable winds		...	অনিয়মবাহী বায়ুমণ্ডল।
„ of constant precipitation.			সন্ততবর্ষস্থান।
„ Palearctic	...	...	প্রত্ন সুমেরুপ্রদেশ।
„ Ethiopean	...	...	ইথিওপিয়াস্থ।
„ Oriental	...	...	প্রাচ্য।
„ Australian	...	...	অষ্ট্রেলিয়াস্থ।
„ Neotropical		...	নব অয়নান্ত প্রদেশ।
„ Nearctic	...	...	নবসুমেরু প্রদেশ।
River	...	...	নদী।
River basin	...	...	নদীর জলপাত প্রদেশ।
Religion	...	...	ধর্ম্ম-প্রণালী।
Races	...	...	জাতি।
Race (tidal)	...	...	ওঘসঙ্ঘর্ষ।
Ravine	...	...	দরী, কন্দর।
Section (of a solid)		...	ছেদ, ছেদমুখ।
Solid	...	...	কঠিন পদার্থ, ঘনাবয়ব (জ্যামি)।
Solution	...	...	দ্রব পদার্থ।
Solvent	...	...	দ্রাবক।
Saturation	...	...	পূর্ণ সিক্ততা।
Supersaturation	...	...	অতিপূর্ণ সিক্ততা।
Snow	...	...	হিম, তুষার।
Snow-flake	...	...	হিম খণ্ড।
Snowline	...	...	চিরতুষার রেখা।
Snowfields	...	...	তুষার ক্ষেত্র।

ইংরেজী শব্দ।			অর্থ।
Sensible heat	...	...	অনুভূত উষ্ণতা।
Strata	...	...	স্তর।
Stratus cloud	...	...	স্তরীভূত মেঘ।
Sleet	...	...	হিম কণ।
Storms	...	...	ঝড়।
Sound	...	...	প্রণালী।
Sounding line	...	...	জলমান রেখা, জলমান সূত্র।
Silica	...	...	বালি।
Siliceous	...	...	বালুকাসম্বন্ধীয়।
Suburb	...	...	নগরোপকণ্ঠ।
Steppes	...	...	উচ্চতৃণভূমি।
Sea	...	...	সাগর, সমুদ্র।
Strait	...	...	প্রণালী।
Savannah	...	...	নির্বৃক্ষ প্রান্তর।
Sanitarium	...	...	স্বাস্থ্যনিবাস।
Spring	...	...	উৎস, প্রস্রবণ।
Satellite	...	...	উপগ্রহ।
Second (of time)	...	...	বিপল, সেকেণ্ড।
,, (of arc)	...	...	বিকলা।
Season	...	...	ঋতু।
Solstice	...	...	অয়নান্ত বা মকরাদি ও কর্কাদি।
Sphere	...	...	বর্ত্তুল, গোল, মণ্ডল।
Spheroid	...	...	বর্ত্তুলাভাস।
Surface	...	...	তল, পৃষ্ঠ।
Solar System	...	...	সৌরজগত।
Soil	...	...	মৃত্তিকা।
Surface drift	...	...	উপরিতন প্রবাহ।
Subsidence	...	...	অধোগমন।
Sundial	...	...	সূর্য্যঘড়ি।
Sea-level	...	...	সাগরপৃষ্ঠ।
Salt (common)	...	...	লবণ।

ইংরেজী শব্দ।			অর্থ।
Salts	...	...	লবণ।
Saline	...	...	লাবণিক।
Subsoil	...	...	অধোভূমি। অধোভূমিক।
Silt	...	...	পলি, পলল।
Sediment	...	...	পলি।
Source	...	...	উৎপত্তিস্থল।
Station	...	...	সংস্থান, স্থান।
Temperature	...	...	তাপ পরিমাণ।
Thermometer	...	...	তাপমান।
Tides	...	...	জোয়ার ভাটা।
Tide, Spring	...	...	কোটাল।
,, Neap	...	...	মরা কোটাল।
,, Flood	...	...	বেলোর্দ্ধসীমা।
,, Ebb	...	...	ভাটা।
Tertiary	...	...	তৃতীয়ক।
Transport	...	...	বহন।
Tornado	...	...	বাতাবর্ত্ত।
Tradewinds	...	...	বাণিজ্যবায়ু।
Trades, Anti—	...	...	প্রতীপ বাণিজ্যবায়ু।
Topography	...	...	ভূসংস্থান বিবরণ।
Tropics	...	...	ক্রান্তি, অয়নান্তবৃত্ত।
Tropic of Cancer	...	...	কর্কট ক্রান্তি, উত্তরপরমাপক্রজ্যাবৃত্ত।
,, of Capricorn		...	মকর ক্রান্তি, দক্ষিণপরমাপক্রজ্যাবৃত্ত।
Tableland	...	...	মালভূমি।
Town	...	...	নগর।
Triangulation	...	...	ত্রিভুজতাপাদন।
Theodolite	...	...	থিওডোলাইট।
Tunnel	...	...	তলবর্ত্ম।
Upheaval	...	...	উদ্গমন, উচ্ছাস্।
Underground	...	...	অধোভূমিক।
Valley (mountain)	...	...	উপত্যকা।

ইংরেজী শব্দ।	অর্থ।
Valley (of a river)	অণুনদীনিম্নভূমি।
Vertical	লম্বরেখা।
Vertical Circle	দৃক্‌বৃত্ত।
„ Prime	সমমণ্ডল।
„ line	লম্বরেখা।
Vapour	বাষ্প।
Volcano	আগ্নেয় পর্ব্বত।
Watershed / Waterschied / Waterparting	জলবাঁধ।
World	মহাদ্বীপ।
„ New	নূতন মহাদ্বীপ।
„ Old	পুরাতন মহাদ্বীপ।
Winds	বায়ু, বাতাস।
Waterfall	জল প্রপাত।
Whirlwind	ঘূর্ণবায়ু।
Whirlpool	আবর্ত্ত।
Waterspout	জলস্তম্ভ।
Waves	তরঙ্গ।
Water, hard	কঠিন জল।
„ soft	কোমল জল।
Well	কূপ।
Windwaves	তরঙ্গ।
Zenith	খস্বস্তিক।
Zodiac	রাশিচক্র, ভচক্র।
Zone	মণ্ডল।
„ Torrid	গ্রীষ্মমণ্ডল।
„ Temperate	সমমণ্ডল।
„ Frigid	হিম মণ্ডল।
Zoology	প্রাণিবিদ্যা।
Zoological	প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধীয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শব্দ-রহস্য।

শব্দে-কবিত্ব।

ভাষা কবিত্বের পরিচায়ক। ইহাতে কবি-হৃদয়ের কোমলভাব ও গ্রথিত হইয়া আবহমান কাল জীবিত রহিয়াছে। আমরা সচরাচর যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের কোন কোনটী কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। আমরা সেই সকল শব্দের এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যে, সাধারণ অর্থ ব্যতীত তাহাদিগের কোন অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না; ফলতঃ অনবধানতাবশতঃ সামান্য পদার্থ-সূচক শব্দ মাত্র জানিয়া তৎ-সমুদায় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান-রত্নের ন্যায় শব্দসমূহে সুললিত কবিত্ব গ্রথিত আছে; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক শব্দে কবি-হৃদয়ের কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নীলাভ গগন-সঞ্চারী বিচ্ছিন্ন ধবল মেঘ খণ্ড-সমূহকে 'কাদম্বিনী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তিনি স্বীয় কবিত্বের কি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! তাঁহার কল্পনা কি হৃদয়-গ্রাহিনী উপমায় স্বীয় হৃদ্গত ভাবকে বিশদ-রূপে শব্দ-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! সুনীল নভোমণ্ডলে ধবল মেঘখণ্ডগুলি, নিবিড়, শ্যামল কদম্ববৃক্ষে প্রফুল্ল, শ্বেত পুষ্পসমূহের ন্যায় কবির চক্ষে শোভা পাইয়াছিল। কবি তখনই এই উপমা লইয়া উহাদিগকে 'কাদম্বিনী' (অর্থাৎ কদম্ব পুষ্পযুত) নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই অভিনব কাল্পনিক আখ্যা দ্বারা কি এক সুললিত ভাব 'কাদম্বিনী' শব্দে চিরসম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে 'কাদম্ব' শব্দের অর্থ কলহংস গ্রহণ করিলেও 'কাদম্বিনী' শব্দে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুনীল নীরদ-তলে কলহংসশ্রেণী যখন তাহাদিগের অতি শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে থাকে, তখন কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়! মেঘের 'কাদম্বিনী' নাম সেই মনোহর দৃশ্যেরই পরিচায়ক। এই রূপে অনেক শব্দে মনুষ্য-হৃদয়ের প্রয়োজনীয় ভাবসমূহ বিশদরূপে সম্বদ্ধ আছে।

শব্দের বুৎপত্তি হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া শব্দার্থ শিক্ষা করিলে বিশদরূপে তা[illegible] মর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায়। আদৌ যে দৃশ্য অবলম্বন করিয়া কোন এক কাল্প[illegible] অবতারণা করা হইয়াছে, সেই দৃশ্য হইতে শব্দটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিলে [illegible] মনে মধ্যে তাহার অর্থ প্রতিভাত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে 'পল্ল[illegible] উল্লেখ করা যাইতেছে। কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জন না [illegible] কিছু কিছু জানার নাম 'পল্লব-গ্রাহিতা'। শব্দটীতে 'পল্ল[illegible]

(গ্রহণ) ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই। তবে ইহার বর্ত্তমান অর্থের কি বিষয় হইতে উৎপত্তি হইল? একটী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন বৃক্ষের একটী পল্লব, কোন বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র শাখা, এই রূপে নানা বৃক্ষ হইতে কতকগুলি পল্লব সংগ্রহ করার ব্যাপারটী জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে 'পল্লবগ্রহিতার' বর্ত্তমান অর্থের বুৎপত্তি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষের সারাংশ ত্যাগ করিয়া কেবল এক একটী করিয়া ক্ষুদ্রপল্লব সংগ্রহ এবং সম্যক্ আলোচনা না করিয়া নানা বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানার্জ্জন, এই দুইয়ের কি চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে! কবির কল্পনা এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া "পল্লবগ্রাহিতা" শব্দে কেমন একটী সুন্দর মানসিক ভাব গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা বা বিশেষ কোন লক্ষণ অনুসারে অনেক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। তাহাদিগের নামেই তাহাদিগের অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তরে যে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা হিমাতিশয্য; এই জন্য তাহার নাম 'হিমালয়' বা হিমের আবাসস্থান হইয়াছে। পঞ্জাবে যে পাঁচটী নদী আছে, তাহা উহার 'পঞ্জাব' নামই বলিয়া দিতেছে। প্রাচীন অযোধ্যা যে বীরভূমি, উহা যে, অদ্বিতীয় যুদ্ধবিশারদ মহাত্মগণের জন্মস্থান, 'অযোধ্যা' নামেই তাহা সূচিত হইতেছে। বারাণসী যে হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, ঐ স্থানে গমন করিলে যে পাপ নাশ হইয়া দেহান্তে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাহা 'বারাণসী' ('বার' যে বারণ করে+'অনম্' জন্ম) নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই রূপে অনুসন্ধান করিলে 'নীলগিরি' 'মলয় (চন্দনাদ্রি)' 'গোদাবরী' 'কৃষ্ণা' প্রভৃতি নামেও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ব্যক্তির নামেও কবিত্ব আছে। রামায়ণ মহাভারতপ্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'অর্জ্জুন' অর্থ শুক্লবর্ণ; অর্জ্জুনের শরীরকান্তি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তিনি স্বয়ং আপনার নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"আমি এই সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি, এই জন্য লোকে আমাকে 'অর্জ্জুন' বলিয়া থাকে।" "যুধিষ্ঠির" যুদ্ধে স্থির; 'ভীম' ভীমদর্শন; 'সুভদ্রা' সৌভাগ্যশালিনী। মহাকবি কালিদাস 'রঘু' নামের গমনার্থ লইয়া কেমন কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন;—

"শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভক
স্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবি-
চ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্॥

...ষ্পের নামে কবিত্ব থাকিবারই কথা। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে যখন ধরাতলকে স্পর্শ করে, তখন লোহিত, শ্বেত বা পীতবর্ণের পু... গুলি মণির ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। এই মনোহর দৃশ্য অবলম্বন ...মণি' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সন্ধ্যা এই মণিগুলি

Frigic
Zoology
Zoological

ধারণ করিয়া কবির চক্ষে অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া থাকে। 'সূর্য্যমুখী' যেমনই রূপবতী, তেমনই প্রণয়িনী; প্রণয়ী সূর্য্যকে ক্ষণেকের তরেও চক্ষুর আড়াল করিতে পারে না, তাই সূর্য্য যে দিকে যায়, প্রণয়িনী সুন্দর মুখখানি সেই দিকেই ফিরাইয়া থাকে। শেফালিকার অতি মনোহর গন্ধ; সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অলিদল আর কোথাও যাইতে চাহেনা, উহারা শেফালিকায় শয়ন করিয়া পরিমল উপভোগ করিতে থাকে। তাই ঐ কুসুমের নাম 'শেফালিকা' (শেফ শয়নশীল+অলি যেখানে) হইয়াছে। 'রজনীগন্ধ' নিশাকালে কেমন চারি দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করে! 'রাধাপদ্ম' রাধিকারই পদ্ম বটে, যেমন রাধিকার কাঞ্চনবর্ণ, পুষ্পেরও সেই রূপ গৌরবর্ণ। 'কুন্দ'ত সৌরভে ভূমিকে আর্দ্র করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপরাজিতার কি মনোহর নীলরূপ! যখন শ্যামল লতিকায় নীলপুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই শোভা দেখিলে হৃদয় এরূপ উৎফুল্ল হইয়া থাকে যে উহাকে 'অপরাজিতা' (অ, বিষ্ণুকে যে স্বীয় বর্ণে পরাজিত করিয়াছে) নাম অর্পণ না করিলেও মনের তৃপ্তি হয় না। 'বক' ফুল ত বকেরই মত। বর্ণ ও আকৃতিতে উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে।

বৃক্ষলতা ও জন্তু প্রভৃতির নামেও অনেক স্থলে সুন্দর ভাব গ্রথিত আছে। অশ্বত্থ বৃক্ষ যে, বহুকাল স্থায়ী, তাহা তাহার নামেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 'মালতী' মা অর্থাৎ শোভাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। 'মাধবী' মধুমাসে পুষ্পদামে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে, সেই জন্য উহার আর একটী নাম 'বাসন্তী'। ফলতঃ মনুষ্যহৃদয়ের সুললিত ভাব সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তি যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই দিকেই কোন না কোন বস্তুতে তাঁহার মনের সুন্দর ভাব গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা সর্ব্বস্থলে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি নদীতীরে দাঁড়াইয়া মার্জ্জারসদৃশ কোন জন্তুকে মৎস্য ধরিতে দেখিয়া তাহাকে 'উদ্বিড়াল' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; আবার বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া তদুপরি বিড়ালের ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তুগুলিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে 'কাষ্ঠমার্জ্জার' অর্থাৎ কাঠ বিড়াল নাম প্রদান করিয়াছেন। পুষ্পোপরি উড্ডীয়মান ভ্রমরের মস্তকে দুইটী রেফের [illegible]দেশ্য নহে; উহাকে 'দ্বিরেফ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। '[illegible]ও ইহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। বুঝায়, তাহা [illegible] ভাবপূর্ণ রসাত্মক শব্দকে "আত্মার বায়ু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেহেতু ধরিয়া গ্রাস [illegible] না থাকিলে আমাদিগের আত্মা স্রোতোহীন জলরাশির ন্যায় স্তম্ভিত ও বিরাজমান [illegible]য়া পড়ে।

সমূহে প[illegible]

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

ভয়া[illegible]

নগ[illegible]

(অ[illegible]

করিয়া তাহাকে 'অট্টালিকা' (অট্ট—উপহাস করা) নামে অভিহিত করিলেন; তাঁহার মনে হইল, যেন দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ সৌধগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া কুটীরকে উপহাস করিতেছে। আবার গৃহভিত্তিতে কতকগুলি ছিদ্রের গো-অক্ষির সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া উহাদিগকে 'গবাক্ষ' নাম প্রদান করিলেন।

উপমায় মনের ভাব অতি বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে; উপমায় মনোভাব ব্যক্ত করা মনুষ্যের স্বাভাবিক রুচি; সেই জন্য অনেক সাধারণ শব্দে ঐ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি বহুযত্নসহকারে কোন শাস্ত্র আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা সেই শাস্ত্রে 'পারদর্শী' বলিয়া থাকি, অর্থাৎ তিনি সেই শাস্ত্র-জলধির অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইচ্ছা বা বাসনার আর একটী নাম 'মনোরথ'; এই মনোরথ শব্দের কি চমৎকার সাদৃশ্যগত উজ্জ্বলভাব সম্বদ্ধ রহিয়াছে! বাসনা মনের রথ; এই বাসনা-রথে আরোহণ করিয়া মন সর্ব্বত্র গমন করে, কখন ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া রাজসিংহাসনে গিয়া উপবিষ্ট হয়, কখনও বা শুদ্ধাচার তপস্বীর ন্যায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনে বনে বিচরণ করে; ফলতঃ এই বাসনারূপ যানে আরোহণ করিয়া মন সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকে। উপমা-স্থলে 'শাখা' শব্দটীর আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, যথা—'শাখা-নদী', 'শাখা-নগর', 'শাখা-সমিতি', 'শাখা-বিদ্যালয়' ইত্যাদি। "রত্ন" একটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ; ইহার নাম করিলে আপনা হইতে মনোমধ্যে উৎকর্ষসূচক ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই জন্যই আমরা শ্রেষ্ঠ কবিকে "কবিরত্ন", শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকে "স্ত্রী-রত্ন" বলিয়া থাকি। বিক্রমাদি-ত্যের "নবরত্ন" এই উৎকর্ষার্থের উজ্জ্বল উপমাস্থল। রত্ন শব্দ যেমন উপমাস্থলে কান্তগুণ-ব্যঞ্জক, সিংহ শব্দ সেইরূপ দৈহিক শক্তি, বীর্য্য, পরাক্রম প্রভৃতির পরিচায়ক। সেই জন্য সমর-কুশল রাজপুতগণের মধ্যে "সিংহ" উপাধি প্রচলিত আছে। খ্যাতনামা গুরু-গোবিন্দ তাঁহার শিখ শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়-সূচক সিংহ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই রূপে যুদ্ধবিশারদ বীরগণ সিংহের [illegible] প্রতিভাত হইয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস [illegible] রঘু [illegible]

"শ্রুতস্য [illegible] কথার ব্যবহার করিয়া থাকি। অরণ্যের সহিত

স্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ। [illegible] অর্থ প্রকাশ

অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবি- [illegible]প বহুলোক

চ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্॥ [illegible] উপমাগত

নামে কবিত্ব থাকিবারই কথা। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করি[illegible] বলিয়া ধরাতলকে স্পর্শ করে, তখন লোহিত, শ্বেত বা পীতবর্ণের পু[illegible]ভাত মণির ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। এই মনোহর দৃশ্য অব[illegible] [illegible]মণি' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সন্ধ্যা এই মণি যে

জিনিসটী আমার দেখিতে ভাল লাগে না, যে ব্যক্তিকে দেখিলে আমার ক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্দীপনা হইয়া বিরক্তির উদয় হয়, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে "চক্ষুশূল" বলিলে কেমন বিশদরূপে মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা চক্ষুর শূল তাহা দেখিলে কষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি "উনি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন"; এখানে বিরূপ শব্দের প্রতিকূল অর্থেও কবিত্বের ছায়া আছে। বিরূপ বিশ্রী; যে যাহার প্রতি বাম, সে তাহাকে দেখিলে আর তাহার প্রসন্ন-ভাব থাকে না, মুখ যেন অপ্রসন্ন হইয়া আইসে, চক্ষু ললাট প্রভৃতিতে আন্তরিক ক্রোধের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং সে মুখের আর শোভা থাকে না; সে ব্যক্তি যথার্থই বিরূপ হইয়া উঠে।

এখন বলিতে পারা যায় যে, মনুষ্য জন্মকবি; মনুষ্যের হৃদয়ে নানা রসভাব স্বভাবতঃই উদিত হইয়া থাকে। সকলে যদিও সুললিত কবিতা রচনা করিতে সমর্থ নহেন, তথাপি কল্পনাচিত্রিত মনোজ্ঞ দৃশ্যে সকলেই প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সকলের হৃদয়েই তৎকালোচিত ভাবপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে। কবিতা যে, ভাবদ্যোতক, কবিতা যে, মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মনুষ্যের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয়ে ভাষা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভাষা-চিত্র-পটে মনুষ্য-কল্পনার মনোজ্ঞ দৃশ্য সর্ব্বত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। শব্দসমূহে সুন্দর উপমা-শ্রেণী এখনও বিরাজমান আছে। যদিও কালসহকারে উহাদের কিয়ৎপরিমাণে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তথাপি উহারা আদৌ শব্দের সহিত এরূপ সম্মিলিত যে, উহাদিগের সম্যক্ উচ্ছেদ কদাচ সম্ভবপর নহে। শব্দের অবস্থিতির সহিত উহাদিগের অবস্থিতি চিরসম্বদ্ধ, অনেক শব্দে আরণ্য কুসুমের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে মধুর কবিত্ব বিরাজিত আছে; আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শব্দ শিক্ষা করিলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতে পারি। মৃত্তিকাখননে ভূগর্ভস্থ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুরাশি হস্তগত হইলে যত না আনন্দ হয়, শব্দসমূহে পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত জ্ঞানরত্নের উদ্ধার করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। সংসারের প্রয়োজনসাধন মাত্র ভাষার উদ্দেশ্য নহে; এতদ্দ্বারা আমাদিগের অন্যান্য সদ্বৃত্তির পরিশোধন করাও ইহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। কোন মহাত্মা ভাবপূর্ণ রসাত্মক শব্দকে "আত্মার বায়ু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেহেতু সেরূপ শব্দ না থাকিলে আমাদিগের আত্মা স্রোতোহীন জলরাশির ন্যায় স্তম্ভিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

পরিভাষা।

— রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক।

সম্পাদক মহাশয় প্রেরিত রামেন্দ্র বাবুর রাসায়নিক পরিভাষা পাইয়া প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল যে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের অংশ মাত্র, কিন্তু পরে ইহার মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পাঠে বুঝিলাম যে, আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রও এরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমতঃ রামেন্দ্র বাবুর নামে, দ্বিতীয়তঃ সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পরিভাষা খানি একবার দেখিলাম, যদিও জলস্রোত নূতন বটে, তথাপি দুই চারিটা খড়কুটা ভাসিয়া যাইতে বোধ হইল। বিশেষ এমন একটি বিষয় চোখে আসিয়া পড়িল যে, পরিভাষা খানি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। এবিষয়ে রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার মতভেদ আছে। রামেন্দ্রবাবুর নির্দ্দিষ্ট কোন কোন শব্দ কতদূর সুশ্রাব্য হইয়াছে, বলিতে পারি না। যাহাহউক যখন ঐসকল কথাও পরিভাষা রূপে সাধারণের গোচরার্থে মুদ্রিত হইয়াছে, তখন আমিই বা কেন আমার অভিমত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই?

Oxide এর অনুবাদ করা হইয়াছে "দগ্ধ", কিন্তু "দগ্ধ" অর্থে "পোড়া" আর Oxide অর্থে ভস্ম। যথা—Iron oxide "লৌহভস্ম", Copper oxide "তাম্রভস্ম", Mercury oxide "পারদভস্ম", Gold oxide "স্বর্ণভস্ম", Silver oxide রৌপ্য বা রজতভস্ম ইত্যাদি। অনেক কথাই তো প্রচলিত আছে, তবে কেন "দগ্ধ" বলিব? আমার মতে ভস্ম বলাই ভাল, তাহা হইলে Oxygen ও Oxidation এর কি অনুবাদ করা উচিত? মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের অভিধানে দেখিলাম Oxidation অর্থে "ভস্মীকরণ" রহিয়াছে, তাহা হইলে Oxygen এর পরিবর্ত্তে "ভস্মজান" করিলে ইংরেজী নামের সহিতও অনেকটা মিল রহিল এবং অভিধানও বজায় রহিল। অতএব আমার মতে Oxygen এর পরিভাষা "দহক বায়ু" অপেক্ষা "ভস্মজান" করিলে ভাল হয়।

চিরপ্রচলিত কথার হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া একটা নূতন কথার সৃষ্টি করার পক্ষে আমি বড়ই বিরোধী। রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম অনুবাদের সময় হইতেই Hydrogen কে "উদজান" বলিয়া আসিতেছি, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সমার্থবোধক দুরুচ্চার্য্য "অজনক" বলিতে আমি বড়ই কুণ্ঠিত। অজনকের পরিবর্ত্তে "উদজান" থাকিলে কি মন্দ হয়? এবং ইহার oxide কে "দগ্ধাজনক" না বলিয়া "ভস্মোদ্‌জান" বলিলে কি ক্ষতি হয়? "অজনকের" পরিবর্ত্তে "উদজান বলিলে জিহ্বারও অনেক কষ্টের লাঘব হয়।

Nitrogen কে "ম্রিয়তে অনেন" এই অর্থে মরুতক বলা হইয়াছে, কিন্তু Nitrogen

এর যে প্রাণ নাশ করিবার ক্ষমতা আছে, কে বলিল? Nitrogen প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, তাই বলিয়া Nitrogen কি বিষাক্ত পদার্থ? আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রতি নিশ্বাসে কত পরিমাণে Nitrogen গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা কে না জানে? Nitrogen এর কোন গুণ নাই। Nitrogen পোড়াইতে পারে না, প্রাণ বাঁচাইতে পারেনা, ইহাকে পরীক্ষা করিবার বিশেষ কোন উপায় নাই; যখন অন্য কোন বায়ু না হইবে, তখন বুঝিব ইহা Nitrogen। যদি Nitrogen কে প্রাণহৃৎ বা মরুতক বায়ু বলা যায়, তাহা হইলে জলকেও প্রাণহৃৎ পদার্থ বলা উচিত, যে কারণে Nitrogen এ ডুবাইলে প্রাণিগণ বাঁচিতে পারে না, সেইকারণে জলে ডুবাইলেও প্রাণিগণ বাঁচে না। বরং আমার বিবেচনায় Nitrogen না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। যদি Oxigen এর সহিত চারি ভাগ Nitrogen মিশাইয়া পাতলা করা না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইত। বিশুদ্ধ Oxygen এর মধ্যে প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব, উহার তেজঃ বা তীব্রতা কমাইবার জন্যই Nitrogen এর সৃষ্টি। জল না থাকিলে যেরূপ তীব্র আহার বা ঔষধ সকল ব্যবহার একবারে অসম্ভব হইত, সেই রূপ Nitrogen না থাকিলে Oxygen এর ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া উঠিত। আরও এক কথা, Nitrogen আমাদের শরীরের একটী প্রধান উপাদান। আমরা Nitrogenous পদার্থ না খাইলে বাঁচিতে পারি না। জল না খাইলে বাঁচা যেমন অসম্ভব, Nitrogenous পদার্থ ব্যতীত শরীর পুষ্টি করাও সেই রূপ অসম্ভব। জানি না, আমাদের ত্বকের এমন কোন গুণ আছে কি না, যদ্দারা আমরা এই বায়ুসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়া, আমাদের প্রয়োজন মত Nitrogen টানিয়া লইতে পারি। মৎস্য সকল যেমন জলের সহিত মিশ্রিত বায়ু হইতে Oxygen টানিয়া লইতে পারে, উদ্ভিদ্ সকল পত্র দ্বারা যেমন তাহাদের শরীর পুষ্টির জন্য বায়ু মিশ্রিত অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার টানিয়া লইতে পারে, আমরাও তেমন ত্বক দ্বারা জল শোষণ করিতে পারি। সকলেই জানেন যে, তৃষ্ণার সময় স্নান করিলে তৃষ্ণা দূর হয়; হিমে বেড়াইলে সর্দ্দি হয়, এই রূপে আমরা ত্বক দ্বারা বায়ু হইতে Nitrogen টানিয়া লইতে পারি না, কে বলিল? আমার বিবেচনায় যবক্ষার প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে যবক্ষারজান বা যবজান না বলিয়া জীবজান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু ডাঃ রাজেন্দ্র লালের প্রাণহৃৎ শুনিয়া Nitrogen এর এত উপকারিতা ভুলিয়া একবারে "ম্রিয়তে অনেন" বলিয়া ধার্য্য করিলেন। "যবজান" বলিলে কি দোষ হয়? পূর্ব্বের দুইটীর সহিত ইংরেজী নামের মত কি বেশ মিল থাকেনা? নুতন শব্দ প্রচলিত করিতে হইবে বলিয়া পুরাতনের উপর এত অনাদর করিলে চলিবে কেন? "যবজান" ব্যবহার করিতে বিশেষ আপত্তি, পাছে যৌগিক শব্দ যবন হইয়া পড়ে। ত্রিবেদী মহাশয় যবনের বড়ই বিরোধী; আমরাও তাই। তবে শেষ টুকু কাটিয়া "যব", "যবক" বা "যাবক" ব্যবহার করিতে চাই; অর্থাৎ Nitrous

Acid কে "যবদ্রাবক" ও Nitric Acid কে "যবক দ্রাবক" বলিলে ত্রিবেদী মহাশয়ের "গন্ধ দ্রাবক" এর সহিত বেশ মিলও থাকে। Oxygen কে "অম্লজান" Hydrogen কে উদজান, ও Nitrogen কে "যবজান" বলিলে অসঙ্গত হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয় যবন শব্দে "অকারণে একটা জাতি বিশের নাম আনিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর মনে ধাঁধা জন্মাইতে পারে" বলিয়া 'যবজান' পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুতক করিয়াছেন। এরূপ হইলে chlorine কে হরিণ বায়ু বলিয়া প্রাণিবিশেষের নাম বসাইয়া ঐরূপ ধাঁধা দিবার প্রয়োজন কি? রাধিকা বাবু ইহাকে হরিতীন বলিয়াছেন; সেটী বজায় রাখিতে ক্ষতি কি?

Bromine এর বর্ণ রাঙ্গা বলিয়া ইহাকে "অরুণক" বলায় আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই, তবে নামটা যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে সেটা বড় ভাল লাগিল না। Bromine এর বর্ণ লোহিত, বালার্কের বর্ণ লোহিত, বালার্কের নাম অরুণ অতএব Bromine এর নাম "অরুণ" বা "অরুণক" রহিল; শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকা প্রদর্শন করা হইয়াছে। সোজা কথায় 'লোহিতীন' বলিলে কি হয়? হরিতীন ও নীলীনের সঙ্গে মিল থাকেনা কি? তবে Lithium এর পরিবর্ত্তে লোহিতক না বলিয়া আর একটা কিছু বলা চাই। আর যদি এটা ঠিক্ থাকে, তাহা হইলে ওটাকে বদ্‌লাইতে হয়। Bromine এর বর্ণ রাঙ্গা, ব্রহ্মার বর্ণও রাঙ্গা; রামেন্দ্র বাবুর মতে যখন ব্যাকরণ ছাড়িয়া দিলেও চলে তখন Bromine কে "ব্রহ্মীন বলিলে কেমন হয়? নামের বেশ মিল থাকে; যেন ঠিক অক্ষরান্তরিত করা হইয়াছে। আর নামের সার্থকতাও কতকটা বজায় থাকে। আরও এক কথা, এবার যৌগিক শব্দ আর যবন না হইয়া; হয়ত ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িবে।

Iodine এর নাম "নীলীন" বেশ হইয়াছে। যখন Halogen বংশের তিনটীর নাম "ঈন্" ভাগান্ত হইল, তখন Fluorine এর কি অপরাধ? Fluo to flow এই অর্থে Fluorine এর নাম। Fluorspar পদার্থটীর কার্য্য দ্রব করা; তবে আমরা Fluorine কে কেন "দ্রবীন" করি না? নামের সার্থকতাও থাকে, অপর তিনটীর সহিত মিলও থাকে। আর 'দীপক' শব্দে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমনি একটা কিছু Phosphorus এর মত দ্রব্য বুঝায়। আমরা Phosphorus কে 'দীপক' বলিব। একান্তই যদি Fluorine কে "দীপক" বলিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে 'ক' কাটিয়া 'ঈন্' করিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ Fluorine কে 'দ্রবীন' বা 'দীপিন' বলিলাম, এখন রামেন্দ্র বাবুর অভিরুচি।

Carbon কে অবশ্যই "অঙ্গার" বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিরপ্রচলিত কথা তুলিয়া দিতে আমি বড়ই নারাজ।

Silicon কে 'সিকতক' বা 'সৈকত' বলিতে পারা যায়। সোহাগার যখন সংস্কৃত নাম টঙ্কন চলিত আছে, তখন Boron কে 'টঙ্কনজ' বা "টঙ্কনক" বলিতে ক্ষতি কি?

এবং Boric এর পরিবর্ত্তে "টাঙ্গনিক" ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। কথাটা যদি সুশ্রাব্য না, হয় তবে Boron কে "শোধক" বলিলে কিরূপ হয়? কারণ ধাতু শোধন করা সোহাগার প্রধান গুণ। 'বোরক' শব্দটা যে, না হিন্দু না মুসলমান।

Sulphur কে অবশ্যই "গন্ধক" বলিব। Selenium ও Tellurium এর বদলে 'সোমক' ও 'ভৌমক বেশ হইয়াছে।

Phosphorus এর প্রধান ব্যবহার দিয়াসালাই প্রস্তুত করা, আমরা সেই কারণে ইহাকে 'দীপক' বলিতে চাই। 'স্ফুরক' বলিলে যেন ফুটিয়া উঠা বুঝায়, কতক্টা Effervescent এর ভাব আসিয়া পড়ে। "স্ফুরক" বলিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই, তবে "দীপক" বলিলে ভাল হয়।

সচরাচর বিষ প্রয়োগে প্রায়ই Arsenic ই ব্যবহৃত হয়। এই বার রামেন্দ্র বাবুর "ম্রিয়তে অনেন" ধরিয়া ইহাকে "মরুতক" বলিলে কেমন হয়? হরিতালে Arsenic আছে বলিয়া ইহাকে 'তালক' বলায় আমার বিশেষ কোন আপত্তি হইতে পারে না, তবে 'মরুতক' বলায় যদি বিশেষ কোন অনিষ্ট না হয়, এবং 'তালক' না বলিয়া যদি ব্যাকরণ ও অভিধানের মান বজায় রাখা যায়। অধিকন্তু এবং উভয়েরই যখন Arsenic এর নামের সহিত মিল নাই, তখন 'মরুতক' বলায় ক্ষতি কি? কিন্তু 'সেঁকো' ই বেশ কথা, 'সেঁকো' বলিলে সকলেই Arsenic কে বুঝিয়া থাকে। এও যদি ভাল না লাগে, তবে 'আর্সেনিক' বলিলে তো দোষ হয় না। Platinum ও Nickel এর নাম চলিত বলিয়া যখন অক্ষত রাখা হইয়াছে, তখন Arsenic কে এত বিকৃত করিবার আবশ্যকতা কি? Arsenic কথাতো সকলেই জানে, বিশেষ আজ কাল হোমিওপ্যাথির দৌলতে বোধ হয় Platinum অপেক্ষা Arsenic বেশী চলিত কথা।

Antimony র প্রতিশব্দ 'অঞ্জনক' বেশ হইয়াছে। Bismuth কে যখন অক্ষরান্তরিতই করিতে হইল, তখন "বিস্মিতক" না করিয়া 'বিস্‌মুথক' করিলে কি হয়।

Vanadium কে 'বনাটক', Niobium কে 'নবক' এবং Tantalum কে "তন্তলক" বলায় মন্দ হয় নাই, প্রায় যেন অক্ষরান্তরিত করা হইয়াছে, আর ধাতুগুলি প্রায় পাওয়া যায় না, যদৃচ্ছা ক্রমে নাম দিলেও ক্ষতি নাই।

Sodium কে "সর্জ্জিক" না বলিয়া "সোডা" বলিলে সাধারণতঃ সকলে বেশ বুঝিতে পারে, তবে "সোডা" বলিলে "Carbonate of Soda" কে বুঝায়, আর "সর্জ্জিক" বলিলেও ঠিক ধাতুকে বুঝায় না। সাজিমাটী ক্ষার পদার্থ, ক্ষার বলিলে সচরাচর সাজি মাটীকেই বুঝায়; এই ক্ষার হইতে Sodium পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে "ক্ষারজ" বলিলে কি হয়? তবে এত সাধের "সর্জ্জিক" ছাড়িয়া সোজাসুজি "ক্ষারজ" না বলিতে চান, নাচার।

যেরূপ Sodium কে আমরা 'ক্ষারজ' বলিলাম, সেইরূপ Potassium কে 'পত্রক',

না বলিয়া "পাংশুজ" বলিতে চাই। পাংশু শব্দে ছাই, কাষ্ঠপত্রাদি পোড়াইয়া যে ছাই হয়, উহাকে পাংশু বা চলিত কথায় পাঁশ বলিয়া থাকে। উহা হইতে পাওয়া যায় বলিয়া Potassium কে "পাংশুজ' বলিলে বোধ হয়, বিশেষ কোন দোষ হয় না।

Rubidium কে 'রূপদক' বলায় মন্দ হয় নাই। Cæsium কে 'কশ্যপ' করিতে অনেক দূর যাইতে হইয়াছে। কোথায় 'আসমানি' রং, আর কোথায় ইন্দ্রের পিতা। একবারে ভূলোক হইতে ইন্দ্রলোক। সহজ কথায় 'শ্যামক' বলিলে চলে না কি? ক্ষুদ্র বিবেচনায় 'শ্যামক' স্থির করিলাম।

Lithium এর কথাতো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। Bromine কে 'লোহিতীন' করিয়া Lithium কে 'অরুণক' করিতে চাই। তাহা হইলে Rubidium রূপদক, Cæsium শ্যামক; আর Lithium অরুণক, কথা কয়েকটীর বেশ মিল হইল। আর Lithography অর্থে 'শিলা মুদ্রাঙ্কন', Lithos অর্থে শিলা অতএব Lithium কে 'শৈলজক' করিলে কেমন হয়?

Calcium চূণ হইতে পাওয়া যায়, এজন্য ইহাকে 'চূর্ণজ' বা 'চূর্ণজক" বলিলে কি আর কিছু বুঝায়? 'খটিক" বলিলে খড়ী বুঝায়। যে অর্থে যেটী চলিত আছে, তাহার অর্থ বদলাইয়া নূতন অর্থে ব্যবহার করিতে হইলে কিছু গোল ঘটে। লাবোসিয়ার রাসায়নিক নামকরণ কালে চলিত কথাকে ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন নাই। তবে বাঙ্গালায় লাবোসিয়ারের পথাবলম্বী হইতে কোন ক্ষতি দেখা যায় না।

Barium, Strontium, Magnesium, Manganese এবং Beryllium সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই।

Zinc = যশদ।

Cadmium ও Zinc এর মধ্যে যখন অনেক সাদৃশ্য আছে, তখন নামের সাদৃশ্য ও না থাকিলে ভাল দেখায় না। দস্তাকে যদি 'যশদ" বলা হয়, তাহা হইলে Cadmium কে আমি "উপযশদ" বলিতে চাই।

Copper = তাম্র, Mercury = পারদ, Silver = রজত বা রৌপ্য, Gold = স্বর্ণ, সুবর্ণ বা হেম, হিরণ্য শব্দে আর কাজ নাই; Lead = সীসক, Molybdenum = মলীমস Tin = রঙ্গ বা রাং, Iron = লোহ, বা আয়স, Nickel = নিকেল, Platinum = প্ল্যাটিনম্ Aluminium = ফটিক বা স্ফটিক।

পুরাতন সিন্ধুর অপভ্রংশে হিন্দু; উহা হইতে India কে হিন্দুস্থান বলিয়া থাকে; এই কারণে যদি Indium কে হিন্দিক বা হিন্দুক বলা যায়, তাহা হইলে যে তত ভাল হয়, বোধ হয় না, তবে সিন্ধুকটী বদলাইতে চাই, কারণ ঐ রকম কি একটা কথায় বাক্স বুঝায়; সেই কারণে বদলাইবার ইচ্ছা, নতুবা অন্য কোন কারণ নাই।

অপরাপর শব্দ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই; কারণ ধাতুগুলি এত অল্প

পাওয়া যায় এবং এত নূতন যে এখন যে কোন নাম দিয়া হউক, উহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

এখন বাকি সেই Cobalt। Cobalt অর্থে ভূত, প্রেত, ছাই, ভস্ম, যাই হোক, এখন আর সে কথায় কি কায? Nickel ও Cobalt দুইটী এক শ্রেণীভুক্ত ধাতু; একটির ইংরেজী নাম রাখিব, আর একটীকে একবারে কবিত্বপূর্ণ ভাবে ভাষান্তরিত করিব এ কেমন কথা। আর এক বিষয়ও রমেন্দ্র বাবুর ভাবা উচিত যে, নূতন শিক্ষার্থীরা এই রাসায়নিক ভাষাই প্রথম ও শেষ মনে করিয়া পড়িবে, তাহা নহে। অনেকেই আবার ইংরেজী ভাষায় যখন Chemistry পড়িতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদিগকে এই সকল নূতন নামের পরিবর্ত্তে আবার কতকগুলি নূতন নাম শিখিতে হইবে। সে সময় Nickel এর পরিবর্ত্তে নিকেল আর Cobalt এর পরিবর্ত্তে 'গুহ্যক' লইয়া একটা গোল পড়িবে। কারণ দুইটী ধাতুই এক শ্রেণীভুক্ত। আমার মতে Cobalt 'কোবল্ট' করিয়া রাখিলে কোন দোষ হয় না। বরং Cobalt ও Nickel দুই ভাইয়ের সমান মান বজায় থাকে। যদি একান্ত উহাকে দেশান্তরিত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 'কুবলক' বা 'কুবল' করিলে কি হয়? Cobalt Nitrate দিয়া অদৃশ্য মসী বা Lover's Ink প্রস্তুত হয়। উহা আগুনে তাতাইলে নীলবর্ণ হয়, এবং ঠাণ্ডা করিলে পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যায়। 'কুবলয়' অর্থে নীলোৎপল; এই রূপ নীলবর্ণ হয় বলিয়া উহাকে কুবলক বলিলে 'Cobalt' এর সহিত অনেকটা মিল থাকে। আস্‌মানি রং হইতে যদি কশ্যপ পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে নীলবর্ণের জন্য নীলোৎপল পর্য্যন্ত যাওয়া বোধ হয় বেশী কষ্ট-কর নয়। এও কিন্তু আমার ভাল লাগিল না, Cobalt কে Nickel এর মত অক্ষরান্তরিত করিলেই ভাল হয়।

মূল পদার্থ গুলির নাম লইয়া আমার যাহা বক্তব্য, বলিলাম। ইহাতে যদি ভাষার বা অন্য কোন প্রকার দোষ থাকে, সে কেবল আমার অজ্ঞতা। সমালোচনাটী যদি পাঠকবর্গের মনে লাগে, তাহা হইলে রামেন্দ্র বাবুর রসায়নের অন্যান্য নামগুলির বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, পরে বলিব। নতুবা এই শেষ।

শ্রীকালিদাস মল্লিক।

রাসায়নিক পরিভাষা।

গত বৎসর শ্রাবণ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গালা ভাষায় রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কাহাকেও তাঁহার প্রস্তাব আলোচনা করিতে এপর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁহার প্রস্তুত পরিভাষা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সুবিধা হইবে কি না, এখানে সংক্ষেপে তাহার বিচার করা যাইতেছে।

আমাদের দেশে মেডিকেল স্কুলসমূহে ইংরেজি রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন প্রথমে ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরিভাষা অবধারণ করিবার আবশ্যকতা হয়। কেহ বা যাবতীয় মূল ও যৌগিক পদার্থের ইংরাজী নাম অবিকল বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিবার পক্ষপাতী হন, কেহ বা সমুদয় নামের সংস্কৃতমূলক প্রতিশব্দ রচনা করিয়া আপনাকে শব্দসঙ্কলনে পারদর্শী মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ কোনটাই বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্ প্রবেশ করে নাই।

কোন কোন নর্ম্মাল স্কুলেও ইংরাজী রসায়ন বাঙ্গালায় শিখান হইত। এজন্য বিকট ইংরাজি নাম নর্ম্মালস্কুলের ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ করিতে হইত। কেহ কেহ উহাকে কোমল করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কৃত মূলক অব্যবহৃত শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তদবধি নানা কারণে মেডিকাল ও নর্ম্মাল স্কুল হইতে রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপনা উঠিয়া যায়। রাসায়নিক পরিভাষা নির্ণয়ও জটিল প্রশ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

রাসায়নিক কোন নামই এখন বাঙ্গালার কেহ শিখেন না? এমন নহে। পদার্থ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি দুই একটি বিজ্ঞানে Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Carbon, dioxidc প্রভৃতি দুই চারিটি পদার্থের নাম জানা আবশ্যক হয়। এজন্য কেবল ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষার্থিগণ উহাদের ইংরাজি নাম বা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ শিখিয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন অপর কেহ এই বিদ্যার সহিত বাঙ্গালা ভাষার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না।

কিন্তু দেশের অবস্থা চিরদিন এই প্রকার থাকিবে না, এমন আশা করা যায়। আশা করা যায়, কালক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় সমুদয় বিদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইবে। মেডিকাল স্কুলে এত দিন রসায়ন শাস্ত্র শিখান হইত না। এই বৎসর হইতে ঐ বিদ্যা পুনর্বার শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সময়ে রসায়নবিজ্ঞানের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

যে কোন বিজ্ঞানই হউক, তাহার পরিভাষা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি মূল নিয়ম নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাবে মূল নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশগত বা

জাতিগত পার্থক্য সম্বন্ধ যতদূর না থাকে, ততই কল্যাণ। * * কিন্তু বিজাতীয় শব্দ বাঙ্গালীর কানে বড়ই কঠোর ঠেকে; এবং বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণে পরাঙ্মুখ। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। * * সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে। * * এই (রসায়নশাস্ত্রের মূল ও যৌগিক পদার্থের) শতসহস্র নাম বাঙ্গালায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা বা সংস্কৃত মূলক বাঙ্গালা নাম প্রচলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। * * মনেকর, একটি ধাতুর ইংরেজি নাম Tungsten ও ইংরাজের ছেলেই বল, আর বাঙ্গালির ছেলেই বল, যে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এই শব্দের উচ্চারণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না। * * সুতরাং উহা যখন ইংরেজিতে চলিবে, তখন বাঙ্গালায় চলিবে না কেন? বাঙ্গালায় আবার উহার অনুবাদের প্রয়োজন কি? অক্ষরান্তরিত করিলেই যথেষ্ট।"

আমিও ঠিক ঐ কথা বলি। তবে আর Cobalt ধাতুকে "গুহ্যক", Iridium কে "হরিতক", Bismuth কে বিস্মিতক", Oxygen কে "অম্লজান", অম্লজনক "দহক" প্রভৃতি বলিবার প্রয়োজন কি? আমাদের বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রুতিযন্ত্র এত অপটু নহে যে, কোবল্ট, ইরিডিয়ম্ প্রভৃতি বলিতে বা শুনিতে তাহাদিগকে পীড়ন করিতে হয়। তাহাদিগকে বাঁচাইবার নিমিত্ত মূলপদার্থের ইংরাজি নামের ইতিহাস উদ্ঘাটনে ফল কি?

কিন্তু রামেন্দ্র বাবু উপরের মূল নিয়ম সর্ব্বত্র পালন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলেন, "সত্তরটা মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ পৃথিবীতে প্রভূতপরিমাণে বর্ত্তমান, এবং তাহারা আমাদের জীবনপ্রক্রিয়ায় ও আমাদের সাংসারিক কার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Carbon, Chlorine, Calcium, Sodium প্রভৃতি। এই সমুদয় জীবনের নিত্য সহচর পদার্থের জন্য খাঁটি বাঙ্গালা নাম আবশ্যক।"

দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। Oxygen কে অক্সিজেন বলিলে উহার সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ বিযুক্ত হইবে না। উহাকে অম্লজান বা অম্লজনক বলিলে ইংরাজি নামের দোষটুকু বরং বাঙ্গালাতে প্রবেশ করে। এই দোষ-পরিহারের নিমিত্ত অনেক বিচার করিয়া রামেন্দ্র বাবু উহার "দহক" নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। নামটি এত সুন্দর হইয়াছে যে, উহাকে ত্যাগ করিতে আপাততঃ ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যদি Oxygen নামক পদার্থবিশেষের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলেই চলিত, তাহা হইলে "দহক" নামের মমতা ত্যাগ করা সহজ হইত না। কিন্তু পদার্থটা দুই একটা মূল পদার্থ ব্যতীত অপর সমুদয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া বহুসংখ্যক Oxides এবং Hydroxides নামক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। সুতরাং তৎসমুদয় যৌগিক পদার্থের বাঙ্গালা নামের সঙ্গে সঙ্গে "দহক" বা "দগ্ধ" আসিয়া পড়ে। আপাততঃ মনে হয় যে, যদি Oxygen = দহক একবার শিখিয়া রাখি, তাহা হইলেই কোন যৌগিক পদার্থের

নামে দহক বা দগ্ধ দেখিলেই Oxygenএর সংযোগ মনে হইবে। যদি তাহাই হইত, তবে সকল মূল পদার্থের এই প্রকার একটা না একটা সার্থক নাম অনুসন্ধান করা না যায় কেন? বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা রামেন্দ্র বাবুর নির্দ্ধারিত মূলভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

আবার সকল স্থলে "নিত্যসহচর" মূলপদার্থের সার্থক নাম সঙ্কলন করাও সম্ভব নহে। দেখিতেছি, রামেন্দ্র বাবু Chlorineকে "হরিণ", Potassiumকে "পত্রক" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, যদি সমুদয় "নিত্যসহচর" মূলপদার্থের ইংরাজি নামের পরিবর্ত্তে খাঁটি বাঙ্গালা নাম দিতে হয়, তাহাহইলে অধিকাংশ যৌগিক পদার্থের একপ্রকার খাঁটি বাঙ্গালা নাম হইয়া পড়িবে। বিজ্ঞানে জাতিগত বা ভাষাগত পার্থক্য রাখা বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু ফলে সেই পার্থক্যই আসিয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "পরিদগ্ধ মঙ্গলক", "হরিণ মঙ্গলক", "গন্ধ মঙ্গলক", "অঙ্গারকীয় মঙ্গলক" বিচার করুন। উহাদের ইংরাজি নামের সহিত কোন দূরগত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

এই "নিত্যসহচর" পদার্থসমূহের মধ্যে আবার কোন্ গুলিকে ধরা যাইবে, তাহাও নিশ্চয় করা সহজ নহে। প্রায় সকল মূল পদার্থের সংযোগজাত কোন না কোন বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়া থাকে। এটা তত আপত্তিজনক নহে বটে, এবং সাহস থাকিলে কোন নামেই আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু সকল স্থলে সাহসপ্রদর্শন দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, বরং দুঃসাহসে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ বাহাদুর প্রচলিত বাঙ্গালা অক্ষরের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া স্বয়ং উদ্ভাবিত একটা অক্ষরমালা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ সেই সকল চতুষ্কোণ ত্রিকোণ অক্ষর লিখিতে বা পড়িতে শিখেন নাই। কিন্তু বোধ হয়, মহারাজ বাহাদুর ভাবিয়াছিলেন যে, কালক্রমে একটা মহাতাবী অক্ষর দেশে চলিত হইবে।

এই ঘটনাটির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দশ জনে ইচ্ছা করিলেই দেশে কোন একটা বিদেশীয় বিদ্যার বাঙ্গালা পরিভাষা প্রচলিত করিতে পারিব না। যে উদ্দেশ্যে কোন বিদেশীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম সেই বিদ্যার বিদেশীয় পারিভাষিক শব্দও প্রায় অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, এখন কেবল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় রসায়ন শিক্ষা করিতেছে। ডাক্তারগণ যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ের সকলগুলিই রাসায়নিক পদার্থ। সুতরাং উহাদের বাঙ্গালা নাম শিখিলে কার্য্যসিদ্ধ হইবে কি? বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষিত ডাক্তারগণকেও ঔষধের ইংরাজি নাম ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে ইংরাজি নাম দিয়া ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে হইবে, ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত দেশীয় বা বিদেশীয় ডাক্তারদিগের সহিত ঔষধসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে হইবে, ঔষধালয় হইতে ইংরাজি নাম লিখিত ঔষধ আনিতে হইবে। ডাক্তারখানা হইতে Bismuth nitrate আনিবার সময় তথায় "মরুতকীয় বিস্মিতক" বলিলে ঔষধ পাইবে কি?

এইরূপ ফটোগ্রাফার ব্যবসায়ের জন্য দোকানে গিয়া "হরিণ হেমক" বলিলে Gold chloride পাইবে কি? আতসবাজিকর Potassic chlorate না বলিয়া "হরিণকীয় পত্রক," গিল্টিকর Potassic cyanide পরিবর্ত্তে "শ্যামৎ পত্রক খুঁজিলে কোথাও পাইবে কি? অথচ মনে করুন যেন, ইহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল বাঙ্গালা নাম সম্বলিত রসায়ন শিক্ষা করিয়াছে। ইহাদের রসায়নবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা কার্য্যতঃ বড় একটা উপকার হইবে না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতায় কোন কোন বাঙ্গালী বিদেশীয় রাসায়নিক প্রণালীতে কয়েকটি দেশীয় উদ্ভিদের সার প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু দেখিতেছি তাঁহারা বিজ্ঞাপনে ঔষধের ইংরাজি নাম দিতেছেন। ইংরাজি নাম ব্যবহার করিবার অবশ্য বিশেষ কারণ আছে। নতুবা সামান্য অনন্তমূলের দ্রবসার না বলিয়া তাঁহারা বিকট ইংরাজি নাম কেন দিতেছেন।

কেবল যে এখন ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা বশতঃ দেশীয় পদার্থের বিদেশীয় নাম ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা ঘটিতেছে, তাহা নহে। প্রাচীন কালে বিদেশ হইতে ফলিত জ্যোতিষ এদেশে প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে কত যাবনিক শব্দ চলিয়া আসিয়াছিল। এই সকল শব্দের কয়েকটার সংস্কৃত নাম ছিল। তথাপি প্রাচীনেরা যাবনিক নাম ব্যবহার করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, যাবনিক শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিতে চেষ্টাও করেন নাই।

আর এক কথা আছে। মূল পদার্থের নাম গুলি অবিকৃত রাখা যত আবশ্যক, উহাদের সংক্ষিপ্ত নাম গুলিও তদবস্থায় রাখা তেমনই আবশ্যক। মূলপদার্থের ইংরাজি নামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা নামের কেবল সাদৃশ্য রক্ষা করিলেই চলিবে না। উভয় ভাষায় উহাদের সংক্ষিপ্ত নাম একভাবে রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই। মুদ্রিত দুই এক খানি বাঙ্গালা রসায়ন গ্রন্থে ইংরাজি অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে মধ্যে ইংরাজি অক্ষর দেখিলে কেমন কেমন ঠেকে। এজন্য শিক্ষার্থিগণকে ইংরাজি বর্ণমালা শিখিতে হয়। তাহাদিগকে এই অতিরিক্ত ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতে হইবে, অথচ বাঙ্গালায় সংক্ষিপ্ত নাম গুলির সহিত ইংরাজি নামের সাদৃশ্য থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে। এইখানেই পরিভাষাপ্রণয়ন দুষ্কর বোধ হয়। যাহা হউক, ইংরাজি নাম গ্রহণ করিলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই উভয় ভাষার সংক্ষিপ্ত নামের উচ্চারণসাদৃশ্য রক্ষিত হইতে পারে। উভয় ভাষার বর্ণমালা যখন এক নহে, তখন সংক্ষিপ্ত নামের আকার গত সাদৃশ্য রক্ষিত হইতে পারে না।

অতএব নানা দিক্ বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রাসায়নিক বিজ্ঞানের ন্যায় সাঙ্কেতিক বিদ্যার পরিভাষাপ্রণয়ন সময়ে দেশীয় ভাষার প্রতি মমতা খর্ব্ব করিতে হইবে।

যত কম পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরাজী নামগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান্ হওয়া উচিত। রামেন্দ্র বাবুর মূলমতও তাই। কেবল বাঙ্গালীর বাক্ ও শ্রুতিযন্ত্রের অযোগ্যতা আশঙ্কা করিয়া গিয়া কিছু অধিক দূরে গিয়াছেন।

উপরে যে কয়েকটি কথা লিখিত হইল, তাহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমি রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তুত পরিভাষার কেবল দোষই দেখিতেছি। ঐ পরিভাষা প্রস্তুত করিতে তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে উদ্ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন। হয় ত কেহ বলিবেন যে, কোন বিষয়ের নিধন সহজ, কিন্তু বিধান সহজ নহে। কিন্তু আশা আছে যে, স্বয়ং কবি না হইলেও অপরের কবিত্বের সমালোচনা করিতে পারিব না, এ তর্ক আজকাল কেহ উত্থাপন করেন না। সব দিক্ রক্ষা করিয়া ইংরাজি রসায়ন বিদ্যার পরিভাষাপ্রণয়ন সহজ হইলে উহা এত দিন অসম্পন্ন থাকিত না। তবে মূল বিষয় নির্দ্ধারণ কতকটা সহজ মনে হয়।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আমার নিকটে যতটুকু ভাল বোধ হইতেছে, তাহা সহৃদয় পণ্ডিতবর্গের অবগতির নিমিত্ত লিখিত হইল।

যাঁহারা ইংরাজির একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারাও দুই এক খানি মুদ্রিত পুস্তকের সোডিক হাইপোসল্‌ফাইট, য়্যামোনিক ব্রোমাইড, য়্যাসিড প্রভৃতি বিকট নামগুলি বাঙ্গালায় দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না। তিনি ডাক্তারই হউন, আর কোন ব্যবসায়বুদ্ধিকুশল শ্রমজীবীই হউন, ঐ বিকট নামগুলির কথঞ্চিৎ কোমল আকার দেখিলে তুষ্ট বই রুষ্ট হইবেন না। এজন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি আমাদের কয়েকটি চিরাভ্যস্ত নাম ছাড়িয়া দিয়া অপর সমুদয় মূলপদার্থের ইংরাজি নাম একটু আধটু ছাঁটিয়া উহাদের কতকটা বাঙ্গালা আকার দেওয়া আবশ্যক। যতটুকু ছাঁটিলে উহাদের ইংরাজি আকার একবারে পরিবর্ত্তিত না হয়, নিকৃন্তনকার্য্য ততটুকু চলিতে পারে। বিকট উচ্চারণদোষপরিহারের নিমিত্ত নাম গুলির নূতন কলেবর দিলে শব্দের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

মূলপদার্থ সমূহের ইংরাজি নাম বিচার করিলে দেখা যায় যে,

(১) Gold, Silver ইত্যাদি কয়েকটি নাম পূর্ব্বকাল হইতে সামান্য ভাষায় চলিত ছিল। সেই চলিত নামেই উহারা রসায়নবিজ্ঞানে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু Gold, Silver প্রভৃতির বিশেষণ পদ সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। তদ্ভিন্ন, লাতিন ভাষাতেও উহাদের ঐ আকার নাই। এজন্য Gold = aurum, Silver = argentum নামে রসায়নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বহুপূর্ব্বকাল হইতে পরিজ্ঞাত আমাদের স্বর্ণ, রজত, লৌহ পারদ রঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ ইংরাজি কলেবরে দেখিতে ইচ্ছা হয় না। বোধ হয়, রসায়নবিজ্ঞানের পরিভাষাপ্রণয়ন সময়ে ঐ শব্দেরনামগুলির অস্তিত্ব না ঘটিলে সুবিধা হইত। তবে কথার মধ্যে এই যে, Gold = স্বর্ণ, Silver = রজত ইত্যাদি শব্দ রসায়নে না শিখিলেও সামান্য ইংরাজি ভাষাজ্ঞানেই বুঝিতে পারি। সুতরাং আমরা উহাদের সংস্কৃত

নামই ব্যবহার করিব। তবে কেহ কেহ সংস্কৃত নামের পাশে লাটিন নাম ও অন্ততঃ একবার দিবার প্রয়োজন স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, gold = স্বর্ণ, silver = রূপা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে তত গোলযোগের আশঙ্কা নাই।

(২) potassium, Sodium প্রভৃতি অনেকগুলি নামের শেষে um যুক্ত আছে। ঐ সকল মূল পদার্থের নামোল্লেখ সময়েই ঐ um টুকু যোগ করিয়া গুলি উচ্চারণ করিতে হয়। অপর পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যৌগিক হইলে um টুকু বাদ দেওয়া যায়। যথা potassic chlorate, sodic ... দেখিতে গেলে, পটাসি, সোডি মাত্র বলিলেই বাঙ্গালায় চলিতে পারে। এতে আকার কিঞ্চিৎ ছোট হয়, অথচ ফলে কোন দোষ পড়ে না। তবে গ্রীক horizon যেমন সংস্কৃতে হরিজ হইয়াছিল, potassium, sodium প্রভৃতির um টুকু রাখিয়া সংস্কৃত আকার দিবার বাঙ্গালায় প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, প্রায় সমুদয় ধাতুর নামের শেষে um আছে। আমরাও ধাতু বুঝাইতে ইকারান্ত নাম বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে পারি।

(৩) Carbon Boron প্রভৃতি কতকগুলি নামের শেষে *on* যুক্ত আছে। উহাদের যৌগিক পদার্থের নামে কোন কোন স্থলে *on* টুকু লোপ পায়। যথা, carbides. borates ইত্যাদি। কিন্তু যখন carbonic acid, carbonates ইত্যাদিতে *on* টুকু থাকে, তখন উহাদের নাম কার্ব্বণ, বোরণ ইত্যাদি রাখিলেই ভাল হয়।

(৪) Chorine, Bromine প্রভৃতি কয়েকটি নামের শেষে *ine* যুক্ত আছে। যৌগিক পদার্থে উহাদের *ine* টুকু থাকে না। যথা, chlorides, chlorates ইত্যাদি। এ সকল নামের *ine* টুকু বাদ দিয়া কেবল ক্লোর, ব্রোম ইত্যাদি বলিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

(৫) Hydrogen, oxygen, nitrogen. এই তিনটি নামের শেষে *gen* আছে। উহাদের যৌগিকের নামে *gen* টুকু থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে বাদ দিলে নামগুলি অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়ে। *gen* পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় "জনক" বা কেবল "জ" বসাইলে চলিতে পারে। এইরূপে Hydrogen = হাইড্রোজ, oxygen = অক্সিজ, nitrogen = নাইট্রোজ করা চলে। বাঙ্গালায় ড্র, ট্র ইত্যাদি বড় কটমটে লাগে। উহাদের পরিবর্ত্তে দ্র ও ত্র করিলে বিশেষ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে Hydrogen = হাইদ্রজ, oxygen = অক্সিজ, nitrogen = নাইত্রজ * করা চলিতে পারে। বাঙ্গালায় হাইদ্র, অক্সি,

* একখানি হিন্দিপুস্তকে nitrogen কে নেত্রজন বলিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক, নূতন শব্দ রচনায় বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা হিন্দি ভাষার ক্ষমতা অধিক। বাঙ্গালার দূরবীক্ষণ হিন্দিতে দূরবীণ হইতে পারিয়াছে। সে কথা থাক। অনেকে nitrogen কে বাঙ্গালায় যবক্ষারজান বলিয়াছেন। কিন্তু যব-

বা নাইত্র, ইহাদের কোন অর্থ নাই। সুতরাং ইংরাজি নামকরণের দোষ বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে না।

উহাদের যৌগিক Hydride হাইড্রেড, oxide=অক্সাইড, nitride নাইট্রাইড, ইত্যাদি দীর্ঘোচ্চার্য্য নাম গুলিকে একটু সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে। Hydride হাইদ্রিদ, oxide অক্সিদ, nitride নাইত্রিদ প্রভৃতি করিলে উচ্চারণ সাদৃশ্য অধিক বিনষ্ট হইবে না।

বিশেষ পরিশ্রম করিয়া nickel cobalt manganese প্রভৃতি কয়েকটি নাম কেহ বলিবেন যে, কোন [illegible] নহে। কিন্তু phosphorus=ফস্ফর nickel=নিকেলি, আছে যে, [illegible], manganese=মাঙ্গানিজি করা চলে। ধাতু বুঝাইতে যেমন আকারান্ত শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, তেমনই অধাতু × (nonmetals) বুঝাইতে অকারান্ত শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহার করিলে সুবিধা হইতে পারে।

উপরের কয়েকটি কথা স্বীকার করিলে মূলপদার্থ সমূহের বাঙ্গালা নাম নিম্নলিখিত মত হইবে।

Non-metals	Symbol	অধাতুর বাঙ্গালা নাম	সক্ষিপ্ত নাম
Hydrogen	H	হাইদ্রজ	হ
Chlorine	Cl	ক্লোর	ক্ল
Bromine	Br	ব্রোম	ব্র
Oxygen	O	অক্সিজ	ও
Sulphur	S	গন্ধক (শুল্বারি)*	শ
Selenium	Se	সেলিন	সে
Nitrogen	N	নাইত্রজ	ন
Phosphorus	P	ফস্ফর	প
Arsenic	As	আর্সেনি	আস
Antimony	Sb	আন্টিমণি(সৌবীরাঞ্জণ)†	সব্

ক্ষার ও সোরা এক পদার্থ কি? যবক্ষার potassic carbonate এবং সোরা potassic nitrate তাহা হইলে nitrogen যবক্ষার জান কেমন করিয়া হয়?

× উপধাতু শব্দটি antimony, chromium প্রভৃতির ন্যায় ধাতু ও অধাতু উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ বুঝাইতে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এরূপ করিলে সমুদয় মূলপদার্থ অধাতু, উপধাতু ও ধাতু, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। এরূপ বিভাগ দ্বারা ধাতু এবং অধাতু, এই প্রকার কৃত্রিম বিভাগের দোষ কতকটা খণ্ডিত হইতে পারিবে।

* সংস্কৃত শুল্বারি শব্দ হইতে নাকি sulphur শব্দটা হইয়াছে।

† antimony র সংক্ষিপ্ত নাম সব্ পাইবার জন্য সৌবীরাঞ্জন বলা গেল।

Silicon	Si	সিলিকন	
Carbon	C	কার্বণ ‡	কা
Potassium	K	পটাসি (ক্ষারক)	ক্ষ
Sodium	Na	সোডি	নে
Ammonium ?	Am	আমোনি ?	আম
Magnesium	Mg	মাগনেসি	মগ্
Calcium	Ca	কাল্‌সি	কা
Manganese	Mu	মাঙ্গানিজি	মং
Zinc	Zu	যশদ	যং
Iron	Fe	লৌহ	ফি
Mercury	Hg	পারদ (হিঙ্গুলজ)	হজ
Lead	Pb	সীস (প্রলম্ব)	পব্
Copper	Cu	তাম্র (কুপ্য)	কু
Silver	Ag	রূপা (আর্য্য)	আর্জ্
Gold	Au	স্বর্ণ (ঔষাবর্ণ)	ঔ

অনভ্যাস বশতঃ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত যৌগিকের রূপ (formula) এবং রাসায়নিক সমীকরণ একটু নূতন দেখাইবে। কিন্তু বোধ করি তাহাদিগকে দেখিলে ইংরাজির সহিত ঐক্য করিতে অধিক কষ্ট হইবে না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

3 cu+8 H No 3=3 cu (No 3)2+2 No+4 H2 o

৩ কু+৮ হনও ৩=৩কু (নও৩)২+২নও+৪হ২ও

4 p2+3 ca o2 H2+6 H2 o=2Ph3+3 ca (H2po2)2

৪ পং+৩ কাও২ হ২+৬হ২ও=২পহ৩+৩কা (হ২পও২)২
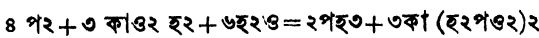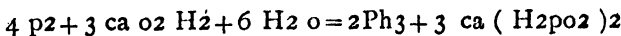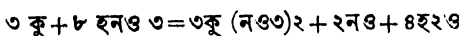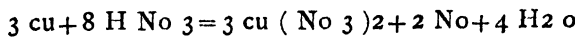
Acid এর বাঙ্গালা অম্ল চির প্রচলিত আছে। solvent=দ্রাবক, solution=দ্রবণ থাকে। Base এর বাঙ্গালা ঠিক ক্ষার হয় না। বাস্ত বলিলে চলে কি ? Basic carbonate

‡ carbon= অঙ্গার বলিলে charcoal এর বাঙ্গালা কি থাকিবে ? এজন্য carbon এর কোন বাঙ্গালা নাম আবশ্যক হইলে অঙ্গারক বলাই ভাল।

কয়েকটি ইংরাজি সংক্ষিপ্ত নামের সহিত বাঙ্গালা সংক্ষিপ্ত নামের সাদৃশ্য রক্ষা করিতে একটু গোলযোগ ঠেকে। ইংরাজি c (hard) এবং K উচ্চারণে এক বোধ হয়। বাঙ্গলায় উহাদের প্রভেদ করিবার সুবিধা নাই। এজন্য প্রচলিত ধাতু কয়েকটির বাঙ্গলা নামের নূতন সংস্কৃত আকার দিবার চেষ্টা করা গেল। তবে কুপ্য অর্থে স্বর্ণরূপ্য ব্যতীত নিকৃষ্ট ধাতু মাত্রেই বুঝায়। আর্য্য অর্থে Noble, White বুঝায়। Sodium—Natrum, Iron—Ferrum ইহাদের কোন সংস্কৃত আকার দিতে পারিলাম না।

=বাস্তব কার্বনেশ Alkali বলিতে ক্ষার বুঝি ; সুতরাং alkaline=ক্ষারবৎ বা ক্ষারীয় করিলে দোষ হইবে না। salts=ভস্ম বলিলে কেমন কেমন শুনায়। ভস্ম বলিলে oxide মনে হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে ভস্মীকরণ অর্থে oxidation বুঝায়। salts=লবন বলিলে দোষ নাই। sodic chloride বা common salt খাদ্য লবন বলিলেই যথেষ্ট। এখানে আর একটী কথায় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। রামেন্দ্র বাবু gas এর বাঙ্গালা "বায়ু" করিয়াছেন। কেহ কেহ gas কে বাষ্প বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে air বা atmosphere বুঝাইতে ভূ বায়ু বা আবহ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাঙ্গালায় এবং সামান্য সংস্কৃতে বায়ু অর্থে air বুঝায়। সুতরাং air এবং gas এর প্রভেদ বাঙ্গালা নামে ও রাখা কর্ত্তব্য।

উপরে যাহা বলা গিয়াছে তৎসাহায্যে কয়েকটি যৌগিকের বাঙ্গালা নাম দেওয়া যাইতেছে।

Hydrides	......	হাইদ্রিদ
Chlorides	......	ক্লোরিদ
Oxides	......	অক্সিদ
Sulphides	......	সল্‌ফিদ *
Monoxide	......	একাক্সিদ
Dioxide	......	দ্ব্যক্‌সিদ
Peroxide	......	পরাক্সিদ
Sesquioxide	......	সার্দ্ধাক্‌সিদ

ইত্যাদি

Acid গুলিকে Hydrogen salts বিবেচনা করিলে অম্লের নাম এই প্রকার দাঁড়াইবে।

Hydrogen nitrate		......	হাইদ্রজ নাইট্রেট বা নাইত্রেত
......	sulphate	......	সল্‌ফেট বা গন্ধেত
......	chloride	......	ক্লোরিদ

ইত্যাদি।

কিন্তু উহাদের চলিত নাম ত্যাগ করা সহজ হইবে না। sulphuric acid কে হাইদ্রজ শল্‌ফেট বলিলে সহসা বুঝিতে কষ্ট হয়। সুতরাং উহাতে শালফুরিক অম্ল বলাই ভাল। Hydrochloric acid প্রভৃতি Hydro যুক্ত acid এর বাঙ্গালা নাম ঐ প্রকার করিতে হইবে। ইংরাজিতে *ic* এবং *ous* ভাগান্ত দুই প্রকার অম্লের নাম আছে। বাঙ্গালাতে উভয়বিধ অম্লের পার্থক্য বুঝাইতে *ic* যুক্ত নামের শেষে "ক" যোগ করিলেই চলিতে পারে।

* গন্ধিদ করিলে কেমন হয় ? sulphated গন্ধেত, sulphites গন্ধিত।

Nitrous acid ...... নাইট্র (বা নাইত্র) অম্ল

Nitric „ ...... নাইট্রিক (বা নাইত্রিক)

এইরূপ যে সকল ধাতুর দ্বিবিধ যৌগিক হয় তাহাদের প্রভেদ বুঝাইতে ইংরাজি *ic* স্থলে "ক" ব্যবহার করা চলে। যথা,

Ferrous oxide ...... লৌহ অক্সিদ বা লৌহাক্সিদ

Ferric „ ...... লৌহক-অক্সিদ বা লৌহকাক্সিদ

অতএব লবন গুলির বাঙ্গালা নাম নিম্নলিখিত মত দাঁড়াইবে। যথা,

Mercurous chloride ...... পারদ ক্লোরিদ

Mercuric ... . পারদক ক্লোরিদ

Argentic nitrate ...... রূপ্য নাইট্রেট বা নাইত্রেত

Potassic nitrite ...... পটাসি নাইট্রিট বা নাইত্রিত

Lead sulphate ...... সীস শল্‌ফেট

Lead sulphite ...... সীশ সল্‌ফিট বা গন্ধিত

Calcid hypophosphite ...... কাল্‌সী উপফাস্ফিট

ইত্যাদি

ইংরাজি নামের উচ্চারণ সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া রাসায়নিক পদার্থের বাঙ্গালা নামকরণ সহজ কাজ। সুতরাং এ বিষয়ের অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। রামেন্দ্র বাবু organic chemistry র (জৈব রসায়নের) পরিভাষা প্রনয়নে হস্তক্ষেপ করেন নাই। করিলে দেখিতেন যে, তাঁহার প্রস্তুত পরিভাষানুসারে জৈব পদার্থের বাঙ্গালা নাম ইংরাজি হইতে কত স্বতন্ত্র বোধ হইত। 'নিত্য নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে।" সুতরাং পদার্থের নাম সমস্যা সহজ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। রসায়ন বিজ্ঞান শিখিবার সময় flaskretort প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন ঘটে। রামেন্দ্র বাবু উহাদিগকে বাঙ্গালার অনুবাদ করিতে বলেন। flask = কূপী, tort = তির্য্যক পাতন যন্ত্র ইত্যাদি কয়েকটি নাম থাকিলেও সকলস্থলে বাঙ্গালা অনুবাদ উপযোগী হইবে কিনা বলিতে পারি না। Burette, pipette প্রভৃতিকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ফল কি? মনে হয়, দেশের ভাষার এমন ক্ষমতা থাকিলে বোতল, গেলাস যগ মগ ব্যাগ চেইন প্রভৃতি চলিত না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দেশে সর্ভে স্কুলে বাঙ্গালায় জরিপ শিখান হইয়া থাকে। শিক্ষকেরা বাঙ্গালী, ছাত্রেরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালায় উপদেশ দেওয়া হয়, অথচ এপর্য্যন্ত কেহ chain, compass, theodolite, offset, set square bow pen প্রভৃতির বাঙ্গালা নাম চালাইতে চেষ্টা করেন নাই। উহাদের বাঙ্গালা নাম শিখিলে আমীনদিগের যে বিশেষ অসুবিধা ঘটে, তাহাও নহে। chain কে মান শৃঙ্খল, compass কে কর্কট যন্ত্র বলিলে তাহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। অথচ এপর্য্যন্ত ঐরূপ নামের প্রচলন কেন

হইল না, তাহা ভাবিবার বিষয়। বস্তুতঃ যে ভাষা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ সহজ হয়, সেই ভাষাই স্থায়িত্ব লাভ করে। ভাষাটা সংস্কৃত বা খাঁটি বাঙ্গালা হইল কি না, তাহা কেহ ভাবে না। আমরা প্রত্যহ কত আর্বি বা ফার্সি শব্দ ব্যবহার বা অপব্যবহার করি, তাহা স্মরণ করিলেই আমার কথা প্রতিপন্ন হইবে।

বস্তুতঃ যে সামগ্রী যে নামে বিদেশ হইতে আসে, সেই সামগ্রীর নামান্তর ঘটাইলে অসুবিধা বই সুবিধা হয় না। অবশ্য যাহার সংস্কৃত বা বাঙ্গালা নাম আছে সেখানে এরূপ তর্ক না উঠিতে পারে। কিন্তু অপর সমুদয় পদার্থের সংস্কৃত নাম দেওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। তবে tube=নল, pipe=চোঙ্গ, blowpipe=বাঁকনল এগুলি বহু প্রচলিত। কিন্তু flask, beaker প্রভৃতি পদার্থের বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা কোন ফল হইবে না। কোন পদার্থের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এক নাম এবং বিজ্ঞান মন্দিরে বৈজ্ঞানিকের জন্য আর এক নাম রাখায় ফল কি? নূতন জিনিষের সঙ্গে নূতন নাম আসিবেই। ইহাতে ভাষার পুষ্টি হয় এবং ইহার গতি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কোন লোক বা সমিতির নাই। অতএব নামগুলা যাহাতে অধিক বিকৃত না হয়, তদ্বিষয়ে পরিষদ যত্নশীল হইলেই তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামের প্রকৃত উচ্চারণগত প্রস্তাব।

বঙ্গভাষায় লিখিত প্রচলিত ভূগোল ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যে সকল ভারতবর্ষীয় নগরাদির ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের নাম দৃষ্ট হয়, তৎসমূহের অধিকাংশই সচরাচর অত্যন্ত বিকৃতভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়া থাকে। এক গ্রন্থে যে প্রদেশ "ঝালবার" বা "কাটিবার" নামে অভিহিত হইয়াছে, গ্রন্থান্তরে তাহাই "ঝালোর," "ঝল্লবর" বা "কাটিয়ার" নামে পরিচিত। "ভোঁসলে" ও "গায়কওয়াড়" নামক দক্ষিণাপথের রাজবংশদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে "ভনস্লা," "ভুঁস্লা," "ভোঁসলা" ও 'গুইকুমার" বা "গুইকবাড়" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছেন। "খড়কী" ও "খর্ডার" যুদ্ধক্ষেত্র এবং "ভাণ্ডার" জিলা বঙ্গীয় ভূগোল ও ইতিহাস গ্রন্থে যথাক্রমে 'ক্কির্কী" ও "কুর্দ্দালা" ক্ষেত্রে এবং "ভড়দা" জিলায় পরিণত হইয়াছে।

এই সকল নামের অধিকাংশ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হয় বলিয়াই যে উহাদের এইরূপ উচ্চারণগত বিকৃতি ও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ইংরাজ গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত উচ্চারণ অনুসারে বৈদেশিক ভারতীয় নামগুলি অধিকাংশ স্থলেই বিকৃত রূপে লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্ণেল টড সাহেবের লিখিত Bhimsi (ভীমসিংহ), Arsi (আরস সিংহ) ও Jeysi (জয় সিংহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও উচ্চারণ দোষে "মাধব রাও" ও "সদাশিব রাও"কে Madhab Rao ও Sewdasheo Rao এবং মহারাষ্ট্রীয় "মেহেন্দলে" উপাধিকে Mendlee করিয়াছেন। ভৌগোলিক নাম সম্বন্ধেও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত "মিরজ্" নগর প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা বাইয়ের রাজধানী "মহেশ্বর ক্ষেত্র" ইংরাজী গ্রন্থসমূহে প্রায়ই Merich ও Misir (মাইস্যার) নামে পরিচিত হইতে দেখা যায়। ইংরাজী ভূগোল গ্রন্থে, এমন কি বাঙ্গালীর রচিত ইংরাজী ভূগোল গ্রন্থেও 'ঢাকা" নগরী Dacca রূপে লিখিত হইয়া থাকে। এই কারণে, বঙ্গভাষানভিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় লেখকের গ্রন্থে বঙ্গীয় 'ঢাকা" নগরী "ডাকা" বা "ডাক্কা" নামে অভিহিত হওয়া যেরূপ স্বাভাবিক, বাঙ্গালী লেখকের হস্তে মহারাষ্ট্রীয় "মাধব রাও" ও মহেশ্বরক্ষেত্র "মধুরাও" ও "মিসির" ক্ষেত্রে পরিণত হওয়াও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ।

ইংরাজগণের উচ্চারণ বিকৃতির স্তায় তাঁহাদিগের বর্ণমালার দোষেও বহুসংখ্যক নামের

দুর্গতি ঘটিয়াছে। ইংরাজী বর্ণমালার ঠ, ঢ়, থ, ধ প্রভৃতি বর্ণের অসদ্ভাব বশতঃ চেষ্টাসত্ত্বেও ভারতীয় নামগুলি বিশুদ্ধরূপে লিখিতে পারা যায় না; এবং এক এক স্বরবর্ণের বিবিধ উচ্চারণ হেতু, সেই অবিশুদ্ধ রূপে লিখিত নামগুলি, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে পঠিত হইয়া, মূল হইতে অতিশয় দূরে গিয়া পড়ে। এই রূপে আমাদিগের বস্তুতঃ যে সুমি" (Mr. Bhide) মহোদয় বঙ্গীয় সংবাদ পত্রে " মিঃ ভাইদে " নামে অসুবিধা বইহইয়াছেন; এবং রাজপুতানার অন্তর্গত "মেওয়াড়" ও "মারওয়াড়" প্রদেশ না উঠিয়া গ্রন্থে Mewar ও Marwar রূপে লিখিত হইয়া, কোনও কোনও বঙ্গীয় গ্রন্থে "মেবার" ও "মারবার" ও কোনও গ্রন্থে "মিবার" ও "মরবর" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার উপর আর একটুকু বিপদ্ আছে। কখনও কখনও এই সকল বিকৃত নামগুলি অনভিজ্ঞ লেখকের হস্তে পড়িয়া তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত সংশোধন চেষ্টায় অধিকতর বিকৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ "মরুবর (মারওয়াড়)" ও "কুড়িগাঁ" (মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত Koregaon বা কোরেগাঁও) শব্দের উল্লেখ করিতে পারা যায়। এইরূপ আমাদের বোম্বাই হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ জষ্টিস রানাড়ে (Ranade) মহোদয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রথমতঃ "রাণাদে" ও পরে "রণদে" রূপে পরিচিত হইয়াছেন; এবং বাঙ্গালী "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়" (Mr Chatterjce) মহারাষ্ট্রে গিয়া "চাতরজী" হইয়াছেন।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌কে এই সকল অসামঞ্জস্যের নিরাকরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। পরিষদ্ উচ্চারণ বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি করিয়া ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী অভিজ্ঞ লেখকগণের সাহায্যে তত্তৎদেশীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নামগুলি সঙ্কলন করাইয়া পত্রিকায় প্রকাশিত ও তৎপ্রতি বঙ্গীয় লেখকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিলে, এই সকল বৈসাদৃশ্য বিদুরিত হইবার সম্ভাবনা। এই কার্য্যে আমরা পরিষদ্‌কে সহায়তা করিবার জন্য এস্থলে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস ও ভূগোল সংক্রান্ত কতিপয় নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। এই তালিকায় ঐ সকল নামের প্রকৃত উচ্চারণ জানা যাইবে। আমরা ক্রমশঃ এইরূপ অন্যান্য নামের প্রকৃত উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

১। ঐতিহাসিক নামের তালিকা।

প্রচলিত বাঙ্গালা গ্রন্থে উচ্চারণ গত বর্ণ বিন্যাস	দেশীয় ভাষায় উচ্চারণ অনুসারে বর্ণ বিন্যাস
অপাসাহেব	আপ্পা সাহেব।
উদজী পোয়ার	উদাজী পওয়ার।
কলুষ (সাম্ভাজীর মন্ত্রী)	কলুশা।
কুশোয়া (রাজপুত বংশ)	কছ্ওয়া।
কুণ্ডীরাও (Kundee Rao)	খণ্ডেরাও।
গুইকুয়ার	গায়কওয়াড়।

গুইক বাড়	গায়কওয়াড়।
চৌলুক্য	চালুক্য।
জাট	জাঠ।
জনকজী সিন্ধিয়া	জনকোজী শিন্দে।
জৈয়াজী সিন্ধিয়া	জয়াজী শিন্দে।
টুকাজী হুলকার	তুকোজী হোলকর।
তাঁতিয়া টোপী	তাত্যা টোপে।
তান্তিয়া ভীল	তাত্যা ভীল।
দাবারিয়া, দাবারি	দাভাড়ে।
দমজী গুইকবাড়	দামাজী গায়কওয়াড়।
ধনজী	ধনাজী যাদব।
ধুন্ধু পন্থ	ধোণ্ডু পন্ত।
নরোবার	নরওয়াড় ; নলওয়াড়।
ধুন্ধুপন্থ	ধোণ্ডপণ্ড।
পিণ্ডারী	পেণ্ঢারী।
পিলজী গুইকুমার	পিলাজী গায়কওয়াড়।
পেশবা	পেশওয়ে।
বামনী বংশ	বাহমনী বংশ। বা বাহ্মনী বংশ।
বলজী বিশ্বনাথ	বালাজী বিশ্বনাথ।
বালজী বাজীরাও	বালাজী বাজীরাও।
ভনস্লা, ভোঁসলা, ভুঁস্লা	ভোঁসলে।
মধুরাও	মাধব রাও।
মল্লজী	মালোজী।
মলহর রাও	মল্হার রাও।
মালীরাও (Mally Rao)	মালে রাও।
মাধাজী সিন্ধিয়া	মহাদজী বা মাধব রাও শিন্দে।
মহারাট্টা, মার্‌হাট্টা	মরাঠা।
রণজী সিন্ধিয়া	রাণোজী শিন্দে।
রাঠোর	রাঠোড়।
শিবজী	শিবাজী।

রাঘব	রাঘোবা।
শম্ভুজী	সাম্ভাজী।
শান্তজী	সন্তাজী।
শুকরাম বাপু	সখারাম বাপু।
হুলকার	হোলকর।

২। ভৌগোলিক নামের তালিকা।

প্রচলিত বাঙ্গালা গ্রন্থের বর্ণবিন্যাস	দেশীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে বর্ণবিন্যাস।
অমলনর	অমলনের।
অন্ধী	ঔন্ধ।
অনাগুণ্ডী	অনাগোন্দী।
আজন্তা	অজিণ্ঠা।
আমেদ নগর	অহম্মদ নগার।
আকলকোট	অক্কলকোট।
আর্গাম	আরগাঁও।
ইলোরা	ওয়েরূল। বেরূল।
ইন্দোর	ইন্দুর।
ইন্দ্রপুর	ইন্দাপুর।
ইলাবপুর	ইলিচপুর।
উজুগীর	উদ্‌গীর।
উমরখেদ	উম্বর খেড়।
ওয়ার্ গাম	বড়্ গাঁও।
কপর গাঁ	কোপর গাঁও।
কর্ম্মল	কর্ম্মালেঁ।
কল্‌হাপুর	কোহ্লাপুর।
করবর	কারওয়াড়।
কলবর্গা	কলবুর্গা।
কাটিবার, কাটিয়ার	কাঠিয়াওয়াড়।
কাম্বে (উপসাগর)	খম্বায়ৎ।
কিরকী	খড়কী।
কুর্দালা	খর্ডা।
কুড়ি গাঁ	কোরে গাঁও।
কুম্ভীর দুর্গ	কুম্ভেরী দুর্গ।

কৈলবারা (রাজপুতানা)	কৈলওয়াড়া।
কোলাবা	কুলাবা।
ক্ষীরপুর	খয়েরপুর।
খাণ্ডব	খাণ্ডোয়া।
গোলকুণ্ডা	গোবলকোণ্ডা। "(Gowalconda"—*Todd.*)
গোকক্ক	গোকাক।
গুজরাট	গুজরাথ।
গোওয়ালিয়র	গোয়াহ্লের।
গুহগড়	গুহাগর। গুহাঘর।
ঘোর নদী	ঘোড় নদী।
চিতোর	চিতোড়।
ছিঁদবর	চাঁদবড়।
জন্‌জী	জিঞ্জী।
জাঞ্জীর	জঞ্জীরা।
জ্বলন	জালনা।
ঝান্‌সী	ঝাঁশী।
Jhalone	জালবন।
টান্না	ঠাণে।
টালান্দা	তর্লোঁদে।
তাঞ্জোর, তঞ্জোর	তঞ্জাউর।
তালিকটা ; তেল্লিকোট	তালিকোট।
তালীগাঁও	তলেগাঁও।
তেলিঙ্গানা	তেলঙ্গণ।
দফলাপুর	ডফ্লেপুর।
দারুর	ধারুর।
Diu (cape)	দীউ।
ধুলিয়া	ধুলেঁ।
পরনর	পারনের।
পত্রী	পাথ্রী।
পন্দহরপুর, পাণ্ডুপুর	পন্ঢরপুর।
পিপড়ী	পিপ্পলি।
পণ্ডা (Ponda)	ফোঁড়। ফোঁড়া।

পুরৈন্দ	পুরন্দর।
ফলর্তাঁ	ফল্টণ
বরঙ্গল	বরঙ্গুল।
বর্গাম	বড়গাঁও।
বরদা, বরোদ্দ	বড়োদেঁ। বড়োদা।
বেরোচ	ভড়োচ।
বাঁশবরা	বাঁশওয়াড়া।
বঙ্গলরু	বঙ্গলোর।
বীড়নর	বিদনুর।
বিদর	বেদর।
বিরার, বেরার, বরার,	বহ্রাড়।
বেলগাম	বেলগাঁও।
বোর্শী	বার্শী।
ভড়দা	ভাণ্ডার।
ভাগ্যনগর	ভাগানগর।
ভাইবন্দী	ভিঁউণ্ডী।
ভিঙ্গরলা	ওয়েঙ্গুলেঁ, বেঙ্গুলেঁ।
ভুসবল	ভুসাওল।
মহাদ	মহাড়।
মঙ্গলেশ্বর	দঙ্গমেশ্বর।
মালখাইর	মলখেড়।
মাঞ্জির নদী	মাঞ্জ্রা নদী।
মাহোর	মাহুর।
মালিগাঁও	মালেগাঁও।
মারবার	মারওয়াড়।
মিবার, মেবার	মেওয়াড়।
মেধ	মেঢ়ে।
রাজবারা, রাজোয়ারা	রাজওয়াড়া।
রাইচর	রাইচুর।
লুণবর	লুণাওয়াড়া।
শাত্রীনদী	সাবিত্রী নদী (?)।
শীরপুর	শেরপুর ?

শ্রীগণ্ড	শ্রীগোঁদে।
সঙ্গমনর	সঙ্গমনের।
সেতারা, সিতারা	সাতারা।
সুরাট	সুরত।
সাতপুরা পর্ব্বত	সাতপুড়া।
হিঙ্গণহাট	হিঙ্গণঘাট।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

কবি উদ্ধবানন্দ।*

বঙ্গ-দেশের ও বঙ্গ-ভাষার অভ্যুদয়-বর্দ্ধনের কারণে যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে ধীর-পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে কর্ম্ম করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য-কাহিনী কি আশা-বিধায়নী নয়? এস্থলে আমরা বঙ্গীয় প্রাচীন ও নবীন—কবি-কুলকে ও গ্রন্থকার-গণকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কাহারও কাহারও অনুসন্ধান পাইবার নিমিত্ত অদ্য এখানে আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। এ পর্য্যন্ত যে ১৬ ষোল খানি পুঁথি পাইয়াছি, তাহার তালিকা পশ্চাৎ নিবদ্ধ করিলাম।

---

* সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (১৩০৩ সাল, ৫ই মাঘ তারিখে) এই প্রবন্ধটী, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

পুঁথির নাম।	প্রণেতার নাম।	পুঁথির সাল ও তারিখ।	বারের নাম।
১। রাধিকা-মঙ্গল	১। উদ্ধবানন্দ	১। ১২৩৪ সাল, ১০ই অগ্রহায়ণ	১। শনিবার।
২। শতস্কন্ধ-রাবণ-বধ	২। কৃত্তিবাস	২। ১২০৭ সাল।	
৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৩। নরোত্তম দাস	৩। ১২৩৮ সাল, ১৬ই আষাঢ়	
৪। প্রহ্লাদচরিত্র	৪। কৃষ্ণদাস	৪। ১২১১ সাল, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ	৪। মঙ্গলবার।
৫। সত্যনারায়ণের পাঁচালি	৫। ০	৫। ১২১৯ সাল, ১৯শে বৈশাখ	
৬। সুদামের উপাখ্যান	৬। "বিপ্র" পরশুরাম	৬। ১২৬০ সাল, ১৪ই কার্ত্তিক	
৭। সুদাম-চরিত্র	৭। কবিচন্দ্র	৭। ০ ০	
৮। প্রসাদ-চরিত্র	৮। "	৮। ১২৬৪ সাল, ২৬শে শ্রাবণ	৮। রবিবার।
৯। কুম্ভকর্ণের রায়বার	৯। "	৯। ১২১৯ সাল, ২৮শে বৈশাখ	৯। মঙ্গলবার।
১০। অঙ্গদ-রায়বার	১০। "	১০। ১১০২ সাল, ৩১শে আষাঢ়	১০। ঐ।
১১। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	১১। "	১১। ১২২০ সাল, ১[illegible]ই ভাদ্র।	
১২। শিবরামের যুদ্ধ	১২। "	১২। ১২৫৯ সাল, ১৮ ই মাঘ।	
১৩। অক্রূর-সংবাদ	১৩। "	১৩। ১১০০ সাল, ৫ ই ভাদ্র।	
১৪। রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন	১৪। "	১৪। ১২০৪ সাল, ১৭ আশ্বিন	১৪। রবিবার।
১৫। দিবা-রাস	১৫। "	১৫। ১০৯৫ সাল, ২৮ ফাল্গুন	০
১৬। ভক্তি-চিন্তামণি	১৬। বৃন্দাবনদাস	১৬। ০	০

এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও বিস্তর পুঁথির সন্ধান ও সংবাদ, আমাদের ক্রমশঃই শ্রুতিগোচর হইতেছে। যথা—"সুন্দর-বনের ইতিহাস" ইত্যাদি। চলিত কথায় প্রসিদ্ধই আছে—"নাড়ু নাড়ুলেই গুড়োঁ পড়ে"। এত দিন আমরা ঐ বিষয়ের তেমন অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না। সুতরাং তৎ-সংক্রান্ত কোন প্রকার সমাচারও আমাদের কর্ণমূলে আসিয়া উপস্থিত হইত না।

উপরে যে ১৬ যোল খানি পুঁথির তালিকা দিলাম, তন্মধ্যে কয়েক খানির প্রাপ্তির বিষয় দুই এক কথায় বলিতেছি। "পুরোহিত"-নামক মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তক, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্য প্রিয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আমাদিগকে কোন কোন পুঁথি দেখিতে দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমীপ হইতেও এক প্রস্থ পুঁথি আনিয়াছি। বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী বেলোতাড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় মহাশয়ও কোন কোন পুঁথি পাঠাইয়াছেন। তা ছাড়া আমাদের নিজের যত্নেও কতকগুলি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এ স্থলে বলা উচিত যে, এই তিন জনেই, পরিষদের সভ্য। এই অবসরে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঐ তালিকা হইতে অদ্য "রাধিকা-মঙ্গল" অর্থাৎ "শ্রীমতী রাধার জন্ম কথার" প্রসঙ্গ করিতেছি। উহার পত্র-সংখ্যা ৬ ছয়। উহার কবির নাম "উদ্ধবানন্দ"। এই উদ্ধবানন্দের কীর্ত্তি, পরিচয়, গোত্র-বৃত্তান্ত বা বংশ-তালিকা জ্ঞাত হইতে সকলেরই আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মিবার কথা। দেখা যাউক, সে দিকে অগ্রসর হইয়া কি করিতে পারা যায়।

"রাধিকা-মঙ্গলের" ১২৩৪ সালের একখানি প্রতিলিপি-মাত্র আমাদের অধিগত। সুতরাং প্রতিলিপির বয়ঃক্রম এখন ৭০ সত্তর বৎসর। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কবি উদ্ধবানন্দ, এই সময়ের বহু-পূর্ব্ব-বর্ত্তী। তিনি কত পূর্ব্বের লোক, নিঃসংশয়ে অবধারণ দুরূহ। নানা-কারণে আমাদের বোধ হয়, তিনি ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক। কেন না, তাঁহার রচনায় ইংরেজ-আমলের কোন তত্ত্ব, কোন পদার্থ, কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের নিদর্শন-মাত্রও নাই। কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, কখন আবির্ভূত হন, কখনই বা অন্তর্হিত হন,—ইত্যাদি বিষয়-সংক্রান্ত তাঁহার পরিচয়, তদ্গ্রন্থ-পাঠে পাইয়া থাকি। আমরা যে পুঁথি খানি পাইয়াছি, তাহার প্রতিলিপিতে লেখা রহিয়াছে—"১২৩৪ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা চারি-দণ্ড সময়ে" সমাপ্ত হয়। এই যে সূক্ষ্ম দর্শন, ও প্রকৃত-ব্যাপারের যৎ-কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞান, অনুলিপি দ্বারা জন্মিল, দুঃখের বিষয়, মূল কবির ভাগ্যে তাহার কিছুমাত্রেরও সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি নাই, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক) কবির নাম উদ্ধবানন্দ। নামটী নিতান্ত আধুনিক নয়। অথচ একটু বিশেষত্বের একটু নূতনত্বের সমাবেশ, ঐ শব্দে আছে। বর্ত্তমান কালের এক কথকতা-ব্যবসায়ীর প্রায় ঐরূপ সংজ্ঞা শুনিয়াছি বটে; তিনি কিন্তু ইহার কাব্যকার নহেন। আর, তাঁহার

নামের সঙ্গে "আনন্দ" শব্দের সংযোগও নাই। সুতরাং "উদ্ধবানন্দ" এই সমগ্র শব্দটী যে, উক্ত কথকের আখ্যা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। উদ্ধবানন্দের উপাধি কি ছিল, "রাধিকা-মঙ্গলের" মঙ্গলাচরণ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার নিদর্শন পাই নাই। সুতরাং তিনি কোন্ বর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, তৎ-পরিজ্ঞানের প্রত্যাশা কি? অন্যান্য কবির মত তিনি স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে "দ্বিজ" বা "দাস" বলিয়াও বিশেষিত করেন নাই।

(খ) উপাধি দেখিতে পাইলে, তাঁহার জাতি নিরূপণ করা যাইত। বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বসু, কি সেনগুপ্ত ইত্যাদি কোন উপনাম পাইলে তদীয় গোত্র-পরিচয় সহজে লব্ধ লইত। সত্য বটে, উপাধি জানিলেও, তাঁহার গাঁই প্রভৃতি অজ্ঞাত অবস্থায় লুক্কায়িত রহিত। তিনি কুলীন কি ভঙ্গ-ভাবাপন্ন, তাহারও চিহ্ন-জ্ঞাপক বিবরণ বা নির্দ্দেশক প্রমাণ, আমাদের অনায়ত্ত। উক্ত "পুঁথি-পাঠকের" নাম "শ্রীমধুসূদন আশ"! এখানে খুলিয়া বলা ভাল—প্রতিলিপি-কারকের নাম পুঁথিতে নাই। পুঁথি লেখা অর্থাৎ নকল করা সম্পূর্ণ হইলে, যিনি আবৃত্তি করিয়া আদর্শ-পুঁথির সঙ্গে নকলের পাঠ মিলাইয়াছিলেন, তিনিই আপনাকে এখানে "পাঠক" শব্দে উল্লিখিত ও পরিচিত করিয়াছেন। সেই পুঁথি-"পাঠকের" নিবাস "শ্যামপুর" গ্রামে। "আশ" উপাধি দেখিয়া আমরা "পুঁথি-পাঠকের" জাতি-নির্ণয় করিতে পারিলাম। জানিলাম, সে ব্যক্তি তন্তুবায়—সুতরাং বস্ত্র-বয়ন তাহার জাতি-বৃত্তি! তাহার জন্মভূমি "শ্যামপুর" গ্রাম, কোন্ জেলায়, কোন্ মহকুমায়, তাহার সন্ধান পাওয়া বা কাহাকেও তাহার সন্ধান দেওয়া, প্রথমতঃ একটু কষ্ট-সাধ্য ছিল। কেন না, "শ্যামপুর" গ্রাম নানা জেলাতেই আছে। আমরা প্রথম অনুসন্ধানে উক্ত শ্যামপুর গ্রাম, কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম, ইহা বাঁকুড়ার অন্তর্গত "শ্যামপুর" গ্রাম। আমাদের অবলম্বিত পুঁথি-খানিও বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং উক্ত "শ্যামপুর," বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

কবির পরিচয়াভাব জন্য, তাঁহার কাল-নিরূপণের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল না। কোন্ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব, আর কখনই বা তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল, তাহারও যুক্তিসঙ্গত কোন মীমাংসায় সমুপনীত হওয়া অসম্ভব। অন্ততঃ বলিতে হইবে, আপাততঃ এইরূপই বটে। তবে কি এতদ্বিষয়ের আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে! উহার সারোদ্ধারের কি কোন উপায় নাই? সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতারই একটা না একটা প্রতীকার আছে। অতএব এতৎ-সম্পর্কেও হতাশ হওয়া সমীচীন নয়। দেখা যাউক, কিসে কি হয়। আশ্বস্ত হইবার একটু স্থল আছে। উদ্ধবানন্দের রচনা-প্রণালী এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বস্তু। কবির রচিত "রাধিকা-মঙ্গলের" ভাষার আবরণ ভেদ করিলে, ঐ নিবিড়ান্ধকারেও একটা ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। কবির নিজের লিখিত

"এই শিশু ভাগ্য মোর শ্লাঘ্য করিব।"

এই স্থলে এবং অন্যান্য স্থলেও কর্ত্তৃকারকে প্রথম পুরুষ, কিন্তু উহার ক্রিয়াপদে "উত্তম পুরুষ" রহিয়াছে। আমাদের হৃদ্গত ভাব খুলিয়া বলিতেছি।

'এই শিশু মোর ভাগ্য শ্লাঘ্য করিবে'

এবংবিধ কথা বলাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু মূলে 'করিবে' পদের পরিবর্ত্তে "করিব" প্রয়োগ দেখা গেল। কেহ ভাবিবেন না, ইহা লিপিকরের প্রমাদ। পুঁথির সর্ব্ব-স্থানেই এই ব্যাপারের জাজ্বল্যমান ভূরি ভূরি উদাহরণ বিদ্যমান। উৎকল দেশে ক্রিয়া ও কর্ত্তার প্রয়োগের ঐরূপ প্রথা প্রচলিত। তবে বুঝি বা "উদ্ধবানন্দ" উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। অথবা উৎকলের সন্নিহিত মেদিনীপুরে বা উড়িষ্যার প্রান্ত-সীমায় অথচ মেদিনীপুরের শেষাংশের কোন স্থানে তিনি বাস করিতেন। এই অনুমান অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। বাঙ্গালার প্রাচীন গদ্য-লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "উড়িয়া" ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-জাতীয়। আর এক প্রমাণ বা নিদর্শন পাইয়াছি। বাঁকুড়া জেলার "বৈতল-উত্তরবাড়" (১) গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মিত্রজ মহাশয় (২) আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রদেশে "সারল বিরাট" বা "বৃহৎ বিরাট" নামে এক বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক আছে। তাহার প্রণেতা আপনাকে "উৎকল ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে এখানে এই পর্য্যন্ত আলোচিত হইল।

এই স্থলে গ্রন্থের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া কিছু কিছু আলোচনা করিব। গ্রন্থের প্রথমেই এই ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

"উদ্ধবানন্দের মন প্রকাশ হইল।
রাধিকা মঙ্গল গীত রচন করিল॥"

দ্বিতীয় স্থানের ভণিতাও অবিকল ঐরূপ। ত্রিপদী ছন্দে কবির বিষয় অবগত হউন।—

"রাধিকা-মঙ্গল এই,　　　শ্রবণে শুনয়ে যেই,
তার জন্ম পুন নাহি হয়।
গিঞা বৃন্দাবন-ধাম,　　　সেখানে ছাড়িব প্রাণ
উদ্ধবানন্দেতে এই কয়।"

এই বার যে কবিতা উদ্ধৃত করিবার কথা, তাহাও প্রথমোদ্ধৃতাংশের পয়ার বৈ আর কিছুই নয়। অতএব এখানে তাহার প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং কবিতা তুলিয়া দেখাইবার প্রয়োজন কি!

অতঃপর আবার ত্রিপদীচ্ছন্দে কবির পরিচয়। তাহাও উদ্ধৃত হইবার অনুপযোগী। অনুপযোগিতার কারণ, কবিতার দোষে নয়। উপরি-উদ্ধৃত ত্রিপদীর একটী-মাত্র শব্দ বাদে

(১) এইগ্রাম "জেগো" ডাক ঘরের অধীন।

(২) ইনি আমাদের প্রদেশীয় খানাকুল-কৃষ্ণনগরান্তর্গত গৌরহাটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

অপরাংশ অবিকল সমান। পার্থক্য টুকু এই—"সেখানে ছাড়িব প্রাণ" এই অংশের স্থলের পরিবর্ত্তে "সেখানে ত্যজিব প্রাণ" আছে।

আর একমাত্র স্থল উদ্ধৃত করিতে বাকী তাহা এই।—

"বরণ কিরণ রাইর যেন কাঁচা সোণা।
'রাধিকামঙ্গল' উদ্ধবানন্দের রচনা॥"

কবি-প্রবর "উদ্ধবানন্দের" এই খণ্ড-কাব্যের আখ্যা, "রাধিকামঙ্গল"। ইহার অন্ততঃ দুইটী নিদর্শন প্রদান করা উচিত। উপরি-উদ্ধৃত অংশে একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রমাণান্তর এই—

'রাধিকামঙ্গল' এই অমৃতের পুর।
ভক্ত জনের প্রাণ-ধন অভক্তের দূর॥"

এই কবিতাই, গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অংশে আরও দুই স্থলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কবি, কেন কাব্যের ঐ নাম-করণ করিয়াছিলেন, তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বহু উর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইবে। অনেক দূর গমন করিয়াই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে হয়। ভূরি ভূমি অতিক্রম না করিলে, যেমন নিম্ন ভূমি হইতে গিরিচূড়ারোহণ দুঃসাধ্য, উচ্চাবচ বন্ধুর মার্গ হইতে সমতল-ক্ষেত্রে উপস্থিতি যাদৃশ দুর্ঘট ব্যাপার,—সেইরূপ বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের কোন তত্ত্ব-প্রচারে সঙ্কল্প করিলে, মূল স্থানের দিকে—উৎস-ক্ষেত্রের অভিমুখে—পদ-চারণা বৈ গত্যন্তর কৈ? এতদর্থে ভাবুক পথিক-প্রবরকে বন্ধুর মার্গ উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং আমরা বলিব, ভাবুকবর! অগ্রে সুদূর প্রান্তর অতিক্রম কর, পরে অভিলষিত পথ প্রাপ্ত হইবে।

বৈষ্ণব কবি "লোচনদাস" আপনার কাব্যের নাম দিয়াছেন—"চৈতন্য-মঙ্গল" (৩)। বিজয়গুপ্ত, স্বরচিত কাব্য-গ্রন্থের "মনসা-মঙ্গল" নামকরণ করিয়াছেন। অন্ধকবি ভবানী-প্রসাদও, আপন গ্রন্থের "দুর্গামঙ্গল" নাম দিতে পশ্চাৎপাদ হন নাই। কায়স্থ-বংশোদ্ভব "দুঃখীশ্যাম দাসও" স্বকীয় গ্রন্থের নাম "গোবিন্দ-মঙ্গল" রাখিয়াছিলেন (৪)।

---

(৩) এ বিষয়ের প্রমাণ এই,—

চৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ "বৃন্দাবন-রচিত চৈতন্য-মঙ্গলের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োভূয়ঃ আলোলেখ করিয়াছেন; কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতের বিষয়ে কোন স্থলে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই—কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। লোচনদাস-বিরচিত এক চৈতন্যমঙ্গল আছে। বৃন্দাবনের চৈতন্য-ভাগবত ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই এবং চরিতামৃত-কার যে যে বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন জানিবার জন্য চৈতন্যমঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে। অতএব আমাদের বোধ হয়, চরিতামৃত-কারের উল্লিখিত চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্যভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নয়।"—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ২য় সংস্করণ,-৫০ ও ৫৬ পৃষ্ঠা।

(৪) এই "গোবিন্দমঙ্গল" ১৮০৮ শাকে বঙ্গবাসীর কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু বাবুর উদ্যোগে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" হরিচরণ দাসের "অদ্বৈতমঙ্গল" প্রভৃতির "মঙ্গল" শব্দ-সহযোগে নামকরণ হইয়াছিল। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয় করা বড় সহজ কাজ নয়। তালিকা প্রস্তুত করাও দুরূহ কাণ্ড। যথাসাধ্য তথাপি একটা তালিকা দিলাম,—

(সংখ্যা)	(প্রণেতার নাম)	(গ্রন্থের নাম)	(কাল নির্ণয়)
১	লোচন দাস	চৈতন্য-মঙ্গল	১৪০৭ শাকের অর্থাৎ ১৮৯২ সালের পরবর্ত্তী।
২	কৃষ্ণরাম	রায়-মঙ্গল	১৬০৮ শাক (১০৯৩ সাল)
৩	বিজয়গুপ্ত	মনসা-মঙ্গল	১৪১৬ শাক (৯০১ সাল)
৪	দুঃখীশ্যাম দাস	গোবিন্দ-মঙ্গল	আনুমানিক ১৬০৮ শাক (১০৯৩ সাল)
৫	ঘনরাম চক্রবর্ত্তী	ধর্ম্ম-মঙ্গল	১৬৩১ শাক (১১১৬ সাল)
৬	ভারতচন্দ্র	অন্নদা-মঙ্গল	১৬৭৪ শাক (১১৫৯ সাল)

পূর্ব্বাচার্য্যের (চৈতন্যমঙ্গল-কার লোচনদাসের) পদাঙ্ক অনুসরণ, উদ্ধবানন্দের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও মনঃপূত কার্য্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তিনি 'রাধিকা-মঙ্গল" নাম দিয়া অভীষ্ট-দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

"রাধিকামঙ্গল" হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিষ্কাষিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এখন 'রূপার চুড়ি' 'সোণার চুড়ির' খুবই প্রাদুর্ভাব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই প্রাচীন সময়েও তাহার প্রভাব অনুভব করিতেছি। "ঘুঙ্গুর" "সোণার ঝাঁপা" "ঝুরি", "সরল-শঙ্খ", "নুপুর" প্রভৃতির সঙ্গে "সোণার চুড়ির" উল্লেখ দেখিয়া আমাদের বিস্মিত ও পুলকিত হইবারই কথা।

এখন ক্রমশঃ কাব্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়াস পাইলেই ভাল হয়। তদভাবে বরং প্রত্যবায়-ভাগী হইব। একাংশ দর্শন সর্ব্বথা অসমীচীন। কাব্যাভ্যন্তর-ভাগ সুন্দর কি অসুন্দর, তাহার সম্বন্ধে দুই একটা কথার অবতারণা না করিলে ভাল দেখাইবে না।

উদ্ধবানন্দের ভাষা নিরলঙ্কারা। সরল ভাষায় তিনি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী। বাঙ্গালার অক্ষয়কুমারের বাঙ্গালায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়—"অনলঙ্কারই * * * অলঙ্কার।" নিসর্গ-সুন্দরীর আবার আভরণের প্রয়োজন কি? সে তো স্বভাবতঃ মনোহারিণী। কোন কারুকরই, স্বভাব-সুন্দরীকে কারিগরি করিয়া বিমণ্ডিত বা উজ্জ্বল করিবার সাহস করে না। স্বভাব-সুন্দরী অন্তঃ-সুষমার গৌরবিণী। বাহ্য-সৌন্দর্য্য, তাহার কাছে ছার। বস্তুতঃ, যাহার অভ্যন্তরে

শোভা, তাহা কেন অন্য শোভায় শোভিত হইতে চাহিবে? এক জন কবি, অতি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"অনামা স্বর্ণমাধত্তে ন কনিষ্ঠা ন মধ্যমা।
নিজ-নাম-প্রসিদ্ধানাং ভূষণং কি প্রয়োজনং॥" (৫)

যাহা অনামা—নাম-বর্জ্জিত অর্থাৎ নির্ণাম, তাহারই অলঙ্কৃত হইবার প্রয়াস হয়। স্বনাম-খ্যাত বস্তু বা ব্যক্তি, কদাচ বাহ্য-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইতে চায় কি? ভূষণে কখনই তাহার কোন সাধ হয় না।

পয়ার ও ত্রিপদী, এই দুই প্রকার ছন্দে "রাধিকা মঙ্গল" সমলঙ্কৃত। ত্রিপদীতে গ্রন্থের কেবল দুই স্থল শোভিত করিয়াছে। গ্রন্থ-নিবদ্ধ পয়ারেও বিশেষত্ব দেখিতেছি। পয়ার, সচরাচর যুগ্ম-চরণাত্মক—অর্থাৎ দুই চরণে উহার মিলন। এখানে তাহার ব্যতিক্রম। সমগ্র-কবিতা-ভাগের স্থল-যুগলে কবি, তিন চরণে ভক্তি-গাথা গাহিয়াছেন। তাহাতেই তিনি ছন্দের মিলন করিয়াছেন। কাব্যের আদি হইতে চরণ-ত্রয়ে মিলনের প্রসঙ্গ এই। যথা,—

(১)

"শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভজ এক মনে।
শ্রীরাধিকার জন্ম কথা শুন সাবধানে।
সূর্য্য আরাধন করে অপত্য কারণে॥"

আর এক স্থানেও ঐরূপ। যথা—

(২)

"গোশালায় রাজরাণী দিছে আলিপনা।
হেন কালে আইলা রাজা পদ্মপুষ্প লঞা।
গোশালায় গেলা রাজা চমকিত হঞা॥"

অন্যত্র আবার দেখা যায়—

(৩)

"রাজা বলে কন্যা যদি পায় চক্ষুদান।
সেই কন্যা তোমারে করিব সম্প্রদান।
স্তনপান নাহি করে কিসের কারণ॥"

এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গাধীন বলা আবশ্যক, গ্রন্থে হীন-মিলনের অভাব নাই। "ন" এবং "ঞ" উল্লিখিত কবিতায় সমান বিবেচিত হইয়াছে। দন্ত্য "ন" এবং "ঞ" উভয়ই সানুনাসিক বর্ণ। নাসিকা হইতে দুয়েরই উচ্চারণ হইয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ

(৫) শ্লোকের শেষাংশের "ভূষণং কিং করিষ্যতি" এবং "ভূষণৈঃ কিং ভবিষ্যতি" দুই পাঠ-ভেদ আছে।

মিলনে বাধা দেওয়া বৈধ কি অবৈধ—বিদ্বন্মণ্ডলী, তদ্বিচারের ভার লউন। আমরা ইঙ্গিতে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশবৎ কেবল একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন-স্বরূপ স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত বাক্যে ইহাই উত্থাপিত করিতে পারি যে, ঈদৃশ ব্যবস্থা, সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অননুমোদিত নয়। অপর স্থানে যে মিলন-বৈষম্য অবলোকিত হয়, তাহাতে কিছু কিছু বৈচিত্র্যেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহাও উচ্চারণে ব্যাঘাত ঘটিতেছে কি না দেখুন ;—

(ক)

"লাখবান হেন রাণী রাখে বক্ষঃস্থলে।
স্তন ধরি রাধিকা দিছেন চান্দ মুখে॥"

(খ)

"রাজা বলে দেখ গিয়া আছে অন্তঃপুরে।
শুইঞা আছয়ে কন্যা, কৃত্তিকার কোলে॥"

(গ)

"তুষ্ট হঞা দিবাকর, রাজায় দিল বর।
পরম সুন্দরী এক কন্যা হব তোর॥"

(ঘ)

"গিয়া বৃন্দাবন ধাম,		সেখানে ছাড়িব প্রাণ,
উদ্ধবানন্দেতে এই কয়।"

(ঙ)

"বৃকভানু রাজার ঘরে এক কন্যা দেখি।
হেন মনে করি, রূপ সদাই দেখে থাকি॥"

(চ)

"পূর্ণচন্দ্র শশী কাছে,		দাণ্ডাইব কোন্ লাজে,
যখন চাহিব তোমা পানে।"

এই সকল স্থানে মিলনের প্রণালী এইরূপ করা হইয়াছে। যথা—

"স্থলে"	শব্দের সহিত	"মুখে"
"পুরে"	"	"কোলে"
"বর"	"	"তোর"
"ধাম"	"	"প্রাণ"
"দেখি"	"	"থাকি"
"কাছে"	"	"লাজে"

বিষ্ট শব্দ, অপ্রচলিত প্রয়োগ, বর্ণ-যোজনায় বিশেষত্ব ইত্যাদি বিষয়, "রাধিকা মঙ্গলের"

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। না—উহাই উহার অস্থি-মজ্জা, মেরুদণ্ড, অধিক কি—প্রাণ-স্বরূপ। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "লঞা," "হঞা," "গিঞা," "মুদিঞা," "দিঞাছিল," "কঞা," "পসারিয়া," "দিঠি," "ওর," "আন," "এবে," "ভেটিতে," "আগুসারে," ইত্যাদি শব্দনিচয়, নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা। "নয়ান," "সাজন," "কামিলা," ইত্যাদি শব্দ-গুলি, বিশেষ-ভাবে ব্যবহৃত। নয়ন ও সজ্জা অর্থে প্রথম শব্দ-দ্বয় প্রযুক্ত। "কামিলা" শব্দে স্বর্ণকার বুঝায়। "কামিলা" শব্দটী মনসার পাঁচালীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ-গুলি, বর্ত্তমান যে যে শব্দের মূল অর্থাৎ প্রাচীন শব্দ-সমূহের প্রতিরূপ, বর্ত্তমান বাঙ্গালায় সেগুলি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল।

"লঞা"	লইয়া	"গিঞা"	গিয়া
"হঞা"	হইয়া	"মুদিঞা"	মুদিয়া
"দিঞাছিল"	দিয়াছিল	"কঞা"	কহিয়া
"পসারিয়া"	প্রসারিয়া	"আগুসার"	অগ্রসর
"আন"	অন্য	"ভেটিতে"	দেখিতে
"এবে"	এখন		

"দিঠি" বা "দিটি", দৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ। "ওর" অর্থে সীমা। এটী হিন্দি শব্দ। একটী হিন্দি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই প্রমাণিত হইবে, উহা হিন্দি-মূলক কি না।

"উচ্চ নীচ অগাধ, ওর কাঁহা।
কত মহাজন-পুঞ্জ নাব মুঞা॥
খবরদারী রহো হামে হাল্ নিশান বোলে।
ইম কারণ সুন্দরী বেসর দোলে॥"

কোন কোন স্থানে বিশেষ্য শব্দ, বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত। যেমন—

১। "শ্রীচরণ পাইয়া আনন্দ বসুমতী।"
২। "দেখিয়া হৃদয় বড় আনন্দ হইল।"
৩। "দুগ্ধপান নাহি করে, না করে রোদন।
দেখিয়া বিষাদ বড় হইল সর্ব্বজন॥"
৪। শিশুরে দেখিয়া রাজা হইল বিষাদ।"

উল্লিখিত চারি স্থলে দুই বার 'আনন্দ' শব্দ ব্যবহৃত। বলাই বাহুল্য যে, 'সানন্দ' বা 'আনন্দিত' অর্থে উহার ওখানে প্রয়োগ হইয়াছে। আর "বিষাদ" শব্দ, যে যে স্থানে প্রযুক্ত, সেই সেই স্থলেই যে 'সবিষাদ,' 'বিষণ্ণ' বা 'বিষাদিত' অর্থে উহার ব্যবহার হইয়াছে, ইহাও অনুক্ত-সিদ্ধ। এরূপ প্রয়োগ না কি কবিতায় মার্জ্জনীয় ও সহনীয়!

স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্ত্তে পুংলিঙ্গ প্রয়োগও এক স্থানে দেখা যাইতেছে। বৃকভানু রাজা,

বৈদ্য-বেশী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, আমার কন্যা যৌবন-দশায় পদার্পণ করিলে—'যুবতী' হইয়া উঠিলে—তাহার পরিণয় না দিয়া কি প্রকারে রাখিতে পারিব? সেই স্থানের বর্ণনা এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"যুবক হইলে আমি কেমনে রাখিব।"

এখানে 'যুবতী' অর্থে—"যুবক" শব্দের প্রয়োগ।

ছন্দের অনুরোধ, যে সমুদয় শব্দ, কবিতায় ভাঙ্গিতে হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ কৌশল-ময়। কতিপয় উদাহরণ দিলাম।

১।	পরবেশ	প্রবেশ।
২।	পরবীণ	প্রবীণ।
৩।	পয়াণ	প্রয়াণ।
৪।	নিশবদে	নিঃশব্দে

পদ-বিন্যাসে কবির সংস্কৃত শব্দের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন নিরীক্ষণ করি। "সম্বিৎ" "পরকীয়া" "বিকচ" এই সমুদয় পদ-বিন্যাসে আমাদের উক্তির সার্থকতা সপ্রমাণ হয়।

কবি, ছন্দের খাতিরে দুই স্থানে "চাতকিনী" ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ছন্দের অনুরোধেই ঐরূপ কার্য্যে বাধ্য করিয়াছে। অন্য স্থানে তাঁহাকে "চাতকীর" অনুরাগী দেখিতেছি।

কবির কল্পনা, যাদৃশী অতুলনা,—তাঁহার বর্ণনা এবং রচনাও, তাদৃশী সুশোভনা। কাব্যের মূল বিষয়, এবম্ভূত শব্দালঙ্কারে সুসজ্জিত যে, তাহার বৃত্তান্ত ব্যক্ত না করিয়া থাকা যায় না। এই কারণে এখানে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপক সূর্য্যারাধনা করিয়া ও ভগবতীর পূজা দিয়া বৃকভানু রাজা, গ্রহরাজ ভানুর বরে—তপস্যার গুণে—এক কন্যা-রত্ন লাভ করেন। বৃকভানু-মহিষী কৃত্তিকাও, স্বামীর সূর্য্যারাধনার ও ভাগবতীর পূজার অনুকরণে সন্তান-কামনায় দেবতার্চ্চনে মন দিয়াছিলেন। সন্তান-মুখ-নিরীক্ষণ এমনই বস্তু যে, কৃর্ত্তিকা রাজরাণী হইয়াও, পুণ্য কর্ম্মের কামনায় প্রতি-দিন গো শালায় গিয়া গো-সেবা করিতেন—গো-গৃহে আলিপনা দিতেন। ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে তদীয় গর্ভে বৃক-ভানুর ঔরসে "শ্রীশ্রীরাধার উদ্ভব।" সেই কারণে শুক্ল-পক্ষীয়া ভাদ্রী অষ্টমী "রাধাষ্টমী" নামে খ্যাত। অচিরোৎপন্না কুমারী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। দোষের মধ্যে সদ্যোজাতা সুতা, দৃষ্টি-শক্তি রহিতা। দৈব-যোগে দেবর্ষি নারদের তথায় আবির্ভাব হইল। নৃপাননে তদীয় তনয়ার জন্মান্ধতা জ্ঞাত হইয়া ঋষিবর, অন্তঃপুরে গমন করিলেন। নারদ মুনি, রাজাকে আশ্বাস দিয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গেলেন। গিয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। নারদ, গোলোকে গিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন,—

"তোমার অবধি রহে চক্ষু মুদিঞা।
অন্য জনে না হেরিব তোমা না দেখিয়া॥

চাতকীরে দয়া করি করহ গমন।
বৈদ্যরাজ বেশ ধরি দেহ দরশন॥

শ্রীকৃষ্ণের এই বৈদ্য-বেশে আগমনের কথায় কবি কবিচন্দ্র-রচিত কলঙ্ক-ভঞ্জনের ছদ্ম-বেশী বৈদ্যের (শ্রীকৃষ্ণের) ব্যাপার স্মৃতি-পথে সমুপস্থিত হয়। দেবর্ষির বাক্যাবসানে শ্রীকৃষ্ণ, যাহা করিয়াছিলেন, কবিবর তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

"এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ, মনেতে ভাবিল।
বৃকভানু-পুর যাইতে সাজন করিল॥
বান্ধিতে রহিল চূড়া বাঁশী রইল পড়ে।
রাধাকে ভেটিতে যান গোলোক-ভুবন ছেড়ে॥
সঙ্গেতে নারদ মুনি করিলা গমন।
রাজার নগরে গিয়া দিল দরশন॥
বৈদ্যরাজ বেশ ধরি ডাকে ঘনে ঘন।
জন্ম-অন্ধে দিতে পারি আমি সে নয়ান॥"

প্রথম পুরুষের প্রয়োগ-স্থলে উত্তম পুরুষ প্রযুক্ত। অল্প-মাত্রায় ইত্যগ্রে ইহার নির্দ্দেশ-মাত্র করিয়া আসিয়াছি। এই উপলক্ষে এই ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর কতিপয় উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল।

(১)

"অমৃত পাইয়া মুনি, বিচার করিল শুনি,
এই শিশু কৃষ্ণপ্রিয়া হব।
যাইব গোলোকপুরী, যেখানে আছয়ে হরি,
এই কথা তাহারে কহিব॥"

(২)

"এই শিশু ভাল হব, বৈদ্য ওঝা লাগাইব,
সেই জন প্রতীকার জানে।"

(৩)

"অন্ধ জনে না হেরিব তোমা না দেখিয়া।"

(৪)

"শ্রীমতী রাধিকা যেই বিবাহ করিব।
সকল সুন্দর তার নপুংসক হব॥"

(৫)

"সেই কন্যা হব রাজা জগতে পূজিত।"

উপরের উদ্ধৃত স্থল-সকলে "হব" "হেরিব" ও "করিব" দৃষ্ট হইতেছে। ইহারা ক্রমান্বয়ে 'হবে' 'হেরিবে' ও 'করিবে' হইবে।

"রাধিকা-মঙ্গল"-গ্রন্থে বিনিবেশিত ত্রিপদীতে কিঞ্চিৎ নব-ভাব-প্রকাশ ও অভিনব-মত-বিকাশ দেখিতেছি। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সমক্ষে সে বিষয় উত্থাপন না করা দোষাবহ মনে করি। সুতরাং নমুনা-স্বরূপ কিছু কিছু প্রদর্শিত হইল,—

"কাণ্ডার ভিতর হরি, আপনার রূপ ধরি,
রাধারে করয়ে নিরীক্ষণ।
পূর্ণচন্দ্র শশী কাছে, দাণ্ডাইব কোন্ লাজে,
যখন চাহিব আমা পানে॥
কষিত কাঞ্চন জিনি, গাত্রাবরণ-খানি,
নারদের বীণা খসে কুশলে।
রাধার নিকটে গিয়া, রহে চিত্রপট হঞা
রাই-অঙ্গে লেগে রহে দিঠি।
যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি
এক বার দেহ দরশন॥"

সংস্কৃত কবিতার মত, স্বরই এখানে বর্ণ-মিলনের কার্য্য করিতেছে। নচেৎ প্রত্যেক ত্রিপদীর তৃতীয় চরণে অমিলন কেন হইয়াছে?

এই স্থলে দীর্ঘ-ত্রিপদী, লঘু-ত্রিপদী বা ভঙ্গ-ত্রিপদীর নিয়মে "নিরীক্ষণ" এবং "পানে", "কুশলে" এবং "দিঠি" এই জোড়া জোড়া শব্দের মিলন, অনুমোদিত হয় না। উহারা পরস্পর অনৈক্য। তবে যদি প্রথম চরণের "নিরীক্ষণ" শব্দের সহিত অষ্টম চরণের "দরশন" এই শব্দ-দ্বয়ের মিলনে আলঙ্কারিকেরা সম্মত হন, আমাদের তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না। "দরশন" ও "নিরীক্ষণ" দুই সোদর ভ্রাতা। উহাদের অর্থগত বিভিন্নতাও নাই। অতএব তাহাদের ঐরূপ অপরূপ মিলনেও নাই বা বাধা দিলাম, যদি কেহ এই মতাবলম্বন করেন, তাহাও সর্ব্ব-সম্মতিতে গৃহীত হইবে কি না জানি না। ফলে, ত্রিপদীর এই বৈশেষিক ভাব এবং কাশীরাম দাসের রচিত একটী পয়ারে নূতন ধরণের। উহা নামতঃ পয়ার; কিন্তু কার্য্যতঃ ত্রিপদী অর্থাৎ ওটী ত্রিপদী-মূলক পয়ার। সেই রচনা নিম্নে সমুদ্ধৃত হইল। ত্রিপদীর নিয়মে পয়ারটীকে বিন্যস্ত করিয়া দেখাইতেছি।

"দেখ দ্বিজ, মনসিজ
জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম নেত্র
পরশয়ে শ্রুতি॥

অনুপম তনু শ্যাম
নীলোৎপল-আভা।
মুখ-রুচি, কত শুচি,
করিয়াছে শোভা॥
সিংহ-গ্রীব বন্ধু-জীব
অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ
নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু
ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ
মত্ত করি-বর॥
ভুজ-যুগে নিন্দে নাগে
আজানু-লম্বিত।
করি-কর যুগ-বর
জানু সুবলিত॥
বুক-পাটা দন্ত-ছটা
জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে
কোথা রে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য
জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-
জালে আচ্ছাদিত॥
এই ক্ষণে লয় মনে
বিদ্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে কৃষ্ণ জনে
কি কর্ম্ম অশক্য॥"

ইহা নূতন ধরণের এক বিশেষ ছন্দঃ। কিন্তু ইহা বাঙ্গালা ছন্দঃ। সংস্কৃতে এমন ছন্দঃ দেখা যায় না। তাই বলিয়া এক-মাত্র কাশীরাম দাসের রচনা ব্যতিরেকে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্য কোন স্থানেই ইহার প্রয়োগ নাই। ইহা যেমন কাশীরাম দাসের এক অভিনব মনোজ্ঞ সৃষ্টি, পূর্ব্বোক্ত ত্রিপদীও, উদ্ধবানন্দের তেমনই অদ্ভুত নবীন সৃষ্টি। স্বয়ংবর-সভায় অর্জ্জুনের উক্তি-

থিত রূপ-বর্ণনার উক্ত ছন্দঃ, যদি উদ্ধবানন্দের প্রযত্নে অনুকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহার কতক সমর্থন করিতে পারা যায়। কেন না, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, এবম্ভূত অভিনব কার্য্যের প্রবর্ত্তক উদ্ধবানন্দ নহেন। কাশীরাম দাস, তাঁহার পথ-প্রদর্শক। সুতরাং প্রকারান্তরে নূতনত্বে দুই জনকে পাইতেছি। ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে,—

"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।"

মদ-মত্ত মাতঙ্গকে যেমন হস্তিপক, অঙ্কুশ-সহায়তায় বশীকৃত করিয়া থাকে, কবিগণের নিয়ামক সেরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

কবি-কল্পনা, আরও এক স্থলে বড়ই চিত্ত-চমৎকারিণী। কবি, এক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, রাধিকার আবির্ভাবে বসুমতী অতি কৃতার্থ হইলেন। এই দেখুন,—কবি, ধরণীর প্রতিনিধি হইয়া কি বলিতেছেন,—

"যে চরণ সদাই বৈষ্ণব আশা করে।
হেন চরণ আরোপিল আমার উপরে॥
এই শিশু মোর ভাগ্য শ্লাঘ্য করিব।
আমার উপর যখন চলিয়া ফিরিব॥
আমার উপর চরণ আরোপণ হব।
চলিবার বেলা ধূলা চরণে লাগিব॥
রাধা লাগি গোলোক ছাড়ি' আসিব শ্রীহরি!
কৃষ্ণপদ-স্পর্শ পাব মোর ভাগ্য ভারি॥
নাম মোর বসুমতী ভাগ্য করি মানি।
রাই-পদ লাগে যেন কাঁচা ননী।"

অন্যত্র বর্ণনা দেখুন,—

"নখ, বিধুগণ রাইর, শোভে সারি সারি।
পক্ক বিম্ব জিনি অধর বান্ধুলী-মঞ্জরী॥
হিঙ্গুলে মণ্ডিত শোভে কর-পদ-তলে।
প্রাতঃকালে সূর্য্য যেন করে ঝলমলে।"

'রাধিকার দশ নখ দশ ইন্দু' এই বর্ণনা,—ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তিনী। অতএব উহা বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য, সন্দেহ নাই। ভারত, বিদ্যার রূপ বর্ণন-কালে বলিয়াছিলেন,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা!
পদ-নখে পড়ে' তাঁর আছে কতগুলা॥"

ফলতঃ, এই সাদৃশ্য-দৃষ্টে বোধ হয়, উক্ত বর্ণনা, কবি উদ্ধবানন্দের এক মহাগৌরবের পতাকা। ভারতচন্দ্রের ভাষা, উদ্ধবানন্দের ভাষা অপেক্ষা মার্জ্জিত। সেই জন্য ভারতকে অনুকারী বলা যাইতেছে।

আমরা দেখিয়া আসিলাম, কবি-কল্পনা উচ্চ হইতে উচ্চতরে উঠিয়াছে। এই বার দেখা যাউক, উচ্চতম সীমায় কল্পনার গতির অধিকার আছে কি না!

কবি, রাধিকাকে জন্মান্ধ করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব সৃষ্টির পরিচয় দিলেন। এখানে তিনি এক নূতন পদার্থ গড়িয়াছেন। অত্র ও অন্যত্র তিনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুগমন না করিয়াও দোষী নহেন। বরং ইহাতে তাঁহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য প্রকটিত। তাঁহার কৃতিত্ব ও লিপি-কৌশল, এই কারণে বিলক্ষণ পরিস্ফুট। স্বাধীন ভাব, উর্দ্ধ শ্রেণীর কবির প্রাণ, প্রকৃতি ও ধর্ম্ম। কিন্তু তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা, কদাপি স্পৃহনীয় বা মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। সেই উৎকট অপরাধ বাঞ্ছনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় লেখক-কুলের বর্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সৌভাগ্য-ক্রমে কুত্রাপি এই কবিকে স্বেচ্ছাচারিতা-দোষে কলুষিত বা কলঙ্কিত দেখিলাম না। তিনি কল্পনার লীলা-তরঙ্গে আপনার সাধের তরণী ভাসাইয়া দিয়াছেন। কল্পনা, কবিমাত্রেরই অতি প্রিয় বস্তু। তাহার কূল-কিনারা নাই। তাহার কাছে গেলে, সকলকে আত্মহারা হইতে হয়। তরণী-খানি, ভাসিতে ভাসিতে কোন্ তীর্থের কোন্ তীরে লাগিল, পাঠক-মণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকুন,—

"মনে মনে ভাবে রাই, চক্ষু না মেলিব।
প্রাণনাথ বিনে কার অঙ্গে দিঠি দিব॥
গোবিন্দ আসিয়া যবে দিব দরশন।
শ্যাম-অঙ্গ নিরখি দেখিব অন্য জন॥"

রাধিকার এই ভক্তিময় সাত্ত্বিক উক্তি, পতিব্রতা বনিতারই উপযুক্ত। কেমন কোমল কথায় প্রাঞ্জল ভাষায় সরল বর্ণনায় কবি, স্বীয় অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিলেন।

গ্রন্থোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ, কি মধুর! উহা কি সুন্দর ও মনোহর! না জানি, উহাতে কেমন এক অভুতপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব শক্তিই নিহিত। শ্রীকৃষ্ণ, দেবর্ষিকে "বসিতে আসন দিয়া" জিজ্ঞাসিতেছেন,—

"বীণায় গীত নাহি গায় কিসের কারণ॥"
"নারদ বলে, বীণার তার ছিড়্যা গেল।
হাতে হৈতে বীণা খসি ভূমিতে পড়িল॥
চৌদ্দ ভুবন আমি করিয়ে ভ্রমণ।
জনমিয়া হেন রূপ না দেখি কখন।
* * * * *
"বৃকভানু রাজার ঘরে এক কন্যা দেখি।
হেন মনে করে রূপ সদাই দেখে থাকি॥"

তৎপরে নারদ, শ্রীকৃষ্ণকে কি পরামর্শ দিলেন, দেখুন,—

"চাতকীরে দয়া করি করহ গমন।
বৈদ্যরাজ-বেশ ধরি দেহ দরশন॥"

গ্রন্থের নায়িকা শ্রীমতী রাধিকা, একে নাবালিকা,—তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জন্য তাঁহার সমধিক মনঃকষ্ট। তাই নারদ মুনি "ফি" না লইয়াই, এখনকার সখের সেনারা, যেমন স্বেচ্ছায় রণোন্মাদে উন্মত্ত হয়, সেইরূপ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ওকালত-নামা লইয়াছিলেন। মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া শ্রীরাধা, তাঁহাকে কয় মোহর দিয়াছিলেন, কেবল তাহাই আমাদের অগোচর রহিয়া গিয়াছে। এখানে পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণেরও দৃষ্টি ব্যাহত।

ইহার ছন্দোদোষ অশেষ না হউক, কতকটা যে দোষাবহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষরের সমতা কোথাও আছে, কোথাও কোথাও বা তাহার বৈলক্ষণ্য। একটা দৃষ্টান্ত দিলামঃ—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছেঁকিয়াছে তাঁরে।
ভাগ্য-বলে আজি আমি আইলাম তোমার ঘরে॥"

এই কবিতার প্রথম চরণে পয়ারের সচরাচর-প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ১৪ চৌদ্দ অক্ষর আছে। শেষ চরণে কিন্তু ১৭ সপ্তদশ অক্ষর। এটী কবির নিজের ক্রটি, কি লিপিকরের অনবধানতা, তাহা এক বিচার্য্য বিষয়। আমাদের বিবেচনায় ইহা শেষোক্তেরই ক্রটি মাত্র। উল্লিখিত কবিতার দ্বিতীয় পাদ হইতে "আমি" শব্দ বিলুপ্ত করিয়া দিলে, ছন্দঃপাত ঘটে না। অধিকন্তু উহাতে না ব্যাকরণ-দোষ, আর না অর্থ হানি, কিছুই হয় না। এই নিয়মে শব্দ বর্জ্জিত করা সাধীয়ান্ কি না, এখানে এই এক প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে কথার সিদ্ধান্ত পরে হইবে। তথাপি দেখা যাইতেছে, এক বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তাহারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। "তোমার ঘরে" পরিবর্ত্তে "তোমা ঘরে" ধরিয়া লইলে সকল দিক্ বজায় থাকে। এখানেও এক-মাত্র বর্ণ অর্থাৎ "র" বর্জ্জিত হইলে, আপদের শান্তি হয়।

প্রকৃত ব্যাপার গোপন করা মহাপাপ। সদোষকে নির্দ্দোষ বলা, যেমন দূষণীয়,—শ্বেতকে কৃষ্ণ বলিয়া ঘোষণা করাও তেমনই নিন্দনীয়। ক্রটি লুক্কায়িত রাখার চেষ্টার মত, গুরুতর অপরাধ আর নাই। আর এক স্থানেও এই প্রকার অক্ষরাধিক্য দোষ রহিয়াছে। সুতরাং—উহা অমার্জ্জনীয়। একটী-মাত্র ক্রটি ধর্ত্তব্য নয়। কেন না, উহা তাদৃশ দোষাবহ নয়। দ্বিতীয় দোষের দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল,—

"যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলক ছাড়ি আইলাম আমি
এক বার দরশন দেও।"

"গোলক ছাড়ি আইলাম আমি" এই অংশে অধিক অক্ষর আছে। ওখানে তিন অক্ষর বেশী। পূর্ব্ব-চরণে ৮ আট অক্ষর, আর পর চরণে ১১ একাদশ অক্ষর। ইহারও কি কোন ব্যবস্থা হয় না? দেখা যাউক, কিছু হইতে পারে কি না। "আইলাম" স্থানে 'এলাম' করিলেও একটীমাত্র বর্ণের ন্যূনতা হয়। তথাপি দুই বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং কষ্ট কল্পনার আশ্রয়-লইয়া যদি বলা যায়, লিপিকর 'এলাম' পরিবর্ত্তে নিজ-বুদ্ধি-দোষে

"আইলাম" লিখিয়াছে ;—এতাদৃশ অনুমান করা বৃথা। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হস্তে যেরূপে বিচারিত হইয়াছিলেন, আমরাও যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় নিজেকে তৎস্থানীয় ভাবিয়া লইতাম, তাহা হইলে "গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" এই অংশের পরিবর্ত্তে 'গোলোকের হরি আমি' এইরূপ করিয়া দিয়া ছন্দোরক্ষায় উদ্যোগী হইতাম। যাঁহারা ছন্দঃপাত-দোষে দোষী, অনেক আলঙ্কারিকেই তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া অধঃপাতিত করেন। এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় আমরা সায় দিতে অসমর্থ। তাহা না করিয়া আমরা বলি, ওরূপ ছন্দঃপতন থাকাতেই বোধ হইতেছে, এই কবির গ্রন্থ, যথাবৎ রহিয়াছে। অদ্যাবধি কাহারও হস্তস্পর্শে উহা কলঙ্কিত হয় নাই। উহা আকরিক হীরক-সদৃশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে। এমন স্থলে কাহারও কর-স্পর্শ ঘটিলে, মূল বস্তু সংস্কৃত বা মার্জ্জিত হয় না; কিন্তু দূষিত ও বিষাক্ত হয়।

বৃকভানু রাজার বৈদ্য-নিকটে অঙ্গীকার এইরূপ :—

"রাজা বলে কন্যা যদি পায় চক্ষুদান।
সেই কন্যা তোমারে করিব সম্প্রদান॥"

বর্ণনার পরিপাটীও, এই ক্ষুদ্র কাব্যের এক মহাগুণ। যেমন—

"একলা আছয়ে গৃহে গর্ভবতী নারী।
না জানি কি হৈল নির্দ্ধারিতে নারি।"

নারী অর্থে স্ত্রীলোক, পত্নী। এখানকার প্রথম নারী, বনিতা-অর্থে ব্যবহৃত। শেষ "নারি" পদ্যেই প্রযুক্ত হয়। উহার অর্থ 'পারি না'।

"শিরমন্ত্র" (৫) শব্দের অর্থ-গ্রহ, আমাদের বুদ্ধির অনধিগম্য। নানাস্থানে শব্দার্থ এবং পদবিন্যাসাদির অবধারণে আমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। প্রথমেই লিপিকর-প্রমাদে বিলক্ষণ দায়ে ঠেকিতে হইয়াছিল। ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) "গণিত কাঞ্চন জিনি, রাত্র বরণ খানি।"
(২) "শ্রীরাধিকার জন্ম-কথা শুন সাবধানে।
"শ্রীগুরুরষ্টব পদ ভজ একমনে॥"

"গণিত কাঞ্চন জিনি রাত্রবরণ খানি" এই অংশের পরিবর্ত্তে "কষিত কাঞ্চন জিনি গৌত্রাবরণ খানি" এই পাঠ, আমরা স্থির করিয়াছি। জানি না, উহাতে কোন দোষ ঘটিয়াছে কি না। প্রথমতঃ আমরা "শ্রীগুরুর" ও "ষ্টব" এইরূপ পদ-বিশ্লেষণ করি। তাহাতে অর্থগ্রহ হইল না। পরে "শ্রীগুরু" ও "রষ্টব" দ্বিধা বিভক্ত করিয়া লইলাম। তাহারও

(৫) নারদ আসি ডাকে, শিরমন্ত্র হইয়া থাকে,
চিত্র-পটে আকার না নড়ে।
অঙ্গ হৈল পুলকিত, দেহে নাহি সম্বিত
হাতে হৈতে বীণা খসি পড়ে॥

অর্থ পাওয়া গেল না। ইত্যাকার অনেক চেষ্টার পর "শ্রীগুরু বৈষ্ণব" এই পরিশুদ্ধ পাঠ স্থির করাতেই অর্থ প্রতীতি ঘটিল।

এই বার কাব্যের সমালোচনা করিলেই আমাদের অবলম্বিত কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। আর, কথায় যে বলে, "মধুরেণ সমাপয়েৎ" সে মতটীও রক্ষিত হয়। কবি উদ্ধবানন্দ, স্বীয় পুস্তকে শ্রীমতী রাধিকার রূপ-বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন,—

(১) "এক চান্দ গগনে আর চান্দ মহীতলে।
সোণার চান্দ উদয় কৈল কৃত্তিকার কোলে॥
নিষ্কলঙ্ক সোণার চান্দ উদয় করিল।
এত দিনে গগনে চান্দের গৌরব টুটিল॥"

(২) কেহ বলে হেন রূপ কোথাও না দেখি।
হেন মন করে; গলে পদক করে' রাখি॥
চাইতে না পারে কেহ ঝল মল করে।
গগন ছাড়ি চান্দ কি নামিল ভূতলে।

(৩) "শ্যাম অঙ্গে বিনোদিনী,　যেন মিলাইয়া নুনী,
তমালে কনক লতা মিলে।"

উপরি-উদ্ধৃত তিন স্থানের রচনা কি পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতিরিক্ত বর্ণনা হইলেও উহার কিবা মাধুরী!

বৈদ্য-বেশী শ্রীকৃষ্ণকে বৃকভানু বলিলেন, তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রাহী হও। তদুত্তরে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বিলম্ব ঘটিলে পাত্রান্তরে কন্যা-সম্প্রদানের আপত্তি নাই। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের জনান্তিকে উক্তি এইরূপ,—

(১) সতত যাহারে দেখি এক গ্রাম বাসে।
রাগ শান্তি হয় তার, অনুরাগ কিসে॥
(২) দূরে থাকি যত রাগ নিকটে না হয়।
অপূর্ণ হইলে প্রেম বহুত বাড়য়॥
(৩) ঘরে ধন থাকে যার ক্ষুধা শান্তি তার।
নির্দ্ধন পুরুষের ক্ষুধা বাড়য় অপার॥

ভারতচন্দ্রের পশ্চাৎ উদ্ধৃত কবিতা গুলি প্রবাদ-বাক্য-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে;—

(ক) "যতন নহিলে কভু মিলয়ে রতন।"
(খ) "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"
(গ) "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
(ঘ) "নীচ যদি উচ্চ ভাসে,　সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে॥"

উদ্ধবানন্দেরও উল্লিখিত কবিতা-ত্রয় (১, ২, ৩) ভারতের ভারতীবৎ প্রবাদ-বাক্য-স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্য।

সচরাচর দেখা যায়, সংস্কৃত কাব্যকারেরা, বাঙ্গালা-কাব্যকারদের উপজীব্য। মধ্য-যুগের কবিরা, আবার নব্য-কাব্য-কার-গণের উপজীব্য। তাই বলিয়া মধ্য বা নব্য যুগের কবিদের নিজত্ব নাই, এমন কথা বলি না।

"রাধিকা-মঙ্গল" কাব্যের বিস্তর ভাবার্থ, নব্য-কবিদের উপজীব্য। কয়েকটী উদাহরণ না দিয়া কেবল মুখের কথায় মন্তব্য প্রকাশ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া কোন কোন স্থল উদ্ধৃত হইল।

(১) "যার ঘরে ধন থাকে ক্ষুধা শাস্তি তার।
নির্ধন পুরুষে ক্ষুধা বাড়ায় অপার॥"

ইহা তো প্রবাদ-বাক্য-স্থানীয় এবং এক অখণ্ডনীয় সত্য কথা। উহারই অনুকরণ নিম্নে দেখাইতেছি।

"সদা অন্নে হাতে যার ক্ষুধা নাই তার।"
—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা" (জায়া-প্রকরণ)।

(২) বকভানু-পত্নী, রাধিকার জননী কৃত্তিকা, শ্রীরাধাকে সাজাইবার জন্য বলিয়াছিলেন,—
"আভরণ দিব আমি যেখানে যা সাজে।"

ইহার অনুকরণ দেখুন,—
"আজি গো সজনী! তোমায় সাজাইব যতনে।
যেখানে যা শোভা পায়, সেই সেই রতনে॥"

যদি কেহ, এক জনকে অপরের অনুকারী স্বীকার না করেন, তদুত্তরে বলিব, শিশুরাম দাস-প্রণীত মুদ্রিত "প্রভাস-খণ্ড" বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়ের "প্রভাস মিলন" পুস্তকের আদর্শ। উহা বহু দিন বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহায্য লইয়াছেন। প্রবন্ধের দীর্ঘতা-ভয়ে এবং সময়াভাব জন্য কিছুই উদ্ধৃত হইল না।

কবি, যেমন ভক্তি-ভরে "শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদ ভজ একমনে" বলিয়া গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই আশ্বাস্বিত অন্তরে কেমন পরম ভগবদ্-ভক্তের মত মনোহর উপসংহার করিলেন,—

"অগাধ সমুদ্র লীলা কহনে না যায়।
এত দূরে রাধিকা-মঙ্গল হইল সায়॥"
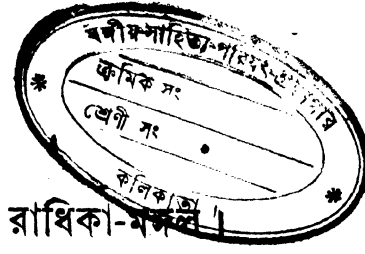
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

রাধিকা-মঙ্গল।

শ্রীমতী রাধিকার জন্মকথা।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পদ ভজ এক-মনে।
শ্রীরাধিকার জন্ম-কথা শুন সাবধানে।
সূর্য্য আরাধন করে অপত্য-কারণে॥
দ্বাদশ বৎসর রাজা সূর্য্য পূজা করে।
পূজায় করিল তুষ্ট ভানু ভাস্করে॥
তুষ্ট হঞা দিবাকর রাজায় দিল বর।
পরম সুন্দরী এক কন্যা হব তোর॥
পুত্র না হইব তোর কন্যা উপনীত।
সেই কন্যা হব রাজা জগতে পূজিত॥
বর পেঞা মহারাজা গেল নিজ ঘরে।
কৃত্তিকারে কহে রাজা গিঞা অন্তঃপুরে॥
এত শুনি কৃত্তিকা আনন্দিত মনে।
গ্রাম-দেবতা আমি পূজিব যতনে॥
সকল দেবতা রাণী পূজে নিতি নিতি।
অকস্মাৎ রাজরাণী হৈলা গর্ভবতী॥
এই মত ক্রমে দশ মাস পরবেশে।
আনন্দ বাড়িল বড় রাজার আবেশে।
শুক্ল অষ্টমী তিথি ভাদ্র-পদ মাসে।
অবতার কৈল রাই রাজার আবেশে॥
ভগবতী পূজা দিল বৃকভানু রাজা।
পুষ্প তুলিতে গেল করিবারে পূজা॥
গোশালায় রাজরাণী দিছে আলিপনা।
হেন কালে আইলা রাজা পদ্মপুষ্প লঞা।
গো-শালায় গেলা রাজা চমকিত হঞা॥
একলা আছয়ে গৃহে গর্ভবতী নারী।
না জানি কি হইল নির্দ্ধারিতে নারি॥

বাহিরে আসিঞা রাজা ডাকে আপন নারী।
হেনই সময় রাই অবতার করি ॥
আচম্বিতে রাজ-গৃহে পড়িল বিগ্রতা।
লাখবান হেম জিনি বৃকভানু-সুতা ॥
আপনাকে ধন্য করি মানয়ে অবনী।
শুভক্ষণে আজি মোর পোহাল রজনী ॥
চম্পক-বরণী রাই কাঞ্চনের জ্যোতিঃ।
শ্রীচরণ পাইয়া আনন্দ বসুমতী ॥
যে চরণ সদাই বৈষ্ণব আশা করে।
হেন চরণ আরোপিলা আমার উপরে ॥
আমায় উপার্জ্জন হয় নানা পুষ্পজাতি।
সেই পুষ্প লইয়া পূজিব নিতি নিতি ॥
এই শিশু ভাগ্য মোর শ্লাঘ্য করিব।
আমার উপর যখন চলিয়া ফিরিব ॥
আমা উপর চরণ আরোপণ হব।
চলিবার বেলা ধুলা চরণে লাগিব ॥
রাধা লাগি গোলোক ছাড়ি আসিব শ্রীহরি।
কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শ পাব মোর ভাগ্য ভারি ॥
নাম মোর বসুমতী ভাগ্য করি মানি।
রাই-পদ লাগে যেন কাঁচা সুনি ॥
বৃকভানু রাজার ভাগ্য কে কহিতে পারে।
গোবিন্দ প্রেয়সী রাই আইলা যার ঘরে ॥
কৃত্তিকা রাজার রাণী কত তপ কৈল।
কি করিব পুত্রেতে অমূল্য ধন পাইল ॥
বৃকভানু রাজার ভাগ্য বড়ই প্রবল।
কন্যা হইতে রাজার নাম হইল উজ্জ্বল ॥
বৃকভানু-পুরের লোক বড় ভাগ্যবান্।
দেখিঞা শিশুর রূপ জুড়ায় নয়ান ॥
এক চান্দ গগনে আর চান্দ মহীতলে।
সোণার চান্দ উদয় হইল কৃত্তিকার কোলে ॥
নিষ্কলঙ্ক সোণার চান্দ উদয় করিল।
এত দিনে গগনে চান্দের গৌরব টুটিল ॥

বিকচ কমল জিনি মুখ-চন্দ্র শোভা।
প্রভাতের রবি জিনি দীপ্ত করে আভা॥
লাখবান হেন বাণী রাখে বক্ষঃস্থলে।
স্তন ধরি রাধিকা দিছেন চান্দ মুখে॥
নখ বিধুগণ রাইর শোভে সারি সারি।
পক্ক বিম্ব জিনি অধর বান্ধুলী-মঞ্জরী॥
হিঙ্গুলে মণ্ডিত শোভে কর-পদ-তলে।
প্রাতঃকালে সূর্য্য যেন করে ঝলমলে॥
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য কেহ করে গান।
বস্ত্র আভরণ রাজা দিছে সাবধান॥
আনন্দ উৎসব রাজা করে হরষিতে।
আইল সকল লোক শিশুরে দেখিতে॥
কেহ বলে হেন রূপ কোথাও না দেখি।
হেন মন করে গলে পদক করে রাখি॥
চাইতে না পারে কেহ ঝল মল করে।
গগন ছাড়ি চান্দ কি নামিল ভূমিতলে॥
শিশুকে দেখিঞা সবার আনন্দ হইল।
বৃদ্ধ পরবীণ কেহ নিকটে আইল॥
দেখিতে দেখিতে কেহ করে অনুমান।
চক্ষু মেলি না চাহে কিসের কারণ॥
আনন্দসাগরে বিধি বড় দুঃখ দিল।
হেন বুঝি এই শিশু জন্ম-অন্ধ হল॥
দুগ্ধ পান নাহি করে না করে রোদন।
দেখিয়া বিষাদ বড় হইল সর্ব্বজন॥
রাধিকা-মঙ্গল এই অমৃতের পুর।
ভক্ত-জনের প্রাণ-ধন অভক্তের দূর॥
উদ্ধবানন্দের মন প্রকাশ হইল।
রাধিকা-মঙ্গল গীত রচন করিল॥
মনে মনে ভাবে রাই চক্ষু না মেলিব।
প্রাণ-নাথ বিনে কার অঙ্গে দিঠে দিব॥
গোবিন্দ আসিয়া যবে দিব দরশন।
শ্যাম অঙ্গ নিরখি দেখিব অন্য জন॥

শিশুরে দেখিয়া রাজা বিষাদ হইল।
আনন্দ সাগরে বিধি বড় দুঃখ দিল॥
বাহির উদ্যানে রাজা রহে হেট মাথে।
তবে কেন দিল বিধি মোরে দুষ্‌খ দিতে॥
হেন সময় নারদ করিল পয়ান।
নারদ দেখিঞা রাজা করিল অবস্থান॥
রাজারে বিরস দেখি কহে নারদ মুনি।
আজিও কেন দেখিতে তোমার হরষিত বাণী॥
রাজা বলে কি কহিব ইহার উত্তর।
দুষ্‌খের অনলে মোর পুড়য়ে অন্তর॥
বৃদ্ধকালে এক কন্যা যদি হইল মোর।
সেই অন্ধা হ'ল অভাগ্যের নাহি ওর॥
নারদ বলেন আমি শিশুরে দেখিব।
জন্ম অন্ধ বটে কিবা নিশ্চয় জানিব॥
রাজা বলে দেখ গিয়া আছে অন্তঃপুরে।
শুইয়া আছে কন্যা কৃত্তিকার কোলে॥
রাধিকা-মঙ্গল এই অমৃতের পুর।
ভক্ত-জনের প্রাণ-ধন অভক্তের দূর॥
উদ্ধবানন্দের মন প্রকাশ হইল।
রাধিকা-মঙ্গল গীত রচন করিল॥

তবে সে নারদ মুনি, যান যথা রাজরাণী,
বীণাযন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গেঞা।
হেথা বিনোদিনী রাই, কৃষ্ণনাম শুনিতে পাই
নিশবদে রহে স্থির হঞা॥
যেন চাতকিনী-মাঝে, মেঘ-পানে চেঞা থাকে,
পিব পিব করে ঊর্দ্ধমুখে।
আজি হইল শুভদিনে, কৃষ্ণনাম শুনিল কানে,
আমারে গোবিন্দ পারা ডাকে॥
নারদ আসিয়া ডাকে, শির মত্ত হইয়া থাকে,
চিত্রপটে আকার না নড়ে।
অঙ্গ হইল পুলকিত, দেহে নাহি সম্বিত,

হাতে হৈতে বীণা খসি পড়ে ॥
অমৃত পাইয়া মুনি, বিচার করিল শুনি
এই শিশু কৃষ্ণপ্রিয়া হব।
যাইব গোলকপুরী, যেথানে আছয়ে হরি
এই কথা তাহাকে কহিব॥
ত্বরায় বাহির হঞা, রাজার নিকট গিঞা,
চিন্তা না করিহ কিছু মনে।
এই শিশু ভাল হব, বৈদ্য ওঝা লাগাইব,
সেই জন প্রতীকার জানে।
রাধিকা-মঙ্গল এই, শ্রবণে শুনয়ে যেই,
তার জন্ম পুন নাহি হয়।
গিঞা বৃন্দাবন-ধাম, সেথানে ছাড়িব প্রাণ,
উদ্ধবানন্দেতে এই কয় ॥

রাজারে প্রবোধ দিয়া মুনির গমন।
বেরায় গেলেন মুনি গোলোক ভুবন।
গোবিন্দ নিকট মুনি দিলা দরশন।
কৃষ্ণেরে নারদ কন সহাস্য-বদন ॥
বসিতে আসন দিয়া শুধান বচন।
বীণায় গীত নাহি গায় কিসের কারণ ॥
নারদ বলিল বীণার তার ছিড়্যা গেল।
হাথে হৈতে বীণা খসি ভূমিতে পড়িল ॥
চৌদ্দ ভুবন আমি করিয়ে ভ্রমণ।
জনমিয়া হেন রূপ না দেখি কখন ॥
এ তিন ভুবন-মাঝে না দেখি তুলনা।
বরণ কিরণ তার যেন কাঁচা সোণা ॥
বৃকভানু রাজার ঘরে এক কন্যা দেখি।
হেন মন করে রূপ সদাই দেখে থাকি ॥
তোমার অবধি রহে চক্ষু মুদিয়া।
অন্য জনে না হেরিব তোমা না দেখিয়া ॥
চাতকীরে দয়া করি করহ গমন।
বৈদ্য-রাজ-বেশ ধরি দেহ দরশন ॥

এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ মনেতে ভাবিল।
বৃকভানু-পুর যাইতে সাজন করিল॥
বান্ধিতে রহিল চূড়া বাঁশী রইল পড়ে।
রাধাকে ভেটিতে যান গোলোক ভুবন ছেড়ে॥
সঙ্গেতে নারদ মুনি করিল গমন।
রাজার নগরে গিয়া দিলা দরশন॥
বৈদ্যরাজবেশ ধরি ডাকে ঘনে ঘন।
জন্ম-অন্ধে দিতে পারি আমি সে নয়ান॥
বেরায় চলিয়া আইল বৃকভানু-পুরে।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃকভানু-পুরে॥
এ বোল শুনিয়া রাজা ডাকিয়া আনিল।
বহু যতন করি তারে আদর করিল॥
রাজা বলে ভাগ্য ফলে তোমার গমন।
মোর কন্যায় কৃপা করি দেহ চক্ষুদান॥
বৃদ্ধকালে এক কন্যা দিঞাছিল বিধি।
সেই কন্যা পাইনু আমি বহু তপ সাধি॥
দেখিঞা হৃদয় বড় আনন্দ হইল।
কি বলিব বিধাতারে অন্ধ শিশু দিল॥
বৈদ্যরাজ বলে রাজা শুনহ বচন।
জন্ম অন্ধে দিতে পারি দিব্য যে লোচন॥
রাজা বলে কন্যা যদি পায় চক্ষুদান।
সেই কন্যা তোমারে করিব সম্প্রদান॥
স্তন-পান নাহি করে কিসের কারণ।
বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছেঁকিয়াছে তারে।
ভাগ্য বলে আজি আমি আইলাম তোমার
ধূপ দীপ মাল্য গন্ধ পুষ্প মাল্য চন্দন।
একখানি চাহি রাজা নৌতন বসন॥
ত্বরিতে করহ রাজা কাপড় কাণ্ডারে।
আনহ শিশুরে সেই কাণ্ডার ভিতরে॥
কাণ্ডার বাহির আমি নহি যত ক্ষণ।
অন্য জন কেহ না আসিব সেইখান॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তবে লক্ষ জন ধায়।

আঁখির নিমিষে তখন কাণ্ডার সাজায়॥
শিশুরে আনিয়া রাখে কাণ্ডার-ভিতরে।
অখিল ভুবন-পতি কৈল আগুসারে॥
রাধিকা-মঙ্গল এই অমৃতের পুর।
ভক্ত-জনের প্রাণ-ধন অভক্তের দূর॥
উদ্ধবানন্দের মন প্রকাশ হইল।
রাধিকা-মঙ্গল গীত রচন করিল॥

কাণ্ডার ভিতরে হরি, আপনার রূপ ধরি,
রাধারে করয়ে নিরীক্ষণ।
পূর্ণ-চন্দ্র শশী কাছে, দাণ্ডাইব কোন্ লাজে,
যখন চাহিব আমা পানে।
কষিত কাঞ্চন যিনি, গাত্রবরণ-খানি,
নারদের বীণা খসে কুশলে॥
রাধার নিকটে গিয়া, বহে চিত্রপট হঞা,
রাই অঙ্গে লেগে রহে দিঠি॥
যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলক ছাড়ি আইলাম আমি,
একবার দেহ দরশন।
শীতল বচন শুনি, মনে ভাবে ঠাকুরাণী,
আমার বঁধুয়া এই বটে।
চক্ষু মেলিয়া চায়, চাহিলে না চাহা যায়,
জোড় হাতে রহে কর-পুটে।
মাল্য-চন্দন লঞা, বন্ধু আগে দাণ্ডাইয়া
পুষ্পহার দিল লঞা গলে।
রাধার পরশ পাইয়া, গোবিন্দ অবশ হইয়া
বাহু প্রসারিয়া কৈল কোলে।
শ্যাম অঙ্গে বিনোদিনী, যেন মিলাইল মুনি,
তমালে কনকলতা মিলে॥
গোলোকের নাথ আমি, আমার অগ্রজ তুমি,
রাধাকৃষ্ণ জগজনে বলে॥
কৃষ্ণ বলে যাব আমি, শুইয়া থাকহ তুমি,
ত্বরিত করিয়া বিদায় দিও।

বিদায়ের বোল শুনি, প্রেমে ভাসে ঠাকুরাণী,
আমারে রাখিয়া কোথা যাও ॥
রাধিকা-মঙ্গল এই, শ্রবণে শুনয়ে যেই,
তার জন্ম পুনঃ নাহি হয়।
গিয়া বৃন্দাবন ধাম, সেখানে ত্যজিব প্রাণ,
উদ্ধবানন্দেতে এই কয় ॥

কাণ্ডার হইতে হরি বাহির হইলা।
বৈদ্যরাজ বেশ ধরি রাজস্থানে গেলা ॥
গোবিন্দ বলিল রাজা শুনহ বচন।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল এবে করিব গমন ॥
তোমার কন্যায় আমি দিনু চক্ষুদান।
সত্য করিয়াছি আমি নাহি হয় আন ॥
রাজা বলে যদি তোর বিলম্ব হইব।
যুবক হইলে আমি কেমনে রাখিব ॥
বৈদ্য বলে যদি মোর বিলম্ব হইব।
অন্য পাত্র আনি তুমি কন্যা দান দিব ॥
মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবয়ে হৃদয়।
পরকীয়া বিনে প্রেম না হয় উদয় ॥
সতত যাহারে দেখি এক গ্রাম বাসে।
রাগ শান্তি হয় তার অনুরাগ কিসে ॥
দূরে থাকি যত রাগ নিকটে না হয়।
অপূর্ব্ব হইলে প্রেম বহুত বাড়য় ॥
যার ঘরে ধন থাকে ক্ষুধা শান্তি তার।
নির্দ্ধন পুরুষের ক্ষুধা বাড়য়ে অপার ॥
শ্রীমতী রাধিকা যেই বিবাহ করিব।
সকল সুন্দর তার নপুংসক হব ॥
মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা কঞা ॥
আপন আলয়ে গেল বিদায় হইয়া ॥
বৃকভানু রাজা হেথা গেলা অন্তঃপুরে।
আনহ কন্যায় রাজা বলে কৃত্তিকারে ॥
কন্যারে আনিয়া রাণী দিল রাজ-কোলে।

শত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
বৃকভানু-কোলে কন্যা মুখপানে চায়।
দক্ষিণ বাহু তুলি নাচিয়া বেড়ায় ॥
কৃত্তিকার আনন্দ কথা কি কহিব আর।
আনন্দ-সাগরে রাণী না পায় পাথার ॥
কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভানুরাজে।
আভরণ দিব আমি যেখানে যে সাজে ॥
কামিলা আনিয়া আভরণ সদ্য কর।
কটী-মাঝে পরাইব সোণার ঘুঙ্ঘুর ॥
কামিলা আনিঞা রাজা আদেশ করিল।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আভরণ সদ্য কৈল ॥
আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি।
চাঁচর কেশে সোণার ঝাঁপা পিছে দোলে ঝুরি ॥
সুন্দর সরল পদ্ম কত চিত্র তায়।
কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায় ॥
চরণে ধরিয়া রাণী নুপুর পরায়।
বাহুতে ধরিয়া রাণী রাধারে নাচায় ॥
বৃকভানু-পুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে ॥
বরণ কিরণ এ রাইর যেন কাঁচা সোণা।
রাধিকা-মঙ্গল উদ্ধবানন্দের রচনা ॥
অগাধ সমুদ্রলীলা কহনে না যায়।
এতদূরে রাধিকা-মঙ্গল হইল সায় ॥

ইতি রাধিকা-মঙ্গল সমাপ্ত।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের

রায়-মঙ্গল।

[১৩০৩ সালের ২রা চৈত্রের অধিবেশনে পঠিত।]

আজ যে গ্রন্থ সম্বন্ধে আমায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইতেছে, তাহা একজন বাঙ্গালী প্রাচীন কবির এক খানি কাব্য। কবির নাম কৃষ্ণরাম দাস, আর তাঁহার এই কাব্যখানির নাম "রায়মঙ্গল"। কৃষ্ণরাম দাস নামে যে একজন কবি প্রাচীন কালে এদেশে ছিলেন, একথা তিন বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে কেহ জানিতেন কিনা সন্দেহ। আজ ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবি কৃষ্ণরাম দাস-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লেখেন। বর্ত্তমান সাহিত্য-জগতে বোধ হয় কবি কৃষ্ণরামের ইহাই প্রথম পরিচয়।* উক্ত পত্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের আলোচ্য এই কাব্যখানির কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা বা তাহার উদ্ধার করা পরিষদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য একটী বিশেষ কারণে এই কাব্য খানি আমাদের আলোচ্য হইয়াছে। কাব্য খানিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালার এক দেশের লুপ্ত ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা আছে। প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এ গুলিরও উদ্ধার হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়।

এই কাব্য খানি এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রক্ষাকর্ত্তা বটতলার প্রকাশকেরাও ইহা ছাপান নাই। এখনও ইহা পুঁথির আকারেই রহিয়াছে। বর্ত্তমান এই পুঁথি খানি† আমি বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে পাইয়াছি। বিশ্বকোষের জন্ত পুঁথি-সংগ্রহের সময় বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্র বাবু এই পুঁথি খানি কোন এক বন্ধুর নিকট পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে দক্ষিণরায় দেবতার বিবরণ সংক্ষেপে বিশ্বকোষে প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুঁথি খানি খণ্ডিত, অনুমান হয়, শেষের দিকে খান দুই তিন পাতা নাই। এখানি গ্রন্থকারের আসল পুঁথি নহে, একখানি নকল মাত্র। কে নকল করিয়াছিল, কবে কোথায় নকল হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট কয়েক পাতা হইতে জানিবার উপায় নাই, কারণ

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে "বান্ধব" পত্রিকায় এই কবিতার কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল।

† এই স্থলে পুঁথিখানি সভাস্থলে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

এ সকল কথা প্রায়ই শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত থাকে, ইহার সে পাতা নাই। তবে পুঁথিখানি কাহার জন্ম নকল হইয়াছিল, তাহা কিন্তু এই কয় পাতার কয়েক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। ইহার এখন ২৫টী পাতা পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় পাতার প্রথম পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীযুত বাবু বাহাদুর", ৬ষ্ঠ পাতার প্রথম পৃষ্ঠার শেষে "স্বাক্ষর শ্রীযুত মদনমোহন দেব সাকিম মুড়াগাছা, হাযুরী," ১২শ পাতার শেষ পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীহরমোহন দত্ত", ১৩শ পাতার প্রথম পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীহরমোহন দত্ত" ও ২৪এর পাতার প্রথম পৃষ্ঠার শেষে "শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন বাহাদুরের এই পুস্তক"—এইরূপ লিখিত আছে। এই পুঁথি খানিতে দুই তিন জনের হস্তাক্ষর দেখা যায়। যে যে অংশে "শ্রীহরমোহন দত্ত" এই নামটী পাওয়া যাইতেছে, সেই অংশের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। আমার অনুমান হয়, সেই অংশের লেখকেরই নাম হরমোহন দত্ত।* "শ্রীযুত বাবু বাহাদুর" এই কথাটী ২য় পাতা ভিন্ন আরও দুই এক স্থলে আছে। বোধ হয় এই "শ্রীযুত বাবু বাহাদুরই পুস্তক খানির অধিকারী ছিলেন। ২৪এর পাতায় গ্রন্থাধিকারীর পূর্ণ নাম লিখিত হইয়াছে।—অধিকারীর নাম শ্রীযুত গোপীমোহন বাহাদুর। এতদুভয়ের একত্র প্রয়োগ দেখিলে হঠাৎ আমাদিগের মনে শোভাবাজার রাজবংশের রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের নাম মনে আসে। জানি না তাঁহার সহিত এ পুঁথি খানির কোন সংশ্রব ছিল কি না। "স্বাক্ষর শ্রীমদনমোহন দেব সাকীম মুড়াগাছা"—ইহা হইতেও গ্রন্থাধিকারী গোপীমোহন বাহাদুরকে যেন রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর বলিতে আরও বেশী ইচ্ছা হয়, কারণ মুড়াগাছা পরগণা উক্ত রাজা বাহাদুরদিগেরই জমীদারী ও আদি বাসস্থান বলিয়া শুনা আছে, আর মদনমোহন দেবও যেন তাঁহার দূর জ্ঞাতির মধ্যে হইলেও হইতে পারেন। যে স্থলে এই মদনমোহনের নাম আছে, সে স্থলের হস্তাক্ষর বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং আমার বিবেচনায় ইনিও পুঁথিখানির সেই অংশের লেখক মাত্র।

পুঁথিখানির নাম "রায়মঙ্গল"। ইহা স্পষ্টতঃ কোথাও লিখিত নাই, শেষাংশে ছিল কিনা এখন বলিতে পারা যায় না। তবে ইহার নাম যে "রায়মঙ্গল", তাহার অতি স্পষ্টতর আভাস গ্রন্থারম্ভের প্রথমাংশ হইতেই পাওয়া যায়,——

(১) "রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপিঠে আরোহণ এক মহাজন ॥
কান্ধে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥

---

* পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রণীত "৺অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন চরিত" নামক পুস্তকে আমরা এক সুলেখক হরমোহন দত্তের পরিচয় পাইয়াছি। সেই হরমোহন দত্ত ৺ অক্ষয়কুমারের খুড়া হইতেন এবং তিনি সুপ্রীমকোর্টের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর এত সুন্দর ও সুছাঁদ ছিল যে, তাঁহারই হস্তাক্ষর দেখিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালার সীসাক্ষরগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই হরমোহনের সহিত এই হরমোহনের কোন সম্পর্ক আমরা আপাততঃ দেখিতে পাইতেছি না।

পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটীর মাঝে হইব প্রচার ॥"

(২) "এতেক কহিয়া রায় গেল নিজ স্থল।
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল ॥"

(৩) হইয়া যে একচিত রচিলা রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।"

(৪) "এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজ স্থল ॥"

অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি "মঙ্গল" নামধেয় পাঁচালী গ্রন্থগুলি যেমন তন্নামাত্মক দেবতার লীলাপ্রকাশক কাব্য, আমাদের আলোচ্য এই গ্রন্থখানিও তদ্রূপ "দক্ষিণরায়" নামক গ্রাম্যদেবতার মহিমাপ্রকাশক কাব্য।

দক্ষিণরায় দেবতা সম্বন্ধে দুএক কথা বলা এথানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে, হুগলীর দক্ষিণাংশে, খুলনায়, যশোহরে, নওয়াখালীতে এবং সুন্দরবনে এই দেবতার পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত। ইনি গ্রামবাসীদিগের মতে ব্যাঘ্রভীতিনিবারক দেবতা, সুতরাং সুন্দরবনের পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে ও সুন্দরবনের আবাদী মহলে এই দেবতার বিশেষরূপে পূজা হয়। এ অঞ্চলে যেমন কালী, শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার মন্দিরাদির বাহুল্য দেখা যায়, ঐ সকল অঞ্চলে সেইরূপ প্রতি গ্রামের প্রতি পল্লীতে দক্ষিণরায় দেবতার স্থান আছে। বারুইপুর, কোঁদালিয়া, ধব্‌ধবে প্রভৃতি স্থানে ভদ্র গৃহস্থেরা ইঁহার পূজা করেন। সাধারণতঃ বনাঞ্চলের মউল্যা, মলঙ্গী, পোদ্, বাগদী, কাঠুরিয়া, শীকারী, বুনো, নৌজীবী প্রভৃতি লোকেই ইঁহার পূজা করে। ইঁহার পূজাবিধিও বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরাও ইঁহাকে পীর গাজীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা দেয়। বুনো ও কাঠুরিয়ারা যখন সুন্দরবনে যায়, তখন নৌকা হইতে নামিয়াই প্রথমে সকলে বনপ্রান্তে এই দেবতার পূজা করে, পরে প্রসাদী পুষ্পাদি মাথায় বাঁধিয়া বনে প্রবেশ করে। তাহাদের বিশ্বাস দক্ষিণরায়ের পূজা না দিয়া বনে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই বাঘের কবলে প্রাণ হারাইতে হইবে। সভ্য গ্রামের মধ্যেও দক্ষিণরায় দেবতার কোথাও কোথাও মন্দির আছে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃহৎ প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্বাদি বৃক্ষতলই তাঁহার আশ্রম। কোথাও মাটীর ঢিবি, কোথাও সিন্দুর-মণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা দেবতার কল্পিত মুণ্ড মাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা হয়। অনেক স্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুণ্ড মাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। রাত্রিতে বা দ্বিপ্রহরে এই সকল বৃক্ষের নিকট দিয়া লোক চলিতে চাহে না, অজানিত পথিকেরা গাছের উপর মনুষ্যাকৃতি দেবমুণ্ড দেখিয়া ভয় পায়।

দক্ষিণরায় দেবতা মনুষ্যাকার, বলিষ্ঠদেহ, মহিষাসুরের ন্যায় দাঁত-খামাটি মারা, সিপাহী বেশী, ব্যাঘ্রবাহন। পৌষ সংক্রান্তির দিন ইঁহার বিশেষ পূজা হয়। নতুবা প্রয়োজন মত, মানসিক মত, যখন ইচ্ছা পূজা হইয়া থাকে। বারুইপুর অঞ্চলে পৌষ-সংক্রান্তির দিন রাত্রিতে ইঁহার পূজা হয়। পূজার সময় হিন্দুরা ছাগবলি দেয়, মুসলমানেরা হাঁস মুরগী হালাল করে। বারুইপুরে ঐ দিন রাত্রিতে সকল গৃহস্থের বাড়ীতেও পূজা হয়। কোদালিয়া অঞ্চলে ১,লা মাঘ দিনের বেলা পূজা হয়। কলিকাতায় যেমন অনন্ত-ব্রতোপলক্ষে হস্ত্যারোহী ছত্রমস্তক ইন্দ্রমূর্ত্তির পুত্তলিকা প্রতিমা চিত্রিত হয়, সেখানেও ঐ দিন সেইরূপ দক্ষিণরায়ের মুণ্ডমাত্র বিক্রীত হয়। এই প্রতিমা দেখিতে অতি বীভৎস! দীর্ঘ চক্ষু, দীর্ঘ কর্ণ, দীর্ঘ দন্তশ্রেণী, চক্ষুতে ভীষণ ভাব! মস্তকে দেবীমুকুটের কল্কার ন্যায় সমগ্র মুখমণ্ডলের দুই গুণ দীর্ঘ প্রস্থ এক মুকুট, দেখিতে অনেকটা রোমক যাজক-দিগের উষ্ণীষের ন্যায়। এই পুত্তলিকা গৃহস্থেরা রাত্রিতে পূজা করিয়া পর দিবস জলে বিসর্জ্জন না দিয়া ষষ্ঠী শীতলার প্রতিমার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে রাখিয়া আসে।* বৃদ্ধেরা এই দিন সমস্ত বালক বালিকাকে সন্ধ্যাকাল হইতে অতি সাবধানে গৃহ মধ্যে রক্ষা করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ দিবস পূজার লোভে প্রীতচিত্ত দেবতা দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদল সহ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করেন। বারুইপুর হইতে ১। ক্রোশ দূরে ধবধবে গ্রামে এই দেবতার এক মন্দির আছে। মন্দিরে ঐরূপ মুখমুকুটবিশিষ্ট পূর্ণাবয়ব এক প্রতিমা আছে। লোকে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া যে ভাবে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করে, ঠিক সেইরূপ সন্নিবেশ ভঙ্গিতে ঐ মন্দিরের দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত। পোষাক সিপাহীর, হস্তেও বন্দুক আছে (?), নিকটে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রমূর্ত্তিও আছে। এই মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণ এক প্রকার বংশাবলীক্রমেই মন্দির ভোগ করিতেছেন। গ্রামবাসীর মতে এই দেবতা বিশেষ জাগ্রৎ। সন্তান-লাভ ও রোগোপশমনার্থ লোকে ইঁহার নিকট পূজা বলি মানসিক করে, ফলও পায়। পূজক নানাবিধ ঔষধাদিও দিয়া থাকেন। কোদালিয়াবাসী পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের পুত্র রীপণ কলেজের প্রধান কর্ম্মচারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট জানা গেল যে, তাঁহাদিগের দেশেও বারুইপুরের ন্যায় দেবমূর্ত্তি পূজিত হয় ও ১লা মাঘ দিবসে পূজিত হইয়া থাকে। গণেশমন্ত্রে ও গণেশের ধ্যানোল্লেখে এই দেবতার পূজা হয়। প্রবাদ এই যে পার্ব্বতীপুত্র গণেশই এই দেবতা। তাঁহার জন্মকালে যখন শনির দৃষ্টিতে তাঁহার মুণ্ড উড়িয়া যায়, তখন সেই মুণ্ডই বিঘ্নবিনাশন দক্ষিণরায়ের মুণ্ডরূপে নিম্ন বাঙ্গালায় উদ্ভূত হয়। এই কল্পনা হইতেই গণেশমন্ত্রে পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কল্পনাকারক দিব্য চতুরতা করিয়াছেন, পৌরাণিক দেবতা গণেশও বিঘ্ননাশক, আর গ্রাম্য দেবতা দক্ষিণ-রায়ও ব্যাঘ্রভীতিহারক, সুতরাং দক্ষিণরায় দেবতাপ্রকাশক মুণ্ডটিকে গণেশমুণ্ড বলিয়া

---

* এই স্থলে প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক উক্তরূপ একটি প্রতিমা সভাস্থলে প্রদর্শিত হয়। বারুইপুর হইতে ইহা ঐইজন্য আনান হয়।

প্রকাশ করায় বেশ থাপিয়া গিয়াছে, অথচ গণেশের বহুকাল হইতে নিরুদ্দিষ্ট মুণ্ডটীর একটা সন্ধান ও সুব্যবস্থা হইয়াছে।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের নিকট জ্ঞাত হওয়া গেল, তাঁহাদিগের বড়ু গ্রামে আবার দক্ষিণরায়ের শক্তিমূর্ত্তিরও প্রতিমা প্রস্তুত ও পূজিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের মূর্ত্তির অবিকল অনুরূপ মূর্ত্তিই ঠাকুরাণীর মূর্ত্তি, কেবল তাহাতে গোঁপ নাই।

মেদিনীপুরেও দক্ষিণরায়ের পূজা হইয়া থাকে। আলীপুরের উকীল বাবু অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী পাতড়ায় প্রাচীন গণ্যমান্য মজুমদার-বংশে পৌষ সংক্রান্তিতে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। যশোহরে নরেন্দ্রপুর গ্রাম-বাসী মজুমদারদিগের বংশেও কালুরায় ও দক্ষিণরায় দেবতার পূজা হয়।

হাবড়ার দক্ষিণে আন্দুল মহীয়াড়ী গ্রামে দক্ষিণরায়ের এক বেদী আছে। এই বেদী মহীয়াড়ী গ্রামের পূর্ব্বতন জমীদার রায়বাবুদিগের বাটীর সম্মুখে এক খোলাজমীতে পুষ্করিণী-তীরে স্থাপিত। এই পুষ্করণী ও জমী রায়বাবুদিগের বাটীসংলগ্ন। ইহা অশ্বত্থ তলার পুকুর নামে খ্যাত। এই দেবতার পীঠ রায়বাবুদিগের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক স্থাপিত। কিরূপে ইঁহারা এই দেবতা পাইলেন, তাহার কারণ এখানে দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। রায় বাবু-দিগের আদিপুরুষ হরিপালনিবাসী মহেশ্বর বটব্যাল নামক একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ শঙ্খ-বিক্রয় উপলক্ষে আন্দুলের চৌধুরীদিগের বাটীতে উপনীত হন। চৌধুরী-গৃহিণী সুপুরুষ যুবক ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বিবাহিত কিনা। মহেশ্বর বলেন, আমরা শ্রোত্রিয়, বিবাহ আমাদের অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। তখন মহীয়াড়ীতে বাবুরাম রায় নামক এক পিরালী শ্রেণীস্থ ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা বয়স্থা হইয়াছিলেন। সামাজিক নিয়মে অপরে তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। চৌধুরী-গৃহিণীর সহিত বাবুরামগৃহিণীর সখিত্ব ছিল। তিনি এই সুযোগে সখিকন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টায় রায় বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বাবুরাম বাবু ধনদ্বারা এবং বাক্‌কৌশলে মহেশ্বরকে বশীভূত করিয়া একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহেশ্বর বিবাহ করিয়া পতিত হওয়ায় আর দেশে ফিরিলেন না, শেষে শ্বশুরের পরলোক হইলে তাঁহার বিপুল ধনে অধিকারী হইলেন। ক্রমে 'রায়ের জামাই' হইতে "রায়" উপাধিও তাঁহাতে সংক্রামিত হইল। তদবধি বটব্যালবংশ মহীয়াড়ীর রায় নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই মহেশ (বা তাঁহার পুত্র) মহীয়াড়ীতে বাটী নির্ম্মাণকালে এক ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল বৃহৎ বন কাটাইতে আরম্ভ করেন। সেই বনে এক বৃহৎ অশ্বত্থতলায় একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী প্রাপ্ত হন। পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবার সময় তিনটী ক্ষুদ্র মৃণ্ময় ঘট ও কয়েকটী মৃণ্ময় ক্ষুদ্র ঘোড়া (পীরের আস্তানায় যেমন ঘোড়া থাকে সেইরূপ ঘোড়া) একত্র প্রাপ্ত হন। মহেশ্বর যত্নে ইহা রাখিয়া দিলে রাত্রিতে স্বপ্নাদেশ হইল যে, "উহা বাবা দক্ষিণরায়ের ঘট। উক্ত পুষ্করিণীর সম্মুখে এক স্থানে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। প্রতি বিজয়াদশমীর দিন একটি ছাগবলি দিয়া পূজা

দিবে।" সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল। দেবতার জন্য সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল। মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু পরদিন প্রাতে উঠিয়া সকলে দেখিল, মন্দিরের নানাস্থানে আমূলাগ্র ফাটিয়া গিয়াছে। মন্দিরনির্ম্মাতা সে মন্দির ভাঙ্গিয়া আবার নূতন মন্দির গড়িলেন। আবার ফাটিল। এইরূপে ৩টি মন্দির ফাটিলে পর মন্দিরনির্ম্মাতা মহা আকুল ও বিষণ্ণ হইয়া দেবতার নিকট অপরাধ স্বীকার, ক্ষমাপ্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। দেবতা স্বপ্ন দিলেন যে আমি মন্দির চাহিনা, আমি বেদিতে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িব, বর্ষায় ভিজিব, শীতে কাঁপিব, বসন্তে মৃদু সমীরণ সেবন করিব, কেবল কুক্কুর শৃগালাদি হইতে রক্ষার জন্য আমার ঘটগুলি কেবল বাঁশের ঝুড়ি চাপা দিয়া রাখিয়া দিবে। তোমাদের কখনও কোন বন্য জন্তুর ভয় থাকিবে না। এ গ্রামে ব্যাঘ্রভয় বা ব্যাঘ্র হইতে কোন অনিষ্ট হইবে না, আর তোমাদের বংশে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কখন চুরী ডাকাতি ঘটিবে না। তদবধি দেবতা সেখানে তদবস্থ আছেন*। মহেশ্বর ঠাকুর হইতে রায় বংশে এখন ৮ পুরুষ হইয়াছেন। সুতরাং মহীয়াড়ীর দেবতাপীঠ যদি মহেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়াই ধরা যায়, তবে তাহা ২৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই দেবতার পূজাবিধি ধ্যানমন্ত্রাদি কিছু এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায় একাকী পূজিত হন না। কালুরায় নামে কুম্ভীরারোহী আর এক বীর দেবতার মূর্ত্তি (মুণ্ডমাত্র) পূজিত হয়। এইকাব্যেও সেই কালুরায়ের কথা আছে। অনেক স্থলে এই কালুরায় ও দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। অনেকে ইহাদিগকে শিবানুচর ভৈরব বলে। বাঙ্গালার এতদঞ্চলে মনসা, শীতলা, পাঁচুঠাকুর যেমন প্রচলিত দেবতা, সেইরূপ ঐ অঞ্চলে দক্ষিণরায়ও তদ্রূপ, তবে মনসা, শীতলা, সত্যনারায়ণ যেমন পুরাণের মধ্যেও স্থান পাইয়াছেন, দক্ষিণরায় তেমনটা হইতে পারেন নাই। পাঁচুঠাকুর, রাখালরাজ, ধর্ম্মঠাকুর, বাবাঠাকুর, সতী মা প্রভৃতি যেরূপে বাঙ্গালীর হৃদয়াধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, দক্ষিণরায়ও সেইরূপ। শীতলা, মনসা, সতী মা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতির প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্ লোকগুলিকে বাছিয়া লইয়া যেমন এক একটা স্বতন্ত্র উপাসক সম্প্রদায় (*cult*) স্থির করা যাইতে পারে, যেমন শীতলা পণ্ডিত, বিষহরীর দল, সতী মার দল, সেইরূপ অনেকে বলেন পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর দক্ষিণরায়সেবী লোকগুলিকে বাছিয়া লইলে, ঐরূপ আর একটি উপাসক সম্প্রদায় বোধ হয় স্থির করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যখন ব্যাঘ্রভীতি-নিবারণের জন্যই দক্ষিণরায় পূজিত হন ও তিনি নিজেই যখন ব্যাঘ্রবাহন, তখন ইঁহাকে ব্যাঘ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা

---

* প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত বঙ্গাধিপ পরাজয়ে সরস্বতী বেহালায় যে রাস্তার বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে এক বৃক্ষতলে এই দুই দেবতার মুণ্ডদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যাইতে পারে। বনাঞ্চলেই যখন ইঁহার পূজাধিক্য, তখন ইহাকে গ্রাম্যদেবতা বলা অপেক্ষা বনদেবতা বলাই বেশী যুক্তিসঙ্গত।

দক্ষিণরায়ের এই মহিমাগীত খানির প্রণেতার নাম কবি কৃষ্ণরাম দাস। ইঁহার বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থশেষে কবি কিছু বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না। বোধ হয় কিছুই দেন নাই, কারণ পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যপত্রিকায় প্রবন্ধেও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বিশেষ কিছু পরিচয় দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান পুঁথি* খানিতে কবির আত্ম-পরিচায়ক দুইটি মাত্র কথা পাওয়া যায়,—

(১) "নিমিতে গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উতপতি।
হইয়া যে একচিত, রচিয়া রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি॥"

(২) "কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে।
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবির বাস নিমতা গ্রামে, তিনি দাস উপাধিধারী মৌলিক কায়স্থ, তাঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। তিনি যেরূপ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে নীলকণ্ঠ দাসের প্রতি দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছেন, তাহাতে নীলকণ্ঠকে তাঁহার পুত্র বলিয়াই অনুমান হয়। কলিকাতা হইতে চারিক্রোশের মধ্যে, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে নিমতা গ্রাম। এই খানে কৃষ্ণরামের বাস ছিল। কৃষ্ণরামের বাস্তুভিটা এখনও পড়িয়া আছে; বহুকাল হইল, সে ভিটায় কেহই বাস করে না। নিমতা গ্রামের লোকেও ইহাকে কবি কৃষ্ণরামের ভিটাই বলিয়া থাকে। কৃষ্ণরামের বংশ নাই। ৺অক্ষয় কুমার দত্তের জামাতা বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মিত্রের বাড়ীর নিকটেই এই কবির ভিটা পড়িয়া আছে।

কবি কৃষ্ণরাম কত দিনের লোক, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। রায়মঙ্গলে কবি তাঁহার রচনা কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—

* "রায়মঙ্গলের" বর্ত্তমান পুঁথি খানিতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট। শ-ভেদ, জ-ভেদ, ন-ভেদ বা রেফ, র ফলা, য-ফলা ও ব-ফলার ব্যবহারের কোন নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। পদান্তের অকারান্ত উচ্চারিত ল-ও ন-গুলি রঅধিকাংশ ও-কারান্ত করিয়া লিখিত। পদ মধ্যগত "র কার" কোথাও "অ" কোথাও "র" দ্বারা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই পুঁথি খানিতে লিপিকর প্রমাদ যথেষ্ট। এখানি দেখিয়া কবি কৃষ্ণরাম শব্দগুলি কিরূপ বানানে লিখিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। এইজন্য অতঃপর আমরা এই পুঁথি হইতে যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিব, তাহাতে বানান ভুলগুলি সংশোধন করিয়াই তুলিব, কেবল বাক্য, ছন্দ বা ব্যাকরণগত প্রাচীন ব্যবহার গুলি এবং র কারের ব্যবহার এবং র ব্যবহার অবিকৃতই রাখিব। ছন্দের মিলের প্রতিও সর্ব্বত্র সমান যত্ন রক্ষিত হয় নাই।

"কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচয় শকের বৎসর॥"

এই দুই চরণে 'র' ও 'ল' এ মিল করা হইয়াছে দেখিয়া কেহ অসঙ্গত বা মধ্যে শ্লোকার্দ্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ ভাবিবেন না। "রলয়োরভেদঃ এই সূত্রানুসারে "রএ" 'ল' এ মিল হইতে পারে।

কবি কৃষ্ণরাম পূর্ব্বোক্ত কবিতায় যে রূপ শ্লথ ভাবে কালনির্ণায়ক হেঁয়ালীটি গাঁথিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে হঠাৎ বোধ হয় ৬১০৮ শকে ইহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, (বসু=৮, শূন্য=১০, ঋতুচয়=৬; অঙ্কের বামা গতি হেতু উহা হইতে ৬১০৮ শক হয়); কিন্তু তাহা হওয়া একবারেই অসম্ভব, কারণ শকাব্দা গণনায় এখনও ১৯ শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আমরা ইহাকে ১৬০৮ শকাব্দা বলিয়া স্থির করিলাম।

কবির শ্লথ-বিন্যস্ত কবিতা হইতে প্রাপ্ত ৬১০৮ অঙ্কটি হইতে আমরা যেরূপে ১০৬৮ পাইলাম তাহা এই রূপ;—উহা হইতে চারিটী রাশি হইতে পারে, প্রথতঃ ১৬০৮, দ্বিতীয়তঃ ১০৬৮, তৃতীয়তঃ ১০৮৬, চতুর্থতঃ ১৮৯৬; ইহার মধ্যে ১০৬৮ বা ১০৮৬ শকাব্দা কবি কৃষ্ণরামের কাল হইতে পারে না, কারণ তখনও বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে সেনবংশীয় রাজগণ উপবিষ্ট, তখনও বাঙ্গালায় মুসলমান প্রবেশ করে নাই; অথচ কবির কাব্যের দেবতার যত কিছু প্রতিপত্তি তাহা এক পীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই হইয়াছিল। ১০৬৮ বা ৮৬ শকে (১১৪৬ বা ৬৪ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা দূরে থাক, মহম্মদঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের প্রথম পাণিপথের যুদ্ধও ঘটে নাই, আর ১৮০৬ শকে কবির কাল নির্ণয় করিতে হইলে, কবি এখন হইতে কেবল মাত্র ১২ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হয়, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাঁহার বাস্তভিটাই আজ একশত বৎসরের অধিককাল জনশূন্য পড়িয়া আছে, বলিয়া গ্রামের লোকের বিশ্বাস! এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা ১৬০৮ শকাব্দাই কবির রায়মঙ্গল রচনার কাল স্থির করিলাম। তাহা হইলে তিনি এখন হইতে ২১০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ১৬০৮ শকে (১৬০৮+৭৮) ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হয়। এ সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অরঙ্গজেব উপবিষ্ট। তখন হুগলীতে ইংরাজের কুঠি স্থাপিত হইয়াছে, সম্রাটের আদেশে তাঁহারা রায়মঙ্গল রচনার পর বৎসরে হুগলী হইতে বিতাড়িত হন। তখনও কলিকাতায় ইংরাজের গতিবিধি হয় নাই। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরাজের কুঠি প্রথম স্থাপিত হয়।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে ("বেদঋষি রস লয়ে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা") অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়, সুতরাং কৃষ্ণরাম ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, এবং কৃষ্ণরাম যখন কবি হইয়াছেন তখন ভারতচন্দ্র হয়ত কবিতার 'ক' শিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কবি কৃষ্ণরাম "রায়মঙ্গল" আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপ;—

"করজোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়
ঠাকুরের চরণ কমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী, পঞ্চ পাত্র সাথে আনি
ভুর ঘটে ভকত বৎসল॥
তোমা বিনা প্রভু কই যারে যাহা কর এই
আমল আঠার-ভাটীর।
বহে হীরাবাঘ ঘোড়া পরিধান দিব্য জোড়া
উড়নি ঘুড়নি পরিপাটী॥
বেসবার তাড়বালা, কনকের কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুই কাণে।
বৈরিদণ্ড অচিরাৎ কঠিন কামান * হাত
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে॥
পরিসর পিঠে ঢাল করে খর তলয়ার
কাটারী কোমরে করা ছুরী।
শুভে† যার কুপি‡ ভাগে মণি চুনি ভাগে ভাগে
মনোহর মুকুতার ঝুরি॥
সোণার বরণ তনু অশ্বিনী সাগর জনু§
নিশা ফনী অসন (?) বিজয়।
বিশাল লোচন জোর শ্রবণ অবধি ওর
চাহনি চমকে রিপুচয়॥
নল নাল মধু আর সর্ব্ব তুয়া অধিকার
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা।
যত দ্রব্য চলে নায় বাছি (?) ভাল যায়
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥
পূজা করি এক মনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাঞি।
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি॥
ডিঙ্গা জঙ্গ গোটে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা।

---

* কামান—ধনু, যথা,—'কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা খানি।"—চণ্ডীদাস।
† শুভে—শোভে। ‡ কুপি—হার্তল, মুষ্টি। § সাগরজনু—সাগরজাত ঘোড়া।

ঐ পদ পূজিলে হয়　নহিলে কিছুই নয়
অনুভব কত ঠাঞি জানা ॥
মূঢ় যেবা নাহি মানে　ভালমতে শেষে জানে
কর্ম্মভোগ সকলের গোড়া।
কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে　কিবা কোপে ঘাড় ভাঙ্গে
রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া ॥
বড়খাঁ গাজীর সাথে　মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তার পর।
কালুরায় বন্ধু বটে　সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর ॥
রণে বনে রাজস্থানে　সদত আনন্দ মনে
তোমার সেবকে দুখ কিবা।
বলে কবি কৃষ্ণরাম　নায়কের পূর কাম
গায়নে বায়নে বর দিবা ॥

কবি কৃষ্ণরাম "রায়মঙ্গল" কেন লেখেন, কিরূপে লেখেন, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠেই জানা যায়। কবি বলিতেছেন ;——

"শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন।
যে মতে রচিল এই কবিতা রচন ॥
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িশ্যা তাহার একতপ্পা* বিশ্বাম্বর ॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলঘরে ॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পিঠে বারাইল এক মহাজন ॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটীর মাঝে হইব প্রচার ॥
পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে নাহি তার কার্য্য ॥
মসান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।

* তপ্পা গ্রাম।　　　　কতকগুলি সমষ্টি।

চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায় জাগরণ ॥
ফাকুটি নাকুটি আর করে রঙ্গি ভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী ॥
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহার তবে সংহারিবে বাঘে ॥"

কবি কৃষ্ণরাম খাসপুরের অন্তর্গত তরফ বড়িশায় গিয়া এক গোয়ালার গোলঘরে শুইয়া স্বপ্নাদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। মাধবাচার্য্যের লিখিত গানে দেবতা প্রীত না হইয়া স্বপ্নে তাহাকে গীত রচনার আদেশ করেন। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য দেবতার নিকট এমন আদেশ বাঙ্গালার প্রায় সকল কবিরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ভারতের, রামপ্রসাদের, মুকুন্দের, সকলেরই এরূপ ঘটিয়াছিল, কিন্তু কাহারও দেবতা এরূপ একের রচনায় ক্ষুণ্ণ হইয়া অপর কে গানরচনা করিতে আদেশ দেন নাই, সুতরাং বোধ হয় যে কবি বড়িশায় গিয়া মাধবাচার্য্যের রচিত রায়মঙ্গলের গানে শুনেন। এই গানে মশানের পালা ছিলনা, গায়নেরা তজ্জন্য গান ফিরাইয়া জাগরণ গাহিত ও রঙ্গ ভঙ্গি করিত দেখিয়া কবি বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া এই গীতের পত্তন করেন, এবং অপরের যশোহরণমানসে কাব্য লিখিবার দোষটুকু কাব্যের প্রতিপাদ্য দেবতার স্কন্ধে চাপাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি তাঁহার কাব্যে কি কি বিষয়ের অবতারণা করিবেন, তাহা সংক্ষেপে দক্ষিণরাঁয়ের মুখে তাঁহার পরিচয়চ্ছলে বলাইয়াছেন। কবি স্বপ্নে দেবতাকে বলিলেন ;—

"তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু।
কেমনে রচিব গীত আমি অতি শিশু।"

এখানে শিশু অর্থে আমরা কবিকে অল্পবয়স্ক বলিতে চাহিনা, তিনি অল্প বয়সের অছিলায় স্বীয় অজ্ঞতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু অল্পবয়স্ক অর্থ করিয়া অনুমানিক ২০ বৎসর বয়স ধরিয়াছেন। দক্ষিণরায় বলিলেন ,—

"হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন।
আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন ॥
হেলা না করিও তবে পাইবা সকলি।
তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি ॥
(১) মুনিমুখে শুনিয়া ভূপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর ॥
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন।

বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি॥
হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
(২)　প্রথমে লইনু পূজা পাটনে ছলিয়া॥
(৩)　কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে।
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া॥
(৪) বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দি ছিল তুরঙ্গ সহর॥
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে।
সাতডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে॥
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল॥
মরণে শরণ কৈল সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে আমি গিয়া করিব রক্ষণ॥
বাঘ লইয়া আপুনি সমরে দিনু হানা।
বধিনু সুরথ রাজা আর যত সেনা॥
রাজা রাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব।
জিয়াইয়া দিনু আমি কৃপা অনুভব॥
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।
পিতা পুত্রে দুইজনে দেশেরে আইল॥
করিয়া আমার পুরি আমার মন্দির॥
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর॥
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজ স্থল॥"

ইহাতে কবি কৃষ্ণরাম স্বীয় কাব্যের যে সংক্ষিপ্ত আদর্শ স্থির করিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার কাব্যের মূল অন্যত্র দেখিতে পাইতেছি। দেবদত্ত সদাগরের গল্পের সহিত কবি-কঙ্কণের ধনপতি সদাগরের গল্পের সহিত প্রতি বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে। মুকুন্দের শ্রীমন্ত পিতৃ অন্বেষণে গিয়া কালীদহে কমলেকামিনী দেখিয়া ছিলেন, আর কৃষ্ণরামের পুষ্পদত্ত পিতার অন্বেষনের যাইতে যাইতে,—

"কালিদহ বাহিয়া সিংহল করি বাম।

রাজদহে উত্তরিল ভণে কৃষ্ণরাম॥ ২৬॥
রাজদহে গেল সাধুর তরি।
রায় সিরজিল সাগরের পুরী॥
সাগরে মাঝে পড়িল চর।
কত মনোহর সোণার ঘর॥
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ।
সমুখে সকল কিঙ্করগণ॥
বামে লীলাবতী মূরতি জায়া।
সকলি জানিবে দেবের মায়া॥
ডাহিনে সুগ্রীব আদিক পায়।
সমীরণ করে রায়ের গায়॥
নানা পরকার চৌদিকে তরু।
অকালে সকল সরস চারু॥
নারিকেল কুল রসাল গুয়া।
দেখিল বহুল জানিয়া কযুয়া॥
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে ক্ষেণেক বৈসে।
বকুল বহুত অলি হরিষে॥
নানা রসাবেশে সকল পক্ষ।
একেন্তরে চরে ভক্ষকে ভক্ষ॥
হরিণ মহিষ মানুষ বাঘ।
পুরে বসুমতী দারুণ ডাক॥
ময়ূর ভুজঙ্গ করয়ে খেলা।
কুঞ্জর কেশরী করয়ে মেলা॥
দেখিয়া সাধুর হৃদয় ধন্দ।
কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালী ছন্দ॥"

তাহার পর যেমন কবিকঙ্কণের আছে, সেইরূপ ঘটিল। তুরঙ্গসহরের রাজা সুরথের সভায় পুষ্পদত্ত এই কথা কহিলে, রাজা দেখিতে চাহিলেন, দেখিতে পাইলেন না, নাবিকেরা সাক্ষ্য দিল তাহারাও দেখে নাই; ক্রমে পুষ্পদত্তের কারাগারবাস, মশানে হত্যার আদেশ, রায়ের বাঘ লইয়া বরপুত্রকে উদ্ধার, তাহার পর রাজকন্তার সহিত বিবাহ ইত্যাদি।

গল্পটীর আরম্ভ কিন্তু একটু স্বতন্ত্র প্রকার। বড়দা বা বড়দহের দেবদত্ত সিংহলের অপেক্ষাও দূরে তুরঙ্গসহরে বহুদিন হইল বাণিজ্য করিতে গিয়া রাজদহে দক্ষিণরায়ের ছলনায় পড়িয়া উপরোক্ত অসম্ভব ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ধনপতির ন্যায় সুরথ-রাজকারা-

গারে বন্দী হন। তাঁহার পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার সংবাদ না পাইয়া নিজেই দক্ষিণপাটনে যাইতে প্রস্তুত। নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য রতাই নামক বাউল্যাকে কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এই স্থান হইতে কাব্যের প্রকৃত আরম্ভ। ইহারই নাম জাগরণ পালা। আরম্ভ এইরূপ ;—

"এমনি প্রকারে কর অমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেলা নিজ স্থল॥
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতুচয় শকের বৎসর॥
ডিঙ্গা গঠাইব সাধু পাটনে যাইতে।
আদেশ করিলা কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে॥
চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।
লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই॥
খরধার কুঠারি বাছিয়া শতখান।
ভক্ষ্যদ্রব্য পরিপাটী নৌকায় সাজন॥"

এইরূপ অসম্বদ্ধ ভাবে গ্রন্থারম্ভ দেখিয়া নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণরাম বাস্তবিকই তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন, মনের অদম্য উৎসাহ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মনের ভাবগুলি বিশৃঙ্খল ভাবেই কাব্যে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরই কাব্যের ঘটনার প্রধান সূত্রপাত এই রূপ ;—

"রজনী দিবস কাটে লেখা জোখা নাই।
পর্ব্বত প্রমাণ মাত্র রাখিল সাজাই॥
বুঝিয়া রতাই বলে আর নাহি কাজ।
জয় হুলাহুলি হৈল বাউল্যা সমাজ॥
ইহাতে হইল ডিঙ্গা সপ্ত অষ্ট খান।
হইবে পরম সুখী সাধুর সন্তান॥
এ কথা শুনিয়া তবে বাউল্যা সকলি।
কুঠার ধরিয়া উঠে বড় কুতূহলি॥
দক্ষিণরায়ের এক ব্রহ্মপূজাশানি। (?)
সেই ত বনেতে আছে কেহ নাহি জানি॥
দেখিয়া ডাগর গাছ সভে মেলি কাটে।
তিলেক বিলম্ব কর পরমাদ ঘটে॥
দক্ষিণরায়ের ক্রোধ ইহাত জানিয়া।
আদেশিল ছয় বাঘ নিকটে আনিয়া॥

মামুদা, কুমুদা, শুদা, বাঘ টঙ্গভাঙ্গা।
বজ্রদন্ত খান দাউদা চক্ষু যার রাঙ্গা॥
সমুখে রহিল তারা করিয়া প্রণাম।
হইল রায়ের আজ্ঞা বলে কৃষ্ণরাম॥"

তাহার পর রায়ের আদেশে রতাই ও তাহার পুত্র ব্যতীত রতাইয়ের ছয় ভাইকে বাঘে বিনাশ করিল, কিন্তু তাহাদের দেহ নষ্ট করিল না। ভ্রাতৃশোকে রতাই কাঁদিয়া বলিল,—

"যদি করি পরিণয় বহু পুত্র কন্যা হয়
সহোদর ভাই নাহি মিলে।
এক কালে অদর্শন হইল মোরে ছয় জন
এই ছিল এ পাপ কপালে॥
প্রাণের সংহতি জায়া ঘরেতে আইল থুয়া
গোঁয়াইল আমার সংহতি।
তুলনা কহিব কত আজ্ঞাকারী অবিরত
অবগত নহে এক রতি॥
কি কাজ দেশেতে গিয়া কি বল বলিব যেয়া
এ মুখ দেখাব কোন লাজে।
পুত্র তুমি যাও ঘরে কহিও সভার তরে
ছয় ভাই মৈল বন মাঝে॥"

কাঠুরিয়ার এই বিলাপ টুকু ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপের মত কবিত্বপূর্ণ বা কবিকঙ্কণের ফুল্লরার দুঃখবর্ণনার মত জলন্ত না হউক, কিন্তু বড় সুন্দর সহৃদয়তাপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময়।

তাহার পর রতাই স্বহস্তে নিজ শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণীতে আদেশ করিলেন ;—

"আমারে না জানি নর পূজ্য জানি ঈশ্বর
কাটিয়াছে কুঠারি ধরিয়া।
সেই অপরাধ রাগে আসিয়াছে ছয় বাঘে
ছয় ভাই ফেলিল মারিয়া॥
আমি দক্ষিণের রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
আঠারোভাটিতে পূজে সভে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সবিধান
ছয় ভাই জীয়াইব তবে॥"

দৈববাণী শুনিয়া রতাই তাহাতেই প্রস্তুত। পাছেই দেবতার আবাহন ও পূজা

করিয়া পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইল। পুত্রও দেবকার্য্যে প্রাণ যাইবে এবং পিতৃব্যগণ প্রাণ পাইবে এই আনন্দে বলিল,—

"শুভক্ষণে মোর জন্ম হইল ধরণী॥
লাগিব দেবের কার্য্যে ভাল হইব গতি।
ছয় খুড়া জীয়াইব যশপূর্ণ ক্ষিতি॥
রায় তুষ্ট হইবেন কি বলিব তায়।
ইহার অধিক ভাগ্য নাহিক আমার॥"

বৃষকেতুর শিরশ্ছেদের সময় নারায়ণ কর্ণপদ্মাবতীকে চক্ষুর জল ফেলিতে ও শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণরায় বন্য দেবতা হইলেও ততটা নিষ্ঠুর আদেশ দেন নাই; কাজেই রতাই নিঃশঙ্কচিত্তে,—

"শুনিয়া পুত্রের বোল কান্দিতে কান্দিতে।
হিয়া বড় উতরোল না পারে ধরিতে॥
গাছে অবস্থান করি পূজে দক্ষিণেশ।
করে খড়্গ লইয়া পুত্রের ধরে কেশ॥
আমি কিছু নাহি জানি সকল জানেন রায়।
এক কোপে কাটিয়া দুখান করে তায়॥
পুত্রে বলিদান দিয়া পূজিল রতাই।
সাক্ষাৎ হইল রায় আসিয়া তথায়॥"

তখন দেবতা দেবতার মত কার্য্য করিলেন, তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে বাঁচাইয়া দিলেন। আটজনে দেবতাকে স্তব করিল, দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। এইস্থানে কবির গল্পের একাংশ সমাপ্ত হইল; তবে গানের পালা সমাপ্ত হয় নাই।

একটা কথা এই স্থানে বলিবার আছে। আমরা কবির বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ এতক্ষণ করি নাই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহাকে এ সময় ২০ বৎসর বয়স্ক বলিয়া অনুমান করিতে প্রস্তুত। তাঁহার বয়স যাহাই হউক, এসময় কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বেশ মার্জ্জিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে পুত্রকে বলিদান দিবার সময়ে রতাইয়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।—

"আমি কিছু নাহি জানি সকল জানেন রায়।"

ইহাতে দেবনির্ভরতা, ব্রহ্মে কর্ম্মফলার্পণ, জীবের নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞানের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পরিস্ফুটতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

তাহার পর তাহারা দেশে আসিল। পুষ্পদত্ত নৌকা গড়াইতে মনোযোগী হইলেন। উপযুক্ত কারিকর পাইবার আশায় পুষ্পদত্ত জননীর আদেশে সোনার চেঙ্গড়া নগরে ঘুরাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ যে নৌকা গড়িতে সমর্থ হইবে, সে আসিয়া সেই চেঙ্গড়া ধরিবে। কৈলাসের

শিব হনুমান্ ও বিশ্বকর্ম্মাকে এই কার্য্যের জন্ম পাঠাইলেন। তাঁহারা মনুষ্যরূপে আসিয়া চেঙ্গড়া ধরিলেন, অর্দ্ধেক রাত্রিতে সাতখান ডিঙ্গা গড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিলেন এবং স্বপ্নে সেকথা সাধুকে জানাইয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া গেলেন। পর দিন পুষ্পদত্ত এই দৈবডিঙ্গা পূজা করিয়া তাহার মধ্যে যেখানি প্রধান তাহার নাম 'মধুকর' রাখিলেন। তাহার পর স্বদেশের রাজা মদন নামক নৃপতির আদেশ লইয়া আসিলেন। পুষ্পদত্তের মাতা সুশীলা এসকল শুনিয়া খুল্লনা লহনার স্থায় না কাঁদিয়া দক্ষিণরায়ের স্তব পূজা করিতে বলিলেন। দেবতা প্রীত হইয়া প্রসাদান্ন দান করিলেন ও তাঁহার পুত্রকে সঙ্কটে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সুশীলা পুত্রকে ডাকিয়া,——

"রায়ের প্রসাদ দিল তনয়ের করে ॥
যতনে পাগেতে রাখো না ভাবিও আন।
রামের কবচ নহে এহার সমান ॥
যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।
ভাবিও দক্ষিণরায় দুখানি চরণ ॥
তিনি যদি সত্য হন আমি হই সতী।
কোন কালে না হইবে তোমার দুর্গতি ॥"

দেবপরায়ণা হিন্দু সতী স্ত্রী ভিন্ন ভরসা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারে না বা হিন্দুর কাব্য যত সামান্তই হউক না কেন, তদ্ভিন্ন আর কোন দেশের সাহিত্যে এরূপ কথা পাওয়া যায় না।

তাহার পর সাধুপুত্র পিতৃ-অন্বেষণে যাত্রা করিলেন, কবিকঙ্কণের মত কৃষ্ণরামও সাধু পুত্রের নৌকাপথবর্ত্তী স্থান সকলের বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে সেগুলি উদ্ধৃত হইল,——

"বাহ বাহ বলি ডাকে সদাগর মুনি।
বড়দহ ছাড়িয়া চলিল তরণী ॥

*   *   *   *

অনুকূল পবনে ডিঙ্গা চলিল গুণধাম।
পূজিয়া কল্যাণপুরে প্রভু বলরাম ॥
সঘনে আওয়াজ হয় মহা কুতূহল।
তাহার মিলনে গেল ডিহি মেদনমল ॥

*   *   *   *

দেখিল ডাইন ভাগে নগর বসত।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম গ্রাম বারাসত ॥

পূজিয়া অনাদ্যশিব চরণ তাহার।
খনিয়ায় শুনিল দক্ষিণরায় ঘর॥

* * * *

তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।
ঘিরিয়া ফকির করে হাজত সেলাম॥
হাঁস-আল মোরগ জবাই করে খাসি।
মনোহর কুসুম সন্দেশ রাশি রাশি॥
সিরণি অনেক দিলা সদাগর ভূপ।
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল একি অপরূপ॥"

ভূগোল জ্ঞানে কবিকঙ্কণ অপেক্ষাও কৃষ্ণরাম গুণবান্। যাহা হউক এই স্থানে গল্পের আর একটী শাখা গজাইল। বড়খাঁ গাজীর সহিত কিরূপে ও কি জন্য দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্বিবরণের এই সূত্রপাত হইল। এই ঘটনাতেই দক্ষিণরায়ের দেবত্বলাভ হয়।

"সিরণি অনেক দিলা সদাগর ভূপ।
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল একি অপরূপ॥
মুরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবা দেবী॥
বাঘের উপরে নাঞি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়॥
এমন প্রকারে পূজা কেন হয় এথা।
জান যদি কেহ শুনি এই দুই কথা॥
কর্ণধার বলে ভাই ইহার কারণ।
না জান আমার ঠাঞি শুন বিবরণ॥
শুন্যাছ বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারোভাটীর॥
দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
তার পর হুড়া হুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে॥
অধিকার বড় ধন সভে নিতে ধায়।
ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাঞি যায়॥
দক্ষিণরায়ের বড় বুকে মরে গাজী।
পড়িয়া উঠিল কায় বলে মায়াবাজী॥
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলার তাঁহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার॥"

বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তার পর দোস্তানি পাইল দোঁহে বর॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে।
কোন খানে দিব্য মূর্ত্তি বাঘের উপরে॥
বড়খাঁ গাজীর নামে যে খানে মোকাম।
সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম॥
মুরতি বানান নাহি কিবল ভাবনা।
ভকত জনের পূর্ণ করহ কামনা॥"

কবি যে বিবরণ দিলেন, ইহা হইতে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। দক্ষিণরায় যখন কৃষ্ণরামকে স্বপ্নচ্ছলে নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন, সে স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে প্রভাকর নামে এক ব্যক্তি দক্ষিণদেশে (বাঙ্গালার অবশ্য) রাজা ছিলেন, তিনি বন কাটাইয়া নূতন রাজ্য পত্তন করেন, এই রাজ্যের নাম আঠারোভাটী। আঠারোভাটী কোথায় ছিল তাহার স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। আমার অনুমান হয়, বনের কোন প্রাচীন অংশ এই নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। তাহার পর সেই রাজা প্রভাকরের শিববরে দক্ষিণরায় নামে একপুত্র হয়। দক্ষিণরায় ধর্ম্মকেতুর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। আর এক্ষণে দেখিতেছি যে, অধিকার লইয়া বড়খাঁ গাজীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই অধিকার দেবত্ব বা দেশের প্রভুত্ব? ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া বলিতে হইলে দেশের প্রভুত্ব বলাই উচিত। তৎপরে যুদ্ধে উভয়ের অস্ত্রে উভয়ে বিনষ্ট হন। মুসলমানেরা পীরের মোকাম স্থাপন করিয়া পীরকে দেবত্ব প্রদান করিল, আর হিন্দুরা তাহাদের দেখা দেখি বা অন্য কোন কারণে দক্ষিণরায়ের মুণ্ডমাত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকেও দেবত্ব দিয়া পূজার ব্যবস্থা করিল। এই সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে বলিয়াই, এই কাব্য খানি আজ আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইয়াছে। এসম্বন্ধে কবি আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আরও অনেক তত্ত্ব ক্রমশঃ জানা যাইবে। এ কাব্যের মধ্যে এই অংশটুকুই সারবান।

"পুষ্পদত্ত বলে কহ ইহা শুনি নাই।
কি জন্য হইল যুদ্ধ হইল কোন ঠাঁই॥
আসিয়া দিলেন বর কেমন ঠাকুর।
দোস্তানি হইল ফের বিসম্বাদ দূর॥
কর্ণধার কহিতে লাগিল বিবরিয়া।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন মন দিয়া॥
ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে।
এই ঘাটে চাপাইল বিধির ঘটনে॥
দক্ষিণরায়ের বারা দেখিলেক কূলে।

হরবর পুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে ॥
নানারত্ন ভূষণ তেমনি দিবা কেবা।
বিদায় মাগিল শেষে জোড় হাতে সেবা ॥
বড়খাঁ গাজীর পূজা না করিয়া যায়।
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায় ॥
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগরসুত।
ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর ॥
ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে নগর সিংহল।
পীরেরে কহিতে যায় ফকির সকল ॥
সেইত গ্রামেতে আছে গাজীর আন্দর।
নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর ॥
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সভে।
মুল্লুকের খবর না লও বাবা এবে ॥
পুজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা।
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড় এটা
বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহিক তিলেক।
মারিয়া আমারগর খেদায়ে দিলেক ॥
সরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।
না লও ফকিরপানা আজি হইতে থুক্ ॥
হেন কালে বলে বাঘ নাম কালানল।
শীকার করিতে বনে না পাই আমল ॥
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কেড়্যা।
শুনিয়া তোনার নাম সভে দেয় তেড়্যা ॥
মহুল্যা মলঙ্গী আর বাউল্যার ঠাঁই।
দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই ॥
এক বেটা মলঙ্গী খাইতে ছিলাম রাগে।
ধরে লয়ে গেল মোরে তিন কুড়ি বাঘে ॥
দেখিয়া ঠাকুর কত লাগিল আটিতে ॥
পীরের আমল নাই আঠারোভাটীতে ॥
আমার মলঙ্গা ধরে এই রাগ বড়।
আজ্ঞা দিল কাণ কাট আর মাতা মুড় ॥
আমার শালার পিশি নকলথী ছিলো।

পরিয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল॥
জামীন লইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।
জানাইতে আইলাম সাহেবের পাশ॥
একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোঁসা খান।
শাপ দিল সাধুরে সভার বিদ্যমান॥"

গাজীর সহিত রায়ের যুদ্ধ কেন ঘটে, কিরূপে ঘটে তাহার বিবরণ এই পাওয়া গেল, কিন্তু সঠিক কারণটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা আরও পরে আমরা দক্ষিণরায়ের মুখে শুনিতে পাইব।

আর একটী কথা, বড়খাঁ গাজী মুসলমান, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহা সুযুক্তি-প্রণোদিত নহে, এজন্য কৃষ্ণরাম তাঁহার সমস্ত কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দুতে এইরূপ গাঁথিয়া গিয়াছেন ;—

"ভাগ গিয়া (অশ্লীল) এবে কিয়া করে আব।
হোগা হারামজাদ খানে খারাব॥
শোস্তে হো দক্ষিণরায় এছা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী॥"

তাহার পর গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়া রায়ের মূর্ত্তি ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নাস্তানাবুদ করিল, সে পলাইল। তখন,

"খাঁড়ির বাড়ীতে রায় লইয়া পরিবার।
বটে বেণে আসিয়া কহিল সমাচার॥"

দক্ষিণরায়ের ঐতিহাসিকতা এই কবিতায় আরও প্রকাশিত হইয়াছে। খনিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে রায় সপরিবারে খাঁড়ির বাটীতে বাস করিতেন। খনিয়ায় গোলমাল বাঁধিলে বটে বেনে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়।

ইহার মধ্যে আরও একটি কথা আছে। দক্ষিণরায়ের বা গাজীর জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের মোকাম বা মূর্ত্তি হইয়াছিল, আর তাহার পূজা ও সিরণি লইয়া উভয়ে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া কবি এস্থলে বর্ণনা করিতেছেন, ইহা একবারেই অসম্ভব। পীর না মরিলে তাহার মোকাম বা আস্তানা হয় না, সুতরাং ধনপতি সদাগর কর্ত্তৃক পীরের অপমান কল্পনা ও তদুপলক্ষে উভয়ের যুদ্ধ ঘটনা একান্ত অমূলক ; ইহার প্রকৃত কারণ পরে বিবৃত হইবে।

তাহার পর রায় সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সেনার মধ্যে বনের বাঘই প্রধান। নানাবিধ নানাবর্ণের বাঘ সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পাত্র এই সময়ে বলিল, গাজী আপনার বন্ধু ছিল, হঠাৎ লোকের কথায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিত হয় না, একটা নিজের লোক পাঠাইয়া সঠিক সংবাদ লওয়া উচিত। রায় তাহাই করিলেন। লোহাজঙ্ঘ দানা দূত হইয়া গেল, সে গাজীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া

আসিল। গাজীরও সেনাদল বাঘমাত্র। বনের বাঘ দুইদলে বিভক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গাজীর বাহন ও প্রিয় ব্যাঘ্রের নাম খান দাউদা (দাউদ খাঁ) এবং রায়ের বাহন ও প্রিয় ব্যাঘ্রের নাম হীরা। নাম দেখিয়া আমার মনে হয় যে গাজীর দলে দাউদ খাঁ ও রায়ের দলে হীরা নামে এক ব্যক্তি সেনাপতি ছিল। উভয় দল খনিয়ায় একত্র হইল। খাঁড়ি হইতে খনিয়ায় উত্তরমুখে যাইতে হয়;——

"দল বল বাঘের লইয়া মহাকায়।
ধাইল উত্তরমুখে দক্ষিণের রায়॥"

তাহার পর উভয় দলের যুদ্ধ বাঁধিল। ফকীরেরা মারা যাইতে লাগিল দেখিয়া,——

"নিষেধ করেন প্রভু রায় মহারাজ।
ভিখারী মারিব মোর কত বড় কাজ।"
বলিয়া তাহা নিবারণ করিলেন, অতঃপর ওদিকে
"তোবা তোবা সমরে বাঁচিয়া অতঃপর।
বড়খাঁ গাজীর কাছে জানায় খবর॥
কি কর বসিয়া গাজী কার মুখ চায় (ও)
মটুকের বেটী লইয়া উঠিয়া পলায় (ও)
আসিয়া ঘিরিল রায় বাঘে বেড়ে গাঁ।
বুঝিয়া বিধান কর গাজী বড় খাঁ॥" ইত্যাদি।

এই কবিতাটিই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। এতদ্বর্ণিত ব্যাপারটি পরে কাব্যেই বিশদ করিয়া বলা আছে, তাহা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে। তাহার পর গাজী এইরূপে তিরস্কৃত ও সশস্ত্র হইয়া খাঁ দাউদা বাঘে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ রায়ের সম্মুখীন হইল।

তারপর রামায়ণ মহাভারতের বীরগণের ন্যায় গাজীর সহিত রায়ের পবনবাণ, অনলবাণ, অনিলবাণ ইত্যাদি লইয়া এক পালা খুব যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে গাজী অবশেষে——

"কোপে কায় কম্পমান, ছাড়িয়া কামানবাণ
　　খরশান খাঁড়া নিল রুখি॥
দিয়াছিল পেগম্বর, চোট ব্যর্থ নহে যার
　　হীরাধার নিরশয় যম।
মারিতে দক্ষিণরায়ে ধায় গাজী অনিবারে
　　বলবন্ত সাহস অসম॥
বেড়িপাক দিয়া সাটে সাত হাজার বাঘ কাটে
　　কুঠারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে সমুখে আসিয়া তবে
　　হানে কোপ রায়ের গলায়॥

কিঞ্চিৎ না করে কার উথাড়িয়া তরআল
তথাচ মহিমা তার এই।
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি
যেমন দক্ষিণরায় সেই॥
অকালে প্রলয় পড়ে ঢালখাঁড়ায় ছুহে নড়ে
সাঁজোয়ার কোপ ঝন ঝন।
ক্ষিতি করে টল মল, হেন বুঝি যায় তল,
বিকল সকল দেবগণ॥
কবি কৃষ্ণরাম ভণে, দুই সিংহ যেন রণে
কারে না করিহ অল্পবোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ॥
অর্দ্ধেক মাথায় কালা এক ভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলম্বিনী হাতে!
ধবল অর্দ্ধেক কায়, অঙ্গনীল মেঘ পায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে॥
এইরূপ দরশন পাইয়া যে দুইজনে
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিল নাথ, বুঝাইয়া হাতে হাত
দুই জনে দোস্তানি পাতায়॥ ইত্যাদি।

এইরূপে ভগবান অর্দ্ধ শিব অর্দ্ধ মহম্মদ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া রায় ও গাজীর বিবাদ মিটাইয়া আবার উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবস্থামত স্থির হইল,—

"বড়খাঁর মহাকায় গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ক্ষতে।
যেখানে পীরের নাম বানান মোকাম থান
যত ফয়তালা নামতে॥
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতজন।
যারা তার রক্ষে যাবে, হইবে ঠাঁই ঠাঁই তবে
কোন খানে মুরতি সকল॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা] [১৩০৩, মাঘ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

ঈশাননাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ।

যে সমাজে যখন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, সেই মহাপুরুষের প্রভাবে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, তাঁহাদের সাহিত্যও উন্নতি লাভ করে,—সাহিত্য তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ হয়,—নব ভাবে, নব বলে বলীয়ান্ হয়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যেরও একদা সে সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন বঙ্গভাষার শৈশব অবস্থা, তাই সে মহাশক্তি ভাষা শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিতেই পর্য্যবসিত হয়। আমরা বৈষ্ণবসাহিত্য ও চৈতন্যলীলা-বর্ণনার বাহুল্যতার কথাই বলিতেছি। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় (অনুবাদ ভিন্ন) মৌলিক গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিতে পাই।

এই লীলালেখকগণের আদর্শ শ্রীহট্টবাসী মুরারিগুপ্ত। ইনি বাঙ্গালায় অনেক পদ এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ "চৈতন্যরচিত" (মুরারিগুপ্তের কড়চা) রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অনুসঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য। মহাপ্রভুর ন্যায় ইঁহাদের লীলাকথাও অল্পবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর চরিত্রগ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈত-প্রকাশ এবং অদ্বৈত-মঙ্গলই প্রধান। উভই গ্রন্থই অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য প্রণীত ও প্রামাণ্য; কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আমরা এই গ্রন্থ খানিরই বিশেষ আদর করি; এ প্রস্তাবে ঈশাননাগর-প্রণীত অদ্বৈতপ্রকাশের কথাই বলিব।

বলিয়াছি, ঈশান-নাগর শান্তিপুরের বিখ্যাত অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ও অনুচর। ঈশানের পিতা দরিদ্র ব্যক্তি—আত্মীয় বন্ধুবিহীন। ঈশানের যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার বয়ক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র; পাঁচ বৎসরের অপোগণ্ড শিশু লইয়া দুঃখিনী ঈশানজননী ভীষণ সংসার সাগরে আসিলেন, ঘরে যৎসামান্য তৈজস পত্র ছিল, প্রতিবাসিগণের পরামর্শ ও আদেশে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং তদ্দ্বারা কোন প্রকারে পতির ঔর্দ্ধদেহিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা হইল বটে, কিন্তু ঈশানের প্রাণরক্ষার উপায় থাকিল না! ঘরে থাকিলে না খাইয়া সপুত্রে মরেন, কাজেই অনাথা বিধবা গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কে তাঁহার শিশুর মুখে দুটি অন্ন তুলিয়া দিবে? এ বিপদে হে শঙ্কর! হে বিশ্বেশ্বর! তুমি ব্যতী ... ধবার আশ্রয়দাতা আর কে আছে?

হস্তগত হয় নাই।

হঠাৎ অদ্বৈত প্রভুর কথা বিধবার ম ... দ্বৈতের প্রভাব তখন সমস্ত

বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। জীবের প্রতি অদ্বৈতের অপার করুণা, অনাথ নিরাশ্রয়ের প্রতি তাঁহার অসীম সমবেদনা প্রভৃতি স্মরণ হওয়ায় বিধবার হৃদয়ে ভরসা হইল, মনে বল আসিল। বিধবা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া শান্তিপুরাভিমুখে ধাবিতা হইলেন।

ঈশানের দুঃখিনী জননী যে দিন অদ্বৈতের শান্তিভবনে উপস্থিত হইলেন, সে দিন অদ্বৈতগৃহে আনন্দোৎসব, সেই দিন অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ তনয় অচ্যুতানন্দের শুভ বিদ্যারম্ভ ছিল। দীর্ঘ পর্য্যটনে বহুক্লেশে বিধবা সেই উৎসব দিনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী আদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন, তাহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণে সেই আনন্দ-বাসরেই সীতা দরদরিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর নিরা-শ্রয় তনয়কে সীতা কোলে লইলেন, স্নেহে মুখচুম্বন করিলেন। এরূপ দিগন্তপ্রসারিত দয়া, এরূপ অপার কৃপার চিত্র দর্শনে বিধবার নেত্রে কৃতজ্ঞতার উপহার, মুক্তা বিন্দুর ন্যায় ঝরিতে লাগিল।

দুঃখিনীর ভাবনা শঙ্কর দূর করিলেন, বিধবার উপরে অনাথশরণ ভগবানের কৃপা হইল ; অদ্বৈত বিধবাকে আশ্রয় দিলেন। সে ১৪১৯ শকাব্দের কথা। ঈশান তখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক মাত্র। অদ্বৈততনয় অচ্যুত * ঈশানের সমবয়স্ক ছিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন—

"ক্রমে শ্রীঅচ্যুত পাঁচ বৎসরের হৈলা।
সেই দিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈত পদে আমি লইলা শরণ।
পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তখন॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

অদ্বৈত প্রভু ঈশানকে সেই শুভদিনেই মন্ত্রদান করিলেন, তাঁহার জননীও সে সৌভাগ্যে বঞ্চিতা হইলেন না। এইরূপে আশ্রয় পাইয়া ঈশানজননী যথাসাধ্য গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন—

"প্রভু দয়া করি মায়ে দিলা কৃষ্ণমন্ত্র।
মোরে হরিনাম দিয়া করিলা পবিত্র॥
মোরে পাঞা সীতাদেবী স্নেহ প্রকাশিলা।
আপন তনয় সম পোষণ করিলা॥
শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা ছিলা মোর মাতা।
কিছু কিছু মোর মনে পড়ে সেই কথা॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

ঈশান অদ্বৈতের যত্নে কালক্রমে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, ইহাই তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম ছিল ; তিনি গ্রন্থাদি

---

* অদ্বৈতপ্রকাশে অচ্যুতের জন্ম যে নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে গণনা করিলে ঈশানের জন্মশক পাওয়া যায়,—ঈশান ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ

প্রণয়নে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন নাই;—ভক্তির সুধারসে "বিভোর" থাকিলে যে দশা হয়, ঈশানেরও সে দশা ঘটিয়াছিল।

অদ্বৈতের জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার নবগ্রাম।* বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পিতামহ, পিতা এবং অনেক অনুসঙ্গী পার্শ্বদই † শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। অদ্বৈত প্রভুও শ্রীহট্টবাসী, শ্রীহট্ট হইতে ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি শান্তিপুরে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন, পরে পিতৃবিয়োগ হইলে শান্তিপুরেই চিরজীবন বাস করিতে সঙ্কল্প করেন। সেই হইতেই অদ্বৈত শান্তিপুরবাসী‡।

নবগ্রামের ব্রাহ্মণ অধিপতির নাম দিব্যসিংহ; অদ্বৈতের পিতা কুবের পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অদ্বৈতের শান্তিপুরগমনের পর যখন তিনি মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত হইলেন, যখন শত শত ব্যক্তি তাঁহার পদানত হইল,—লাউড়ের বৃদ্ধ রাজা দিব্যসিংহ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শান্তির আশায় তখন শান্তিপুরে গমন করেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস।‡‡ অদ্বৈতের বাল্যকাহিনী (যাহা নবগ্রামে ঘটিয়াছিল), সমস্তই ইনি জানিতেন এবং অতি সংক্ষেপে সংস্কৃতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, এই গ্রন্থের নাম "বাল্যলীলাসূত্র।"††

১৪৮০ শকাব্দে অদ্বৈত অপ্রকট হন; গুরুর দেহত্যাগে ঈশান অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন। শোকদগ্ধ ঈশানের জীবনভার বহন করা তখন এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; যাহাহউক তিনি আপন গুরুদেবের মধুর চরিত্র আলোচনা করিয়াই সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তখনই ঈশানের মনে একটা শুভ কল্পনা উদিত হয়, যাঁহার জন্য বঙ্গভাষা তাহার নিকট ঋণী। ঈশান স্বীয় গুরু অদ্বৈতের মধুর জীবনকাহিনী,

---

* "লাউড় প্রদেশে হয় যাহার বসতি।" (অদ্বৈতপ্রকাশ।)
ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে —
"বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয় ধাম॥"
"নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥"

† চৈতন্যভাগবতে যথা,—
"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। চন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোকপূজিত॥
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"

‡ অদ্বৈতপ্রকাশে বিস্তারিত এবং অদ্বৈতমঙ্গলে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

‡‡ কৃষ্ণদাসের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২শ পরি) আছে। অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে 'বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস' নামে তিনি অভিহিত হইয়াছেন।

†† এই গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু এখনও হস্তগত হয় নাই।

যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের বাল্য-লীলা তিনি দেখেন নাই। শ্রীহট্টে যাহা ঘটিয়াছিল, এবং শান্তিপুরে তাঁহার স্মরণাতীত কালে যে হিল্লোল উঠিয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তজ্জন্য ঈশান পশ্চাৎপদ হইলেন না, পূর্ব্বকথিত বাল্যলীলাসূত্র তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইল।

প্রসিদ্ধ পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস আচার্য্য নামক ব্যক্তিদ্বয় অদ্বৈতের আবাল্যসঙ্গী ছিলেন, ইঁহারা ছায়ার ন্যায় অদ্বৈতের অনুগমন করিতেন; ঈশান এই দুই জনের নিকট অদ্বৈতের অনেক কথা জানিতে পারেন; ইঁহাদের কথিত বিবরণই তাঁহার দ্বিতীয় অবলম্বন হইল, অতএব তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশান লিখিয়াছেন—

"আত্ম শোধিবারে এই দুঃসাহস কৈনু।
লীলা সিন্ধুর এক বিন্দু ছুঁইতে নারিনু॥
বিদ্যাবুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিনু ধরম তার শাখি॥
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে।
পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু বর্ণন॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

কিন্তু এই অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ শ্রীহট্টে (নবগ্রামে) বিরচিত হয়।

জ্ঞান-প্রবীণ অদ্বৈত বৃদ্ধকালে আপনার শারিরীক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া একদা ঈশানকে বলিয়াছিলেন—

"গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ আর সহে না পরাণে॥
ঝাট মুঞি জীবলোকের হৈমু অগোচর।
গৌর নাম গৌর গুণ কহ নিরন্তর॥
আর এক কথা কহি শুন সাবধানে।
তুঞি মোর প্রিয় শিষ্য আত্মজ সমানে॥
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌর নাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥
এই মোর আজ্ঞা সত্য করিহ পালন।
এত কহি কৈলা প্রভু মৌনাবলম্বন॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

ঈশানের প্রতি এই আদেশ ছিল, তাই অদ্বৈতের অন্তর্দ্ধানের পর ঈশান পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

ঈশানকে পূর্ব্ববঙ্গে (শ্রীহট্টে) ধর্ম্মপ্রচারার্থ যাইতে দেখিয়া অদ্বৈতপত্নী তাঁহাকে দুইটী আদেশ দিলেন; প্রথমতঃ অদ্বৈতচরিত্র বর্ণন করিতে—দ্বিতীয়তঃ শ্রীহট্টে গিয়া বিবাহ করিতে। বিবাহ বিষয়ে সীতার সহিত যে কথাবার্ত্তা হয়, ঈশান তাহা এইরূপে লিখিয়াছেন——

সীতার উক্তি—"অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুঞি করিলে বিবাহ॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

ঈশান কহিলেন, মাঁ! আমি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার প্রতি এ বিপরীত আদেশ কেন?

মুঞি কহিলাম মাতা বুঝি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

ঈশান কহিলেন, মা! তোমার আদেশ কিরূপে রক্ষিত হইবে? সম্মত হইলেও এ বুড়াকে কেই বা কন্যা দিবে?

সীতার উত্তর—"পূর্ব্বদেশ যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে।
বিয়া করাইবে ইহোঁ করিয়া যতনে॥
তহা গৌর, গৌর-ধর্ম্ম করিবা প্রচার।
তাহে জীবগণ বহু হইবে নিস্তার॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

বলা বাহুল্য যে অদ্বৈতের আজ্ঞার সহিত ঈশান গুরুপত্নীর আজ্ঞাও পালন করিয়াছিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন——

"শিরে ধরি এই সীতা মাতার আদেশ।
জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ॥
বংশরক্ষা করি প্রভুর (সীতার) আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউড়ে॥
তহা রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু আজ্ঞামাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥
সূত্র মাত্র লিখিনু মুঞি ঐছে আজ্ঞামতে।
ইথে কিছু দোষগুণ না রহু আমাতে॥
এই ভিক্ষা মাগোঁ শ্রোতা বৈষ্ণব চরণে।
মো অধমের অপরাধ ক্ষম নিজ গুণে॥
মুঞি অতি বৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্যপদে গ্রন্থ করি সম্প্রদান॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

শ্রীহট্টে ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশান অদ্বৈত প্রভুর লীলাঘটিত এই অদ্বৈতপ্রকাশ রচনা করেন। অদ্বৈতপ্রকাশকে কাব্য বলা যায় না, ইহা প্রকৃত জীবনচরিতও নহে, তবে

অদ্বৈতের জীবনকাহিনীর প্রধান প্রধান অধিকাংশ ঘটনা ইহাতে আছে। এইরূপ সঙ্ক্ষেপ বর্ণনার নাম "কড়চা" বা "সূত্র"। অতএব অদ্বৈতপ্রকাশের নামান্তর ঈশানদাসের কড়চা। ঈশান বলেন——

"সাধুমুখে শুনি আর যে কিছু দেখিনু।
তার সূত্র বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিনু॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

এই সাধুমুখের অর্থ পূর্ব্বকথিত পদ্মনাভ ও শ্যামদাসের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন। কোন কোন বৃত্তান্ত স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ হইতে শুনিয়াও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"এ হেন অদ্ভুত লীলা না দেখিনু মুঞি।
দেখিলা প্রত্যক্ষ মহাভাগ্যবন্ত যেঞি॥
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাব্জনিঃসৃত।
এই লীলারসামৃত পিঞা হৈনু পূত॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

বস্তুতঃ এই সুপ্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষীভূত ঘটনাই অধিক লিখিত হইয়াছে। শুনা কথা (—সেও যার তার কাছে শুনা নহে,) অল্পই বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্থলান্তরে লিখিয়াছেন—

"যাহা দেখি তাহা লিখি না বুঝিনু মর্ম্ম।
যৈছে শুক গীত গায় শিক্ষণের ধর্ম্ম॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

অদ্বৈতপ্রকাশ যখন প্রণীত হয়, গ্রন্থকার তখন বৃদ্ধ,—বয়স ৭০ বর্ষের উর্দ্ধ। গ্রন্থখানি ১৪৯০ শকে বিরচিত হয়। যথা—

"চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥" অদ্বৈতপ্রকাশ।

বৃন্দাবন দাসের ভাগবত ১৪৯২ শকে প্রণীত হয়, অদ্বৈতপ্রকাশ তাহার দুই বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী; ইহার পূর্ব্বে মৌলিক বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিক রচিত হয় নাই।

অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ* ও ঈশানের সংক্ষেপ বিবরণ এই খানেই সমাপ্ত হইল। ঈশানের বংশধরগণ এখন আর শ্রীহট্টের অধিবাসী নহেন; বন্য খাসিয়া জাতি কর্ত্তৃক লাউড় রাজ্য ধ্বংসের পর (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের পর) তাঁহারা শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। গোয়ালন্দের নিকট পদ্মানদীর পূর্ব্বপারে ঝাকপাল গ্রামে অদ্যাপি ঈশানের বংশধরগণ আছেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

* আমরা বহু পরিশ্রমে ১৭০৩ শকের লিখিত অদ্বৈতপ্রকাশের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। ঝাকপালে আদি গ্রন্থ আছে, এখানি তদ্দৃষ্টেই লিখিত। অদ্বৈতপ্রকাশ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ, ২২টী বৃহৎ অধ্যায়ে পূর্ণ। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে বাঙ্গালা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচুর উপকার হইবে।

১৩০২ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশি
রাসায়নিক পরিভাষার শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪৪৩	৯	mayalan	Malayan.
"	১১	নিশাদর্	নৌশাদর্।
৪৪৫	১৪	mateorites	Meteorites.
"	২১	acrotites	acrolites.
"	"	sideratites	siderolites.
"	নোট	ellipse প্রভৃতির	ellipse প্রভৃতির বাঙ্গাল
"	"	নেপচুনে	নেপচ্যুন।
৪৪৬	১৩	orianএর bel	orion এর belt.
৪৪৭	২০	অবস্থিতি স্থান	স্থান।
৪৫০	৩	Antinomus	Antinows.
"	"	Auser	Anser.
৪৫১	২১	মিতামিতরূপে	সিতাসিতরূপে।
৪৫১	৯	এবং	যথা, আর্দ্রা ও মৃগশিরা, পুষ্যা ও অশ্লেষা পরস্পর নিকটবর্ত্তী এবং
৪৫৫	১৬	Gemien	Gemini.
৪৫৬	১	Leinean	Linnean.
৪৫৭	২৫	Arios	Aries
৪৫৯	১৬	শ্বাস	শ্বান
"	১৭	Eridames	Erdanus
৪৬০	১০	Auser	Anser
"	১৮	Canar	Cancer
৪৬১	৪	কলস্বস্	কলস্বন
"	০৭	ক্ষেত্র	নক্ষত্র।
"	নোট	বিবরণেদ একা	বিবরণের ঐক্য
৪৬২	৮ ও ৯	ophinchus	ophicuhus

৪৬৩ পৃষ্ঠায় টীকার শেষে এই অংশ সংযোজিত হইবে। যথা—সিদ্ধান্তে উহার নাম ধ্রুবমৎস্য।

১৩০৩ সালের পত্রিকায় বিশেষ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১০১	৬	১৬শ শতাব্দীর	১০ম ১১শ শতাব্দীর
১০২	৫	সংশোধিত	সংসাধিত
১২০	২	প্রাণমুপাস্যজদ্	প্রাণামুপাস্যজদ্
২৭৩	৪	কেই	সেই
২৭৫	১৩	অসদৃশা	অসদৃশ
২৭৬	৬	সম্বন্ধতে	সংবতে

অদ্বৈত-মঙ্গল।

(হরিচরণ দাস-বিরচিত)

বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি প্রধান ছিলেন। সে তিন জন—অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—'মহাপ্রভু' এবং অন্য দুইজন 'প্রভু' বলিয়া পরিচিত। * বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে এই তিন জনেরই কর্তৃত্ব অসাধারণ। কিন্তু সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে অদ্বৈতাচার্য্যকেই মূল বলিয়া বোধ হয়। চৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন ও মদনগোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎপরে শান্তিপুরে আগমন করিয়া একক্ষুদ্রদল গঠন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যা ও স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। সেই সময় বঙ্গে তান্ত্রিকতার প্রাবল্যবশতঃ অধিকাংশ লোকই মদ্য-মাংস-ভোজনরত ও হিংসাদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অদ্বৈত এই সকল পাপ-পরায়ণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। কিন্তু ইহাদিগকে ভক্তির পথে আনয়ন আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত জানিয়া সর্ব্বদা ভগবানের নিকট তদীয় অবতারের প্রার্থনা করিতেন। এই প্রার্থনা করিতে করিতে বহুদিন গত হইল। ভগবানের অবতার হইল না, জীবের দুর্দ্দশা দূর হইল না। অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রার্থনা, ভগবানের অবতারের জন্য তাঁহার হুঙ্কার থামিল না। তিনি আত্ম-গোষ্ঠীর নিকট অন্তরের স্বর্গীয় বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বলিতেন, ভক্তগণ আশ্বস্ত হও, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য, পাপীর উদ্ধারের জন্য, শীঘ্রই ভগবানের অবতার হইবে। এই সময় নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর মিশ্রের জন্ম হইল।

বিশ্বম্ভরের বাল্য গেল; যৌবন উপস্থিত। তিনি এখন নবদ্বীপে 'নিমাই পণ্ডিত' বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপবাসী বিস্মিত, বিদ্যায় দিগ্‌বিজয়ী পরাস্ত। অদ্বৈত নিমাই পণ্ডিতের সুকুমার কান্তি ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া ভাবিতেন—আহা এই সুন্দর কান্তি, এই অগাধ পাণ্ডিত্য, ইহা যদি কৃষ্ণভজনে লাগে, কত সুন্দর হয়! দৈব ঘটনায় তাহাই হইল। পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমাই পণ্ডিত দাম্ভিক বিশ্বম্ভরমিশ্র ভাবোন্মত্ত হইয়া অদ্বৈতের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিলেন। যে অস্ত্রে জগৎ জয় হইবে, অদ্বৈত সেই অস্ত্র পাইলেন। বিশ্বম্ভরকে লইয়া অদ্বৈতগোষ্ঠী লীলাভিনয় ও নামকীর্ত্তন করিলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে নিমাই পণ্ডিতের মানবভাব দূর হইল। বহুদিন ধরিয়া পাপীর উদ্ধারের জন্য

---

* "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।" অদ্বৈতমঙ্গল।

অদ্বৈতাচার্য্য যাহা চাহিতেছিলেন, এখন দেখিলেন তাহা সম্মুখে উপস্থিত। অমনি গঙ্গা-জলে তুলসী দ্বারা নিমাইয়ের পূজা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বস্থাপন করিলেন।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে অদ্বৈতাচার্য্য 'সূত্রধার' ছিলেন। তিনি যাহা করাইয়াছেন, অন্যে তাহা করিয়াছেন। চৈতন্য নিজে অদ্বৈতকে এ কথা বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতের আদেশ ব্যতীত তিনি কিছু করিবেন না। যতদিন অদ্বৈত আজ্ঞা না দিয়াছিলেন, তত দিন তিনি, লীলা সংগোপন করিতে পারেন নাই। চৈতন্যলীলার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই অদ্বৈতের ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই সূত্রধারের কোন পৃথক্ জীবনীগ্রন্থ না পাওয়ায় সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থে অদ্বৈতের যে শেষ জীবন যায়, তদ্ভিন্ন অদ্বৈত চরিত্র জানিবার কোন উপায় নাই, বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল*। কিন্তু সম্প্রতি অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনীবিষয়ক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের নাম অদ্বৈতমঙ্গল; প্রণেতা হরিচরণদাস।

অদ্বৈতমঙ্গলে হরিচরণ দাস আপনার কোন পরিচয় লিখেন নাই। গ্রন্থপাঠে এই মাত্র জানা যায়, তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার আদেশেই এই গ্রন্থ লিখেন।

"প্রভুর নন্দন আর শাখা যে সকলে
আমারে দিলেন আজ্ঞা হৃদয়*।
আমি প্রভুর ভৃত্য তার আজ্ঞা বলে।
সাহস করিয়া লিখি শ্রীচরণ বলে॥
কবিতা ত নাহি জানি নাহি লিখি আন।
সহজে লিখি একথা করিয়া যতন॥"

অন্যত্র—

"প্রভুর যতেক লীলা তার এক কণে।
প্রভুনন্দনের আজ্ঞায় লিখিল যতনে॥"

অন্যত্র—

"শ্রীসীতা ঠাকুরাণী বন্দো তাহার তনয়।
যাহার আজ্ঞায় এহি গ্রন্থ যে হয়॥"

অদ্বৈতাচার্য্য দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের সহিতই তদীয় পুত্র ও শিষ্যগণ পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা অদ্বৈতের পূর্ব্ব জীবন জানিতেন না। একদিন অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী শান্তিপুর আগমন করেন। তিনি অদ্বৈতের পূর্ব্বজীবন অবগত ছিলেন। হরিচরণ দাস তাঁহার নিকট অবগত হইয়াই অদ্বৈতের পূর্ব্ব-

---

* অদ্বৈত জীবনী সম্বন্ধীয় আরও গ্রন্থ আছে। পূর্ব্বপ্রকাশিত "ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জীবনী লিখেন। বিজয়পুরীর আগমন ও অদ্বৈতজীবন বর্ণন সম্বন্ধে হরিচরণ দাস লিখিয়াছেন ;—

জন্ম লীলা দেখিছে কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেক্তে ভাবনা করি প্রভুপদধ্যানে॥
পুত্র ভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
হেন কালে আইলা তথা বিজয় নাম পুরী॥
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সে মুখে কৃষ্ণনাম।
কাঞ্চন শরীর হয় দিব্য তেজধাম॥
সভার অগ্রেতে পুরী কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি সকল কহিলা॥
ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥
ভরদ্বাজ মুনির বংশ জানি সর্ব্বকাল।
আচার্য্য পদবী হয় সদ্‌গুণ রসাল॥
সেহি বংশে জন্মিলা আসি বসুদেব আচার্য্য।
কুবের আচার্য্য নাম রাখিলা আচার্য্য॥
অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে।
সে কালে হুঙ্কার হৈল পৃথিবী ভিতরে॥
জয় জয় শব্দ হৈল পৃথিবীতে আচম্বিতে।
তবহি বসুদেব আসিলা অবনীতে॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রে আচার্য্য একালিক হয়।
রাশিনাম গণিয়া কুবের নাম কয়॥
ক্রমে ক্রমে অবস্থা কৈশোর পরিপূর্ণ।
সেহি গ্রামে মহানন্দ বিপ্র প্রবীণ॥
তার কন্যা হয় যেই বড়ই সুন্দরী।
ঘটক সংবাদ তার আনিল আচরি॥
দেবকী প্রায় সেহি মঙ্গল লক্ষণা।
নাভা নাম ধরে তায় পিতা বিচক্ষণা॥
বিবাহ হৈল কুবের আচার্য্যের স্থানে।
গ্রাম সহিতে সব ধন্য ধন্য মানে॥
সেহি গ্রামে বসি আমি ছিলাম পূর্ব্বাশ্রমে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরু তুল্য মানে॥

নাভা দেবী ভাগ্নি মোরে বলে সর্ব্বকাল।
আমিহ ভগিনী প্রায় করিএ তাহার॥
সেই সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু যে আচার্য্য।
আমি পূর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য॥

বিজয়পুরী অদ্বৈতের গ্রামবাসী, বয়ঃবৃদ্ধ, সম্পর্কে মাতুল; আবার এদিকে গুরুর সতীর্থ। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। কবি হরিচরণ দাস অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য। তিনি বিজয়পুরীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে কাল্পনিক কোন কথা আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ অদ্বৈতমঙ্গল অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানের অল্পকাল পরেই তদীয় পুত্রের তত্ত্বাবধানে রচিত।

অদ্বৈতমঙ্গলে গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ইহাতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে জলকেলি ও দান লীলার অভিনয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কোনও ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। হরিচরণ দাস পরবর্ত্তী ঘটনা কেন বর্ণনা করেন নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—

"চৈতন্য লীলা বর্ণিলা কবি কর্ণপুর।
তাহাতে জানিবা সব রসের প্রচুর॥
অদ্বৈত চৈতন্যপ্রশ্ন রসের অপার।
বর্ণনা করিলা তেঁহো অনেক প্রকার॥
আমি বর্ণিতে যে হয় পুনরুক্তি।
তাহাতে না বর্ণিল তারে করি ভক্তি॥
শ্রীপ্রভু মঙ্গলের আগ্রহ লাগিয়া।
জন্মলীলা কিছু লিখি প্রণতি করিয়া॥"

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হইবার, পর অদ্বৈতমঙ্গল রচিত হয়। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনার কাল ১৪৯৪ শক*। সুতরাং অদ্বৈতমঙ্গল ১৪৯৪ শকের পরে রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবসমাজে অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। অদ্বৈতমঙ্গলের পূর্ব্বে চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হইলে হরিচরণ দাস অবশ্যই উহার উল্লেখ করিতেন। অদ্বৈত-মঙ্গলে চৈতন্যচরিতামৃতের নাম না থাকায় সহজেই অনুমিত হয়, অদ্বৈত-মঙ্গল

---

* "শকে চতুর্দ্দশ শতে রবিবাজি যুক্তে
গৌরোহরি ধরণীমণ্ডল মাবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতীভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোঽয়ং আবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥" চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বে রচিত। পণ্ডিতবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের অল্পপরেই চৈতন্যচরিতামৃত* রচিত হইয়াছিল। অতএব চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের পরে ও চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৯৫ শকে (?) অদ্বৈত-মঙ্গল রচিত হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গ্রন্থ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বড় অধিক নাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে রচিত নিশ্চয় বলা যায় না।† বড়ই দুঃখের বিষয় বঙ্গের এই প্রতিভাশালী প্রাচীন কবির অতুলকীর্ত্তি অনুসন্ধান ও যত্নের অভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৈষ্ণবসমাজেও ইহার সংবাদ অধিক লোকে জানেনা। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবসমাজে প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহার হুঙ্কারেই ভগবান্ আবির্ভূত হন বলিয়া বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, কিন্তু যখন চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অদ্বৈত কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার অবসর লইলেন। ভাবোন্মত্ত চৈতন্যের জীবন-মহিমায় অন্য সকল চরিত্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লোকে চৈতন্যচরিত্রের প্রভাবে এত আকৃষ্ট হইল যে, তাহাদের আর অন্য দিকে দেখিবার অবসর রহিল না। চৈতন্যের সমকালে লোকের অবস্থা এই প্রকার হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে, চৈতন্যচরিতামৃতে বিবিধ তত্ত্বের সহিত মধুর মোহন চৈতন্যচরিত্র বিশদভাবে বর্ণিত হওয়ায় লোকে ঐ সকল গ্রন্থেই বিশেষ মনোনিবেশ করিল। অদ্বৈতের পূর্ব্বজীবনের সহিত এদেশবাশীর বিশেষ কোন সংস্রব ছিল না। শেষ জীবনে যাহার সহিত তাহারা পরিচিত ছিল, তাহা চৈতন্যের জীবনের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত অদ্বৈতের কোন জীবনীর প্রয়োজন তাহারা অনুভব করে নাই‡। এই কারণেই অদ্বৈতমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজেরও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত কি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী কি ঐতিহাসিক সকলের নিকটেই অদ্বৈতের পূর্ব্বজীবনের ঘটনাপূর্ণ অদ্বৈতমঙ্গল সমান আদর পাইবার উপযুক্ত।

কবি হরিচরণ দাস অদ্বৈতের জীবনকে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে লীলা আখ্যা দিয়াছেন। এই পাঁচ লীলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।—

(১) বাল্য লীলায় জন্ম।

(২) পৌগণ্ড লীলায় শান্তিপুর আগমন।

---

* ১৫৩৭ শকে চৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ হয়।—সাঃ পঃ সঃ।

† চৈতন্যভাগবত ১৪৯২ শকে রচিত হয়।—সাঃ পঃ সঃ।

‡ একথা ঠিক নয়। অদ্বৈতের জীবনী তৎকালে বৈষ্ণবসমাজে সকলে জানিতে অভিলাষী হইয়াছিল বলিয়াই অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। আমরা অদ্বৈতের জীবনী মূলক তিন খানি প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি।—সাঃ পঃ সঃ।

(৩) কৈশোর লীলায়—তীর্থ পর্য্যটন, বৃন্দাবন-গমন, মদনগোপাল-প্রতিষ্ঠা, ভক্তি-শাস্ত্রব্যাখ্যা, দিগ্বিজয়ীজয়, অদ্বৈত নাম-প্রকাশ।

(৪) যৌবন লীলায়—শান্তিপুরে বাস ও তপস্যা।

(৫) বৃদ্ধলীলায়—বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের অবতার, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা, পুত্রাদির জন্ম।

অদ্বৈতের জীবনে এই পাঁচ লীলা বর্ণনে ২৩ ভাগে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থে এই ভাগ গুলির 'সংখ্যা' নাম দেওয়া হইয়াছে। যে যে সংখ্যায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থ শেষে কবি তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ——

১। প্রথম সংখ্যা হয় গুর্ব্বাদি বর্ণন।
কৃষ্ণলীলা অনুক্রম বস্তু নিরূপণ॥

২। দ্বিতীয় সংখ্যায় পঞ্চ অবস্থার সূত্র।
বিজয়পুরী-আগমন পরম চরিত্র॥

৩। তৃতীয় সংখ্যায় বিজয়পুরীর সম্বাদ।
শ্রীভাগবত অর্থ প্রভুর আস্বাদ॥
প্রেমে গদ্‌গদ পুরী দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ।
শ্রীমাধবেন্দ্র সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত॥

৪। চতুর্থ সংখ্যাতে প্রভুর জন্ম কহিল বিজয়পুরী।
রাজপুত্রকে কৃপা কৈল শান্তিপুরবিহারী॥
প্রথম অবস্থা চারি সংখ্যায় লিখিলা।
বিজয়পুরী সম্বাদ তাহাতে জানিলা॥

৫। পঞ্চম সংখ্যায় রাজদণ্ড বর্ণন করিল।
শ্রীহট্টদেশের রাজা বৈষ্ণব হইল॥
এহি রাজা ছিল বৈষ্ণবদ্বেষী বড়।
বৈরাগী হইয়া প্রভুর কৃপা দঢ়॥
শ্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধিবট প্রাপ্তি হৈল তার।
তাহার ভাগ্যের কথা কি লিখিব আর॥

৬। ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রভুর শান্তিপুর গমন।
শ্রীহট্টদেশ ছাড়িয়া আইলা ততক্ষণ॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ ‡ ‡।
শাস্ত্রে বিখ্যাত প্রভু কভু নহে ভঙ্গ॥
এই দুই সংখ্যা দ্বিতীয় অবস্থা-বর্ণন।
পৌগণ্ড লীলার ক্রম জানিল সর্ব্বজন॥

দুই অবস্থায় হৈল চতুঃসংখ্যা লিখন।
এবে কৈশোর অবস্থা শুন সর্ব্বজন॥

৭। সপ্তম সংখ্যায় প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন।
মাতা পিতার পরলোক তাহাতে বর্ণন॥
বৈদিক ক্রিয়া গয়াপিণ্ড যতেক বিধান।
সকল করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ॥

৮। অষ্টম সংখ্যায় শ্রীমদনগোপাল প্রকট।
সূর্য্যঘাট কুঞ্জ প্রকট তাহার নিকট॥
শ্রীমদনগোপাল প্রকটি আজ্ঞা তার হৈল।
প্রকট করিয়া গোপাল সত্য করিল॥
পূর্ব্বরাগ স্বরূপ তবে মদনমোহন।
বিস্তারি কহিলা প্রভু তাহার কারণ॥
গোপাল আজ্ঞায় প্রভু আসিলা শান্তিপুরে।
শান্তিপুরে তপস্যা করেন প্রচুরে॥

৯। নবম সংখ্যায় শ্রীমাধবেন্দ্র সম্বাদ।
দীক্ষাবিধান প্রভুর তাহাতে বিখ্যাত॥
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র রহিলা শান্তিপুর।
গোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকট রসপুর॥
দোহার দ্বারে দোহা প্রকট হইলা।
দোঁহার আনন্দ বড় প্রেম উথলিলা॥

১০। দশম সংখ্যায় দিগ্বিজয়ী বিজয়।
অদ্বৈত নাম প্রকট তাহাতে যে হয়॥
প্রভু কৃপায় দিগ্বিজয়ী হইলা প্রধান।
প্রভুর স্বরূপ দেখিল করিয়া বিধান॥
চতুর্ভুজে দেখিয়া স্তুতি করিলা অনেক।
প্রভুর কৃপার পাত্র হইলা বিশেষ॥
এহি চারি সংখ্যায় কৈশোর লীলা বর্ণন।
তৃতীয় অবস্থা প্রভুর যে লিখন॥
তিন অবস্থায় সংখ্যা হইল দশ।
এবে কহি চতুর্থ অবস্থা নির্দ্দেশ॥

১১। একাদশ সংখ্যায় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
স্বরূপ কহিলা তারে শান্তিপুরবিহারী॥

কৃষ্ণদাস প্রভুর বড় কৃপাপাত্র।
তাহার লিখনে জানিল সব তত্ত্ব॥
অজান্ত পর্য্যন্ত প্রভুর সেবা যে করিলা।
বৃন্দাবনের সঙ্গী তেঁহো শান্তিপুর আইলা॥

১২। দ্বাদশ সংখ্যায় দেব মোহ পাইয়া।
ব্রহ্মার নিকটে গেলা সঙ্কোচিত হইয়া॥
অপ্সরায় মোহিতে নারিল প্রভুরে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় দেব আসি পূজা করে॥
ব্রহ্মা আসি হরিদাস জন্ম লভিলা।
হরিদাসের ঐশ্বর্য্য প্রভু বিস্তার করিলা॥

১৩। ত্রয়োদশ সংখ্যার প্রভুর অন্তর্দ্দশা বর্ণিল।
যাহাতে জানিল কুঞ্জ সেবা হইল॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহা সেবা বিরলে করি।
অভিপ্রায় জানাইল প্রেম আচরি॥
শ্যামদাসের পূর্ব্বে যে অবস্থা কহিল।
প্রভুর কৃপায় তাহা একান্ত হইল॥
কীর্ত্তন করিয়া সুখ দেন শ্যামদাস।
আর কত শাখা বর্ণিল আভাস॥

১৪। চতুর্দ্দশ সংখ্যায় শ্রীনাথ সংবাদ।
রূপ সনাতন দোহাকে প্রভুর প্রসাদ॥
দোহার দ্বারে যে কার্য্য করিবেন প্রভু।
ক্রম করি করিলা সব অপেক্ষা মহাপ্রভু॥
এহি চারি সংখ্যায় যৌবন লীলা।
চতুর্থ অবস্থা যাহারে কহিলা॥
চারি অবস্থায় চতুর্দ্দশ সংখ্যার গণন।
ক্রম করি জানিবেক সবে দিয়া এক মন॥

১৫। পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রভুর বিরহ বর্ণন।
সীতার পরিণয় হইল অপূর্ব্ব কথন॥
তাহার কনিষ্ঠ শ্রী ঠাকুরাণী।
পিতা আনিয়া প্রভুকে দিল আপনি॥
শিষ্য প্রসাদ পাত্র গুরুসঙ্গে বসি।
কেশ খসিল প্রভুর অন্ন পরিবেশি॥

দুই হস্তে পরিবেশি আনি হাতে ধরি।
আর দুই হস্তে ফুল বান্ধিল প্রচারি॥
চতুর্ভুজে প্রকাশ দেখাই সবে।
চমৎকার পাইল সবে　*　*॥

১৬। ষোড়শ সংখ্যায় সীতা দেবীর দীক্ষা।
সর্ব্বতত্ত্ব কহিলা প্রভু করাইল শিক্ষা॥
আপনার স্বরূপ জানাইলা সীতার স্বরূপ।
সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য সীতার অনুরূপ॥

১৭। সপ্তদশ সংখ্যায় বর্ণিল নিত্যানন্দ-জন্ম।
বলদেব নিত্যানন্দ জানাইল মর্ম্ম॥
দৈত্যকে কৃপা করি নিত্যানন্দ রায়।
গঙ্গার মাহাত্ম্য দেখাইল সবায়॥

১৮। অষ্টাদশ সংখ্যায় লিখি মহাপ্রভুর জন্ম।
অদ্বৈত হুঙ্কারে সব কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড॥
হুঙ্কার করিয়া আনিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহা এক শচীর নন্দন॥
তাহারে সেব্য করি আপনে সেবিলা।
মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শচীকে দীক্ষা দিলা॥

১৯। ঊনবিংশতি সংখ্যায় প্রভু জললীলা করিলা।
রাধিকার জ্যেষ্ঠ সখী সীতাকে জানাইলা॥
রাধিকার পক্ষ প্রভু কনিষ্ঠ সখী হৈয়া।
নিত্যলীলা যবে সখী জানাইলা॥
কামদেবের সৌভাগ্য প্রভুর কৃপাপাত্র।
অষ্টক করিয়া প্রভুকে বর্ণিল যে তত্র॥

২০। বিংশতি সংখ্যায় প্রভুর বদন প্রকট।
সীতাকে দেখাইলা মহাপ্রভু বড়ই সঙ্কট॥
মহাপ্রভুর লাগিয়া দুগ্ধ রাখিয়াছিলা সীতা।
অচ্যুতানন্দ খাইল দুগ্ধ হইয়া বিস্মিতা॥
চাপড় মারিলা সীতা অচ্যুতের গায়।
মহাপ্রভুর গায় সেহি দাগ লাগি রয়॥
দোঁহার শরীরে এক দেখাবা তাকে।
পৌগণ্ডলীলা শান্তিপুর দেখাইলা সবাকে॥

২১। একবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈত বর্ণিল।
চৈতন্য দণ্ডপাত্র আপনে হইল॥
দণ্ড দিয়া মহাপ্রভু লজ্জিত হইলা।
অদ্বৈতের ঐশ্বর্য্য গৌরীদাস দেখিলা॥
যেহি জন অদ্বৈতের সেহি মোর প্রাণ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা সত্য সত্য জান॥

২২। দ্বাবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈতগৃহে ভোজন।
সীতার ঐশ্বর্য্য মহাপ্রভুর প্রচারণ॥
একালে সীতা অনেক প্রকাশ হইলা।
সবাকে পরিবেশে প্রভু ঈষদ্ জানিলা॥
অদ্বৈত ভাণ্ডার অক্ষয় মহাপ্রভু কহিলা।
ভোজন বিলাস তিন প্রভু অনেক করিলা॥

২৩। ত্রয়োবিংশতি সংখ্যায় দানলীলা শান্তিপুর।
তিন প্রভু দেখাইলা রসের প্রচুর॥
পূর্ব্বমত উথাড়িয়া দেখাইলা তাকে।
শান্তিপুর লীলা এহি বন্দিলা লোকে॥
পঞ্চম অবস্থা প্রভুর নব সংখ্যায় বর্ণিল।
সর্ব্বতত্ত্ব বিংশতি সংখ্যায় লিখিল॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

অদ্বৈতের জন্ম কোন শকে হইয়াছিল, কবি হরিচরণ দাস তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

শুভক্ষণ শুভলগ্নে পৃথিবীতে জানি।
মাকরী সপ্তমী দিনে জন্মিলা আপনি॥

ইহাতে মাঘ মাসের সপ্তমীতে তাঁহার জন্ম লইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কোন শকের মাঘ মাস তাহার নির্দ্দেশ নাই। অদ্বৈতের বৃদ্ধাবস্থায় চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রন্থেও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪০৭ শকে চৈতন্যের জন্ম হয়। যদি তাহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈতের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মোটামুটি ১৩৫৭ শকে অদ্বৈতের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অদ্বৈতমঙ্গল পাঠে জানা যায়, অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব নাম কমলাকান্ত মিশ্র। পূর্ব্ব

নিবাস শ্রীহট্ট দেশের 'নবগ্রাম' নামক গ্রাম। পিতার নাম কুবের, মাতার নাম নাভা। কুবেরমিশ্র ভরদ্বাজ মুনির বংশজাত। কমলাকান্ত ব্যতীত কুবেরমিশ্রের লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলাচার্য্য ও কৃষ্ণচন্দ্র এই ছয় পুত্র ও এক কন্যা ছিল। এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম চারিজন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শেষে দুই জন পূর্ব্বদেশে সংসার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন।

কমলাকান্ত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিচরণ দাস লিখিয়াছেন—

"ছয় মাস হইতে তবে অন্নপ্রাশন করি।
নামের বিচার করে জন্মপত্র ধরি॥
দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ বড় পুরোহিত প্রবীণ।
শাণ্ডিল্য মুনির গোষ্ঠী পণ্ডিত প্রবীণ॥
কি নাম রাখিব বলি কুবেরকে কহে।
আবির্ভাব সময়ের কথা কুবের কহে তাকে॥
যখন শান্তিপুরে তপস্যা করি জলে।
দিব্যরূপ স্ত্রী আসি কহিল সেই কালে॥
আমার পতি আসি তোমার পুত্র হইবে।
মনস্কাম সিদ্ধি হইল ঘরে যাও সবে॥
সেহি স্ত্রী দেখিল লক্ষ্মী স্বরূপ।
এবে তুমি বিচারিয়া কহ যেহি রূপ॥
শুনিয়া পুরোহিত কহে লগ্নে আমি জানি।
সঙ্কোচ করিয়া আমি না কহি সেহি বাণী॥
কমলে জন্মিল লক্ষ্মী তান ভর্ত্তা ইনি।
কমলাকান্ত নাম এবে রাখিলা আপনি॥"

অদ্বৈত নামের কারণ।——

"এতেক কহিল প্রভুর দিগ্বিজয়ী জয়।
অদ্বৈত নাম প্রকট তাহাতে যে হয়॥
কৃষ্ণসনে অদ্বিতীয় অদ্বৈত প্রকটিলা।
ভক্তিশাস্ত্রে প্রকটিল অদ্বৈতাচার্য্য হৈলা॥"

অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—সীতা ঠাকুরাণী ও শ্রীঠাকুরাণী। শ্রীঠাকুরাণী সীতার কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে কি বৈষ্ণব সমাজে কি অদ্বৈতের জীবনে সীতাঠাকুরাণীর প্রভাবই সমধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। অদ্বৈতমঙ্গলে বহুবার সীতাঠাকুরাণীর বন্দনা করা হইয়াছে এবং বহুস্থলে অদ্বৈতাচার্য্য 'সীতানাথ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীঠাকুরাণীর নাম বড় বেশী নাই।

অদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ, স্বরূপ ও কৃষ্ণমিশ্র এই-ছয় পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে অচ্যুতানন্দাদি পাঁচ জন সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে এবং কৃষ্ণমিশ্র শ্রীঠাকুরাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ছয় জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দেরই বৈষ্ণব সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছিল। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে চৈতন্যের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন। অন্য পাঁচজনের প্রভাবের কোন কথা অদ্বৈতমঙ্গলে নাই।

অদ্বৈতমঙ্গল অবলম্বনে অদ্বৈতাচার্য্যের বংশপত্রিকা নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইতে পারে—

ভরদ্বাজ মুনির বংশে

বসুদেব বা কুবের আচার্য্য।

১ লক্ষ্মীকান্ত, ২ শ্রীকান্ত, ৩ হরিহরানন্দ, ৪ সদাশিব, ৫ কুশল, ৬ কীর্ত্তিচন্দ্র, ৭ কমলাকান্ত বা অদ্বৈতাচার্য্য

সীতাঠাকুরাণীর গর্ভে — ১ অচ্যুতানন্দ, ২ বলরাম, ৩ গোপাল, ৪ জগদীশ ৫ স্বরূপ

শ্রীঠাকুরাণীর গর্ভে — ৬ কৃষ্ণমিশ্র।

বর্ত্তমান কালে জন্মতিথিতে কোন উৎসব করিবার রীতি আমাদের দেশে দেখা যায় না। অদ্বৈতমঙ্গলে দেখা যায়, তৎকালে শ্রীহট্ট প্রদেশে জন্মতিথিতে উৎসব হইত। বোধহয় পূর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই এই প্রথা ছিল, কালে কালে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে*।

অদ্বৈত মঙ্গলের ভাষা সরল নহে। ইহাতে মিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষরের নিয়ম প্রায়ই ভঙ্গ করা হইয়াছে। হরিচরণ দাসের বিশেষ কোন কবিত্ব ছিল না। তিনি সরল ভাবে ভক্তির সহিত অদ্বৈতের পূর্ব্ব জীবনের ঘটনা গুলি বিনা আড়ম্বরে লিখিয়াছেন। তথাপি বঙ্গভাষার সেই শৈশব অবস্থায় তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। হরিচরণ দাস প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নিম্নলিখিত ভণিতা দিয়াছেন;—

"শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস"॥

অদ্বৈত মঙ্গল হইতে পাঠকদিগকে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের দুইটী বর্ণনা উপহার দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

নবদ্বীপ বর্ণনা।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বীপ গ্রাম।
শ্রীবৃন্দাবন প্রায় গুণবন্ত ধাম॥

* এই প্রথা লুপ্ত হয় নাই, এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রচলিত আছে। সা, প, স।

তথা যমুনা বেষ্টিত অর্দ্ধচন্দ্র।
তথা রহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ॥
গঙ্গা যমুনা দোহে আছে একে স্থাই।
কভু এক হইয়া রহে কভু যায় তথাই।
বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি।
নবদ্বীপ বাস করে হইয়া তপস্বী॥
মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূপে রহে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবে পূজে তাহে॥
শান্তিপুর গ্রাম বন্দিএ যতনে।
তাহাতে প্রভুর লীলা হয় রাত্র দিনে॥
চারি ক্রোশ শান্তিপুর গঙ্গা দুই পাশে।
বন্দনের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ভাল ভাসে॥
নারিকেল দুইপাশে জঙ্গল সারি সারি।
অমুত্তম বৃক্ষ মধ্যে তাহাতে আচারি॥
খর্জুর তলাতে হয় ছায়া মনোহর।
রত্নে রুচির যেন হয় কলেবর॥
বিপ্র সব বসি করে প্রভুরে বেষ্টিত।
বড় বড় তপস্বী প্রাচীন বিদিত॥
গ্রীষ্ম কালেতে সব শান্তিপুর নিকটে।
সন্ধ্যার সময় সবে বৈশে যাইয়া তটে॥"

আমরা যে হস্তলিখিত অদ্বৈতমঙ্গল পাইয়াছি উহা ১৭১৩ শকে নরসিংহ দেবশর্ম্মা কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থ-শেষে নিম্নলিখিত কথা গুলি লিখিত হইয়াছে—

"সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। শুভমস্তু। শকাব্দা ১৭১৩। শ্রীল শ্রীসরস্বত্যৈ। শ্রীশ্রীহরিঃ পাতু। স্বাক্ষরং শ্রীনরসিংহ দেব শর্ম্মণঃ যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।"

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা।

উপরে যে চক্র-চিহ্ন ও তিন ছত্র লিপির চিত্র* প্রদত্ত হইল, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে উহার মূল চিত্র উৎকীর্ণ আছে। বাঁকুড়া সহর হইতে উত্তরপশ্চিমে ৬ ক্রোশ দূরে এবং রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ঐ পাহাড় অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া ছাতনা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়াছে।

পাহাড়ের যে অংশে ঐ চক্রচিহ্ন ও তৎসহ লিপি খোদিত আছে, এই অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, এখানে পূর্ব্বে বিরূপাক্ষ ঋষির আশ্রম ছিল; ইহার অনতিদূরে যমধারা নামে একটী সুন্দর প্রস্রবণ আছে; এই গিরির পাদদেশে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিও পড়িয়া রহিয়াছে, বাস্তবিক এই শৈলদেশের অবস্থান অতি মনোরম, বেশ নির্জ্জন, প্রকৃতির শোভাও অনির্ব্বচনীয়, ভগবদ্ভক্তের উপযুক্ত স্থান।

এখানে আসিয়া যিনি একবার ঐ খোদিত লিপি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই মনে উদয় হইয়াছে, কে ঐ লিপি লিখিয়াছে; এরূপ স্থানে পাহাড়ের গায়ে লিখিত হইবার কারণ কি? উহাতে কি লেখা আছে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার সকলেই ঐ লিপি দেবলিপি বলিয়া বিশ্বাস করে, সুতরাং উহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। যে কারণে হউক এতদিন দেবলিপি বলিয়াই কেহ ইহার পাঠোদ্ধারেও চেষ্টা করেন নাই। আজ বৎসরাধিক হইল, আমরা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম এই দেবলিপির বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি†। এই লিপি হইতে এক সময়ের কতকটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহারও আভাস দিয়াছিলাম। তখন মনে ভাবি নাই যে এই সামান্য

* চিত্র খানি ঠিক অনুরূপ হয় নাই খোদকের দোষে অতি সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে।

† Proc A. S. Bengal 1895, P. 175.

লিপি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং এই লিপি হইতে আরও ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি দেখিতেছি, এদেশে এবং বিলাতে কোন কোন পত্রিকায় এই লিপির বিষয় আলোচিত হইতেছে। সুতরাং এই লিপি হইতে যতদূর ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া এখন কর্ত্তব্য।

অক্ষর পরিচয়।—লিপির পাঠ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লিপির অক্ষরগুলি কত দিনের হইতে পারে, এখন তাহার একটা মীমাংসা করা উচিত।

যখন বাঙ্গালাদেশের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে এই লিপি খোদিত আছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহা এক সময়ের বঙ্গাক্ষর অথবা যে সময়ে ঐ লিপি খোদিত হয়, সে সময়কার বঙ্গবাসী সহজেই এইরূপ লিপি পাঠ করিতে পারিতেন। কারণ সাধারণে যাহা পাঠ করিবে, সাধারণে যাহা দেখিবে, তাহা কোনরূপ অজ্ঞাত বিদেশীয় অক্ষরে লিখিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হয়ত কেহ বলিতে পারেন ; এ লিপি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত সাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং যদি কোন বিদেশী আসিয়া ঐ লিপি লিখিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ভিন্ন দেশীয় লিপি হইবার পক্ষে আপত্তি কি ? আমাদের বিবেচনায় সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি, যাহাতে এ লিপির অক্ষর এক সময়কার বঙ্গাক্ষর* বা পূর্ব্বভারতীয় লিপি বলিতে কুণ্ঠিত নহি। ফরিদপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসন হইতে এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই লিপি গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ের লিপির সদৃশ। আমাদের আলোচ্য তিন ছত্র লিপির অনেকগুলি অক্ষর সমুদ্রগুপ্তের লিপি অপেক্ষা কতকটা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই লিপির চ, জ, ধ, র, হ্ম এই কএকটী অক্ষর খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মথুরার শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় (১)।

আবার এই লিপিতে যেরূপ ণ, স এবং ক্ষ লিখিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর উত্তরভারতীয় কোন লিপিতে এরূপ আকার দেখা যায় না। ঐ সময়ের লিপিতে যেরূপ ণ ও স লিখিত আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে পরিষদ্ পত্রিকার ২য় ভাগের মাঘ মাসের সংখ্যায় অক্ষর তালিকায় দেওয়া হইয়াছে ; দেখিলে সহজেই প্রতীতি হইবে, যে বর্ত্তমান লিপির ণ ও স তদপেক্ষা অনেকটা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এই হেতু ঐ লিপি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীরও পরবর্ত্তী বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের লিপি ও ধর্ম্মাদিত্যের (ফরিদপুরের) তাম্রশাসনের লিপির সহিত ঐ দুইটী অক্ষরের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু চ জ প্রভৃতির লিপিবিন্যাসপ্রণালী, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মথুরার শিলালিপিতে স্পষ্ট খোদিত থাকায় আমাদের আলোচ্য এই শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি

* বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি মূলক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। তাঁহার সময়কার লিপির উদাহরণ 'নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নিরূপক' তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ২য় ভাগে মাঘ মাসের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।] (১)

(১) Epigraphia Indica, vol. I. P. 381, plate I—XXII.

সমুদ্রগুপ্তের সম সাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলেও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

বর্ত্তমান লিপির প্রায় প্রত্যেক বর্ণের সহিত দিল্লীর সুবিখ্যাত লৌহস্তম্ভে খোদিত চন্দ্র-লিপির সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। শুশুনিয়ার খোদিতলিপির যে যে অক্ষরকে আমরা সমুদ্র-গুপ্তের খোদিতলিপির সেই সেই অক্ষর অপেক্ষা কতকটা প্রাচীন বলিয়া মনে করি, বিখ্যাত লৌহস্তম্ভের সেই সেই অক্ষর সমুদ্রগুপ্তের লিপি অপেক্ষা প্রাচীন ও আমাদের আলোচ্য লিপির ঠিক অনুরূপ(২)। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতের নানা স্থানে কতশত প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলির যতদূর আমরা পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই বুঝিয়াছি, সুদূরবর্ত্তী দিল্লীর লৌহস্তম্ভে খোদিতলিপির সহিত বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের এই তিন ছত্র লিপির যেরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, আর কোন স্থানের কোন খোদিত লিপির এরূপ একরূপতা লক্ষিত হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে লৌহস্তম্ভলিপি পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

উপরে যেরূপ অক্ষর পরিচয় দেওয়া হইল, তাহাতে এই আলোচ্য লিপি গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল, এসম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

পাঠ।— * চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ
পুষ্করস্যাধিপতে র্মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্ম্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ

অনুবাদ।—চক্রস্বামীর দাসগণের প্রধান কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইল। পুষ্করের অধিপতি মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মার অনুষ্ঠান।

এখন এই কয় ছত্র হইতে জানা গেল, পুষ্করের রাজা মহারাজ সিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। তিনি চক্রস্বামীর* দাসগণের প্রধান অর্থাৎ বৈষ্ণবাগ্রণী বা পরম ভাগবত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে একটী প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহার উপরই একটী চক্র অঙ্কিত আছে। ঐ চক্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ঐ তিন ছত্র লিপি খোদিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই লিপি উৎকীর্ণ

---

২ লৌহস্তম্ভে খোদিত লিপির প্রতিকৃতি Corpus Incriptionum Insdicarum, vol III, Plate XXI A প্রদত্ত হইয়াছে।—এই লিপিতে কেবল যুক্ত আকার (া) একটু পৃথক্ ভাবে রেফের ন্যায় অক্ষরের মাথায় অঙ্কিত আছে, তাহাতে কেহ কেহ এই লিপি সমুদ্রগুপ্তের কিছু পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এরূপ আকারের আভাস আমরা অশোক লিপি হইতেই প্রাপ্ত হই। মথুরার খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর লিপিতেও এরূপ আকার দৃষ্ট হয় (Epigraphia, Indica vol, I, P, 390, inscription no, XVII—XX), সুতরাং এই লিপি সমুদ্রগুপ্তের সাময়িক কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* চক্রস্বামী বিষ্ণুর নামান্তর।

হইয়াছিল, এ লিপিতে সে কথা কিছুই লিখিত নাই”। কিন্তু এই লিপির বর্ণমালার উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে এরূপ লিপি প্রচলিত ছিল। সুতরাং মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মাও ঐ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মহিমাপ্রকাশক প্রয়াগ স্তম্ভে খোদিত লিপি আমাদের কথা সমর্থন করিতেছে। লিপির ২০শ পঙ্‌ক্তিতে চন্দ্রবর্ম্মা নামধেয় এক আর্য্যাবর্ত্তরাজের উল্লেখ আছে; সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন (৩) তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দি, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আরও কএক জন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, চন্দ্রবর্ম্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তৎকালীন লিপিমালা ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, সহজেই স্বীকার যায়, উভয় খোদিত লিপিবর্ণিত চন্দ্রবর্ম্মা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমাদের এই মন্তব্য এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছিলাম (৪) সুখের বিষয়, পুরাতত্ত্ববিদ্ ভিনসেণ্ট স্মিথ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় আমাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন(৫) একটী বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পুষ্করহ্রদের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা সম্ভবতঃ আসাম বা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন(৬)।

খোদিত লিপি দ্বারা জানা যাইতেছে, যেখানে পুষ্কর অবস্থিত, সেই অঞ্চলে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা অধিপতি ছিলেন। এখন দেখিতে হইবে, পুষ্কর কোথায়?

সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে একটী বই দুইটী পুষ্কর আমাদের নয়নগোচর হয় না, সেই একটী পুষ্করের ভিতর আমরা পুষ্কর নগর, পুষ্কর হ্রদ ও পুষ্কর তীর্থ দেখিতে পাই। সেই পুষ্কর রাজপুতনার অন্তর্গত অজমের মেরবাড়া নামক জনপদের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের অক্ষাংশ ২৬°৩´ উঃ এবং দ্রাঘিমান্তর ৭৫°৩৬´ পূঃ। বহু প্রাচীন পুরাণ ও উপপুরাণাদিতে এই পুষ্করক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যখন ভারতবর্ষে পৌরাণিক যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত (পূর্ব্বাপর) একটী বই দুইটী পুষ্করতীর্থ পাওয়া যাইতেছে না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের আলোচ্য খোদিত লিপিবর্ণিত পুষ্কর এখনকার পুষ্করতীর্থ বা পুষ্কর হ্রদ, এবং উক্ত পুষ্কর নামক স্থানেই মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা রাজত্ব করিতেন।

প্রথমতঃ এই বিবরণটী পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত আশ্চর্য্যবোধ করিয়া বলিবেন, কোথায় অজমের আর কোথায় বাঁকুড়া! কোথায় পুষ্কর আর কোথায় শুশুনিয়া পাহাড়!— প্রায় ১০০০ মাইল ব্যবধান! পুষ্করাধিপ চন্দ্রবর্ম্মা এই সুদূর বিদেশে আসিয়া ছিলেন, তাহা কি সম্ভব? এই সুদূরস্থিত বঙ্গপ্রদেশের সহিত তাঁহার কি কোন সম্বন্ধ ছিল? আমরা

(৩) Corpus Inscriptionum Indicarum, vol III, P, 7.

(৪) Procceding of the As. Soc. Bengal, 1895, P, 177.

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (January) 1897, p, 28th.

(৬) Journal of the R. A. S. 1897. p. 11,

দেখাইব, প্রকৃতই তাঁহার সহিত বঙ্গভূমির সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপ প্রকৃতই এই বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

অক্ষর পরিচয় স্থলে ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, দিল্লীর লৌহ স্তম্ভে খোদিত লিপির সহিত আলোচ্য লিপির অক্ষরাবলীর সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে, আর কোন স্থানের অক্ষরের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে বোধ হয় লৌহস্তম্ভলিপির আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিল্লীর লৌহস্তম্ভে চন্দ্রবর্ম্মার খোদিত লিপির অক্ষরে ৬ছত্রে এই তিনটী শ্লোক* খোদিত আছে—

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতিপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে [।]
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যে সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ [॥]
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ [।]
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহা
ন্নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্য্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্ ॥
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্র্শ্রিয়ং বিভ্রতা।
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্ব্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ ॥

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে,—চন্দ্রনামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহার অপর নাম ধাব, তিনি বঙ্গ হইতে সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী বাহ্লিক পর্য্যন্ত নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপদ নামক গিরির উপর তিনিই বিষ্ণুধ্বজ (বর্ত্তমান লৌহস্তম্ভ) স্থাপন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হইলেও তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ তিনটী শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

বহুদিন হইতেই এই বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে, আলোচনা হইবার প্রধান কারণ এরূপ অদ্ভুত লৌহস্তম্ভ আর কোথাও নাই। সেই প্রাচীন কালে ঢালাই করিয়া কিরূপে এই স্তম্ভটী প্রস্তুত হইল, পুরাতত্ত্ববিদ্

* এই শ্লোক তিনটী ভিন্ন অপ্রাচীন অক্ষরে হিন্দীভাষায় লিখিত আরও কএক ছত্র লিপি আছে, তাহা আধুনিক কালে সংযোজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল না; উপরে যে তিনটী শ্লোক দেওয়া হইল, উহাই লৌহ-স্তম্ভের আদিলিপি।

ও পদার্থবিদ্ মাত্রেই যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ভাবিয়া কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, সকলেই অতীব বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। প্রথমে এই স্তম্ভ লৌহে নির্ম্মিত কি না, তৎপক্ষে অনেকেই সন্দিহান্ ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা সাধারণের ঐ অলীক সন্দেহ দূর করিয়াছেন। ৭ এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে, বিশুদ্ধ লৌহে এই স্তম্ভ বিনির্ম্মিত। কিরূপে এই মহাব্যাপার সম্পাদিত হইল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সার্দ্ধৈকসহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বে যিনি এই মহাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয় খোদিত লিপি হইতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি, চন্দ্রনামে এক জন রাজা এই লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কাহার পুত্র, কোথায় রাজত্ব করিতেন, এ সকল পরিচয় উক্ত খোদিত লিপি হইতে জানিবার উপায় নাই। এই চন্দ্ররাজ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া স্মিথ্ সাহেব সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ৮,—

১। 'ডাক্তার ফ্লিট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত এই চন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু এই স্বরূপনির্ণয় নিতান্ত অসম্ভব। সমুদ্রগুপ্ত যে যে রাজ্য জয় করেন, তাহার তালিকা দৃষ্টে বোধ হয়, (যে তাঁহার পিতার) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বেশী বড় ছিল না এবং তাঁহার বাহুবল কখনও যে বাঙ্গালা ও বেলুচিস্তান ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কখনও বিশ্বাস হয় না। মিহিরপুরীর অপভ্রংশ মিহরৌলী নামক গ্রামে (এখন) লৌহস্তম্ভ অবস্থিত থাকায় ডাক্তার ফ্লিট্ অনুমান করেন যে যাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই রাজাও মিহির বা হূণ জাতির এক শাখা হইবেন। এই চন্দ্র মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও হইতে পারেন †। এ অনুমান লিপির ভাষা দ্বারা সমর্থিত বোধ হইল না। শ্বেত-হূণরাজ মিহিরকুল একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না।'

২। 'লৌহস্তম্ভের চন্দ্র ও সিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর এই মত এক কালেই অগ্রাহ্য। চন্দ্রবর্ম্মা আলাহাবাদের স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপির বর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্যতম রাজা হওয়াই সম্ভব। তিনি কামরূপ বা আসামের রাজা হইতে পারেন। শুশুনিয়ার খোদিত লিপিতে যে পুষ্কর হ্রদের উল্লেখ আছে, তাহা অজমেরে হওয়া অসম্ভব।'

৩। 'ডাক্তার হোরন্‌লির মতে লিপির অক্ষরাবলী উত্তরপূর্ব্বভারতীয় গুপ্তলিপিরই রূপ বিশেষ। এরূপ অক্ষরের ভারতীয় লিপি-সমূহ সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় ৪৬৭

---

৭ Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. I. P. 170.

৮ Journal of the Royal Asiatic Society, 1897, P, 8,12.

† মিহিরকুল প্রায় ৫১৫-৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ডাক্তার হোরন্‌লি প্রমাণ করিয়াছেন, উত্তরপূর্ব্বভারতীয় অক্ষরের প্রায় সমুদয় খোদিত লিপি গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধান জনপদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং ২য় চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র ও তৎপৌত্রের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই জন্য ডাক্তার হোরন্‌লি নিঃসন্দিগ্ধভাবে (সমুদ্রগুপ্তের পুত্র) ২য় চন্দ্রগুপ্তকেই লৌহস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ৪১০ খৃষ্টাব্দে লৌহস্তম্ভের নির্ম্মাণকাল স্থির করিয়াছেন।'

স্মিথ সাহেব উক্ত তিনটী পূর্ব্বমত প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 'আমি বেশ বুঝিয়াছি, ডাক্তার হোরন্‌লির কথাই ঠিক। অধীশ্বর চন্দ্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। তাঁহারই সময় গুপ্তসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার হোরন্‌লি যে সময় স্থির করিয়াছেন, তাহা আরও কিছু পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে ২য় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী লিপি অবশ্যই ৪১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খোদিত হওয়া সম্ভব। ২য় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভাগবত বা পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারই স্থাপিত এই বিষ্ণুধ্বজ (লৌহস্তম্ভ)। তাঁহার পুত্র ১ম কুমারগুপ্তও বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিই পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুধ্বজে লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন।'

অবশেষে তিনি লৌহস্তম্ভের আদি অবস্থান সম্বন্ধে অনেকটা বিচার করিয়াছেন; বিচার করিয়া অনেকটা প্রমাণ করিয়াছেন যে, লৌহস্তম্ভ এখন যেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ও ইহার গাত্রে লিপি খোদিত হয়, তৎকালে এখানে ছিল না। এই খোদিত লিপি হইতেই জানা যায়, বিষ্ণুপদ নামক গিরির উপরই প্রথমে এই লৌহস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মিথ সাহেবের মতে,—এই বিষ্ণুপদগিরি মথুরাস্থ কোন একটী ছোট পাহাড় হইবে।[৯]—তথা হইতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে আনাইয়া পুনঃ স্থাপন করেন।

প্রথমতঃ ডাক্তার ফ্লিট যে কথা লিখিয়া ছিলেন, স্মিথ সাহেবের বহু পূর্ব্বেই আমরা তাহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছি[১০]।—সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোন কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

স্মিথ সাহেব বিশেষ করিয়া পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন,—২য় চন্দ্রগুপ্তই লৌহস্তম্ভ-স্থাপয়িতা চন্দ্র।

মথুরা, সাঞ্চি, গড়বা ও উদয়গিরি হইতে ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১১]—আমরা দেখিতেছি, এই সকল লিপির অক্ষরাবলীর সহিত লৌহস্তম্ভলিপির অক্ষরের সৌসাদৃশ্য নাই। আমরা সর্ব্ব প্রথমেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ণ, ষ, স্য, ও ক্র এই কয়টী অক্ষর ছাড়া শুশুনিয়া ও লৌহস্তম্ভ লিপির আর সকল অক্ষর গুলিই খৃষ্টীয় ১ম, ও ২য় শতাব্দীর লিপিতে দেখিতে পাই, ঐ চারিটী অক্ষর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ২য় চন্দ্রগুপ্তের লিপিতে পাওয়া যাইতেছে না। মথুরা হইতে ২য় চন্দ্রগুপ্তের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত

৯ Journal of the Royal Asiatic Society, 1897. P. 17.

১০ Proc. of the Asiatic Society of Bengal, 1895, P. 177.

১১ Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, no 3—7; and Epigraphia Indica, vol II, p. 198.

হইয়াছে, তাহার ণ ও স সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার [১২]। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, লৌহস্তম্ভ প্রথমে মথুরাতেই ২য় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি, মথুরাস্থ ২য় চন্দ্রগুপ্তের লিপির সহিত লৌহস্তম্ভ লিপিরও মিল নাই, সুতরাং উহা এক ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এতদ্ভিন্ন শুশুনিয়া লিপি ও লৌহস্তম্ভ লিপির যে যে অক্ষর খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, ২য় চন্দ্রগুপ্তের লিপিসমূহে সেই সেই অক্ষর অনেকটা পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইহাতেও স্তম্ভলিপি হইতে ২য় চন্দ্রগুপ্তের লিপি ভিন্ন সময়ের বা কিছু অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায়।

মধ্যভারত, প্রয়োগ ও মথুরা জেলা হইতেই ২য় চন্দ্রগুপ্তের লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল স্থানে তাঁহার গতিবিধি বা আধিপত্য ছিল বুঝা যায়; কিন্তু তিনি যে কোন সময়ে বঙ্গভূমি ও সিন্ধু জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন লিপিতে এ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সেই জন্যই আমাদের বিশ্বাস, ২য় চন্দ্রগুপ্ত এবং বঙ্গ ও সিন্ধুবিজেতা চন্দ্র উভয়ে কখনই একব্যক্তি হইতে পারেন না। তাঁহাদের পরস্পরের খোদিত লিপির অসদৃশা হেতুও উভয়ে বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

এ ছাড়া মথুরায় যে লৌহস্তম্ভ প্রোথিত ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বিষ্ণুপদ গিরির উপর এই বিষ্ণুধ্বজ (লৌহস্তম্ভ) প্রথমে স্থাপিত হয়। কিন্তু মথুরায় যে কোন গিরির নাম বিষ্ণুপদ ছিল, তাহার প্রমাণ কই? এখন মথুরার নিকট কোথাও বিষ্ণুপদগিরি নাই। স্কন্দপুরাণীয় মথুরামাহাত্ম্য, বরাহপুরাণ (১৫২ হইতে ১৭৮ অধ্যায়), ত্রিস্থলীসেতুর অন্তর্গত মথুরাসেতু এবং বল্লভাচার্য্য বিরচিত মথুরামাহাত্ম্যে মথুরা ও ইহার অন্তর্গত সমস্ত তীর্থাদির মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু ঐ সকল মাহাত্ম্যে বিষ্ণুপদ গিরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে মথুরায় যে কোন কালে ঐ লৌহস্তম্ভ স্থাপিত ছিল তাহা সম্ভবপর নহে।

তবে বিষ্ণুপদ-গিরি কোথায়?

পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে আমরা দুইটী মাত্র বিষ্ণুপদগিরির উল্লেখ পাই, একটী গয়াধামে এবং অপরটী পুষ্করক্ষেত্রে। গয়াধামের বিষ্ণুপদের কথা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু পুষ্করক্ষেত্রের মধ্যে যে বিষ্ণুপদগিরি আছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন। এই বিষ্ণুপদগিরি অজমেরের অন্তর্গত পুষ্করহ্রদের কিছু দূরে অবস্থিত। অনেক পুষ্করযাত্রী এই বিষ্ণুপদশৈলদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। সনৎকুমারসংহিতার অন্তর্গত পুষ্করখণ্ডে লিখিত আছে, এক সময় এই গিরিবাসিগণের জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, বিষ্ণু তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে এখানে আসিয়া পদ স্থাপন করেন, তাহাতে বিষ্ণুপদীর উৎপত্তি হয়।

---

১২ Corpus Inscriptionum Indicarum, vol III, plate III line 9 দ্রষ্টব্য।

তদবধি এই শৈল বিষ্ণুপদ নামে খ্যাত হইল।[১৩]—এখানে বিষ্ণুপদী গঙ্গা নির্গত হইয়া পুষ্করহ্রদে গিয়া পতিত হইয়াছে [১৪]।

এখন দেখিতে হইবে কোন্ বিষ্ণুপদ গিরির উপর মহারাজ চন্দ্র বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন?

দিল্লীস্থ উক্ত লৌহস্তম্ভের উপর "সংবৎ দিহলি ১১০৯ অঙ্গপাল বহি" এই কয়েকটী কথা খোদিত আছে। কেহ কেহ এই কয়টী কথার এইরূপ অর্থ করেন, '১১০৯ সম্বন্ধতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।' [১৫]—আবার কেহ অর্থ করেন, '১১০৯ সংবতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে বহন করিয়া আনেন।'

শেষোক্ত মতে, ১০৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে লৌহস্তম্ভ দিল্লীতে আনীত হয়। এখন দেখিতে হইবে, অনঙ্গপাল গয়া কিম্বা অজমেরস্থ পুষ্করক্ষেত্র, এই উভয় স্থানের মধ্যে কোন্ স্থান হইতে লৌহস্তম্ভ আনাইয়া ছিলেন। দিল্লী হইতে পুষ্কর যেমন নিকট, গয়া তেমনি বহুদূরবর্ত্তী। অনঙ্গপাল যে কোন সময়ে গয়াধামে গিয়াছিলেন বা গয়াতে কোন সময় লৌহস্তম্ভ স্থাপিত ছিল, এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনঙ্গপাল তোমরবংশীয় এবং তাঁহার সমকালীন অজমেরের রাজগণ চাহমানবংশীয় ছিলেন। দিল্লীর তোমর-রাজগণের সহিত অজমেরের চাহমান-রাজগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অজমেরস্থ তারাগড় পাহাড়ে একটী মস্‌জিদ্ আছে, এখান হইতে বৃহৎ শিলাফলকে উৎকীর্ণ "ললিতবিগ্রহরাজ ও "হরকেলি" নামে দুইখানি সংস্কৃত নাটক পাওয়া গিয়াছে। [১৬] ললিতবিগ্রহরাজ নাটক পাঠে জানা যায় যে, 'চাহমানপতি বিগ্রহরাজ (তোমররাজা) বসন্তপালের কন্যার প্রেমে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। [১৭]

অনেকে জানেন, দিল্লীর শেষ হিন্দুনরপতি পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বর তোমর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মাতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে অজমের-পতি পৃথ্বীরাজ দিল্লীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তোমার ও চাহমান বংশ বহুদিন হইতেই এইরূপ বিশেষ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই সকল সম্বন্ধ দ্বারা সহজেই বোধ হয় যে, তোমররাজ অনঙ্গপাল অজমেরে গিয়া বিষ্ণুপদগিরি হইতে লৌহস্তম্ভ তুলিয়া আনিয়া তাঁহার বড় সাধের

১৩। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুষ্করমাহাত্ম্যে এই পর্ব্বতের অপর নাম যজ্ঞ পর্ব্বত লিখিত হইয়াছে—
"পদন্যাসং কথং পূর্ব্বং বিষ্ণুনা যজ্ঞপর্ব্বতে।
নাগেস্তত্র পঞ্চতীর্থং কৃতং তৈস্তু মহাবিবৈঃ॥" ২১ অধ্যায়।

১৪। "যজ্ঞপর্ব্বতমারূঢ়ো দৃষ্ট্বা গঙ্গা বিনির্গমং।
উদঙ্মুখী দেবনদী নির্গতা পুষ্করং প্রতি॥" সৃষ্টিখণ্ড ২২ অঃ।
পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ২৮ অধ্যায়ে 'বিষ্ণুপদীর" উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

১৫ Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol I. P. 157.

১৬ Indian Antiquary, vol xx. P. 201.

১৭ তোমররাজ বসন্তপাল দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। (Cunningham's Reports, vol I. P. 149.)

দিল্লীরাজধানীতে স্থাপন করেন। তখন হইতেই অজমেরের লৌহস্তম্ভ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল।

উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, রাজেশ্বর চন্দ্র পুষ্করক্ষেত্রের অন্তর্গত বিষ্ণুপদ গিরিতে বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করেন, তিনি বঙ্গ ও বাহ্লিক জয় করিয়াছিলেন। শুশুনিয়া-লিপির সিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মাও শুশুনিয়া গিরির উপর এক বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং পুষ্করের অর্থাৎ অজমের অঞ্চলের রাজা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র যখন পুষ্করক্ষেত্রে বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যখন এখানে সম্ভবতঃ তাঁহার বীরত্বকাহিনী লৌহস্তম্ভে খোদিত হইয়াছিল, তখন তিনি যে এখানে এক সময়ে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার বংশধর বা আত্মীয়গণ এখানে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বহুবার লিখিয়াছি, লৌহস্তম্ভ-লিপি ও শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপির অক্ষরাবলীতে এত সৌসাদৃশ্য যে এমন সৌসাদৃশ্য আর কোন লিপিতে দেখা যায় না। সুতরাং উভয় লিপিই এক ব্যক্তির লেখা বলিয়া ধরিলে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয়ে যখন এক দেশের রাজা ও উভয়ই লিপিতে যখন একরূপ অক্ষর দেখা যাইতেছে, তখন উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিতে আপত্তি কি? লৌহস্তম্ভে লিখিত আছে, চন্দ্র বঙ্গ ও বাহ্লিক জয় করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান যেরূপ ওয়েলিংটনের নিকট পরাজিত হন, মহাসমরান্তে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধে সেইরূপে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছিলেন।

পুষ্কররাজ চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গ-বিজয়-কালে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে বিষ্ণুচক্র স্থাপন এবং তদুপলক্ষে এই লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন; এই জন্যই আমরা পুষ্কর রাজার নাম পুষ্কর হইতে বহুদূরে অবস্থিত শুশুনিয়া গিরিশিরে খোদিত দেখিতেছি।

যে চন্দ্রবর্ম্মা এক সময়ে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ রণানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, আজ আমরা আনন্দে প্রকাশ করিতেছি, দিল্লীর অদ্বিতীয় লৌহস্তম্ভ তাঁহারই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি!

জোয়ার ও ভাঁটা

১। লক্ষণ।—সাগরোপকূলে এবং সাগর-সঙ্গত হ্রদ নদাদিতে যে জলের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাই জোয়ার। জলের বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাটা বলে। উচ্ছ্বাস শব্দটি উৎ পূর্ব্বক শ্বস্ ধাতুনিষ্পন্ন, অতএব মহোদধির জলরাশিকে যদি তদীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের স্থূলদেহ বলা যায়, তবে প্রবল প্রভঞ্জন-বিলোড়িত সফেণ উত্তাল তরঙ্গ-মালা তাঁহার কোপের প্রত্যক্ষ ব্যাপার; অনুত্তরঙ্গ ভাব তাঁহার নিদ্রিতাবস্থা এবং ভাটা ও জোয়ার ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস।

জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে যখন থম্‌থমে হয়, তখন জলের তদবস্থাকে পূরা বা পূর্ণ জোয়ার বলে এবং যখন ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া অবশেষে থম্‌থমে হয়, তখন জলের তদবস্থাকে পূর্ণ বা পূরা ভাটা বলে।

যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইবার কোন স্থানের যাম্যোত্তর রেখায় উপনীত হন, সেই সময়কে চান্দ্রদিন বলে। চান্দ্রদিনের পরিমাণ সৌরমানে হারা হারি ২৪ঘ, ৫১মি। এই চান্দ্র দিনের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়।

পূরা কোটাল ও মরা কোটাল।—জোয়ারের উচ্ছ্রায় দিন দিন ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া যে দিন অত্যন্ত হ্রাস হয়, সেই দিন অবধি ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বোচ্চ জোয়ারকে পূরা বা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কোটাল, এবং সর্ব্ব নীচ জোয়ারকে মরা কোটাল বলে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কিয়ৎকাল পরেই পূরা কোটাল হয়, এবং রবি চন্দ্রের ব্যবধান যখন ৯০° হয় (অর্থাৎ সপ্তমী অষ্টমীর মাঝামাঝি) তখন মরা কোটাল ঘটে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় উপর্য্যুপরি দুই জোয়ারের ব্যবহিত কাল অত্যল্প। এই সময় যদি দিনে ১২ টার সময় ভাটা আরম্ভ হয়, তবে আবার রাত্রি ১২ টা ১৯ মিনিটের (হারাহারি) পর ভাটা আরম্ভ হইবে; কিন্তু মরা কোটালের সময় উপর্য্যুপরি দুই জোয়ারের ব্যবহিত কাল অত্যধিক হারাহারি ১২ঘ ৩০মি। কলিকাতার উপনগর খিদিরপুরে জোয়ার ভাটা মাপিবার গজে পূরা কোটালের সময় জল ২৪´১´´ ফুট পর্য্যন্ত উঠে এবং মরা কোটালের সময় ২´২´´ ফুটের বেশি হয় না।

৩। বন্দরের সংস্থিতি (Establishment of the port)। পূর্ণ জোয়ারের কাল প্রধানতঃ চন্দ্রের অবস্থাধীন; কোন স্থানের যাম্যোত্তর রেখায় চন্দ্র উপনীত হইবার কিয়ৎকাল পরে জোয়ার পূর্ণ হয় এবং চন্দ্রের রেখোত্তরণ কাল হইতে পূর্ণ জোয়ারের যে ব্যবধান (হারাহারি ৪৫মি) তাহার প্রায় ন্যূনাধিক ঘটে না; যে ন্যূনাধিক দেখা যায়, তাহা চন্দ্রের ক্রান্তিসঞ্জাত। কিন্তু রবি যাম্যোত্তর রেখায় আসার কতক্ষণ

পরে জোয়ার হইবে তাহার হিসাব করিতে হইলে এক পক্ষ মধ্যে ০ হইতে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্তর দেখা যায়। নদী বা সাগর-কূলে স্থিত বাণিজ্য স্থানকে বন্দর বলে। যেমন কলিকাতা। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার দিন যে সময় চন্দ্র বন্দরের মধ্যরেখায় আসেন এবং উক্ত তিথিতে যে সময় উক্ত বন্দরে জোয়ার পূর্ণ হয়, এই দুই সময়ের অন্তরকে বন্দরের সংস্থিতি (Establishment of the port) বলে। কলিকাতা বন্দরের সংস্থিতি ২ঘ ২মি স্ফুট কাল। অর্থাৎ কলিকাতায় (খিদিরপুরে) অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় চন্দ্র যখন মধ্য-রেখায় আসেন, তাহার ২ঘ ২মি পরে জোয়ার পূর্ণ হয়। য়ুরোপীয় ও আমেরিক নাবিক ও বণিক ভিন্ন অপরে বন্দরের সংস্থিতি বা এষ্টাব্লিষ্‌মেণ্ট অব দি পোর্ট বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের কলিকাতায় জোয়ার কখন্ হইবে, তাহার হিসাব করিতে হইলে অগ্রে তিথি দেখি, তাহার পর ধরা আছে যে দশমীর দিন ভোরে জোয়ার আরম্ভ হয়, তবেই দশমীর পর যত তিথি অতীত হইয়াছে, তাহাকে দুই দিয়া গুণ করিলে যত হইবে, উদয়ের পর তত দণ্ড জোয়ার হইবে। এ সব যে বড় স্থূল গণনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। অনুপার্থিবে এবং অপপার্থিবে জোয়ার ভাটা।—চন্দ্র যখন অনু-পার্থিবে আসেন অর্থাৎ নীচস্থ পৃথিবীর খুব নিকটস্থ হন, তখন, যদি জোয়ার ভাটার অন্যান্য কারণের প্রত্যবায় না ঘটে, তবে জোয়ারের উচ্ছ্রায় অত্যন্ত অধিক হয়, এবং যখন অপপার্থিবে আসেন অর্থাৎ উচ্চস্থ বা পৃথিবীর অত্যন্ত দূরস্থ হন, তখন জোয়ারের উচ্ছ্রায় অত্যন্ত অল্প হয়। অমাবস্যার বা পূর্ণিমার সময় চন্দ্র নীচস্থ হইলে জোয়ারের অসাধারণ বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তে চন্দ্র নীচস্থ হইলে প্রতিপদের বা দ্বিতীয়ার কোটাল ২৪ঘ ২৭মি অন্তর হয়; কিন্তু উচ্চস্থ হইলে তৎকালে কোটালের ব্যবধান ২৪ঘ, ৩১মি হয়।

আবার মরা কোটালের সময় চন্দ্র নীচস্থ হইলে নবমী দশমীর জোয়ারের ব্যবধান-কাল ২৫ঘ ১৫মি এবং অপপার্থিবে থাকিলে ২৫ঘ ৪০মি হয়।

চন্দ্রের মধ্যরেখায় উপনীত হইবার ৩০মি হইতে ৬১ মিনিটের পর জোয়ার পূর্ণ হয় অর্থাৎ মধ্যরেখা হইতে চাঁদ ৯° ২৫´ হইতে ১৪° ৪৩´ পর্য্যন্ত পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ার পর ভাটা আরম্ভ হয়।

৫। জোয়ার ভাটার কারণ।—পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সকল দেখিয়া প্রতীতি হইতেছে যে, জোয়ারের মূল কারণ চন্দ্র। চন্দ্রাকর্ষণে সাগরের জল যে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পণ্ডিতগণ জানিয়াছেন।

"ইতঃ স্তুতিঃ বা বদ চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি। (নৈষধ)

কিন্তু চন্দ্রাকর্ষণে জোয়ারের উৎপত্তি স্বীকার করিলে দিবসে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার সম্ভব অর্থাৎ যে স্থানে যখন চন্দ্র মধ্যরেখায় আসেন, তখনই সেই স্থানের জল চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জোয়ারের উৎপত্তি হইতে পারে; উহার প্রতীপস্থলে

অর্থাৎ অধোভাগে জোয়ার কেন হয় অর্থাৎ দিবসের মধ্যে দুইবার জোয়ার কেন হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিষয়টি একটু তলাইয়া বুঝিতে হয়। চন্দ্রের আকর্ষণ মাত্রই যে জোয়ারের কারণ, তাহা নহে। চন্দ্রের অধোভাগে ভূতলের প্রতীপ স্থানদ্বয়ে চন্দ্রাকর্ষণের যে অন্তর, তাহাই প্রকৃত পক্ষে জোয়ার-ভাটার কারণ। চন্দ্র দ্বারা কেবল জলরাশি আকৃষ্ট হয় না, সসাগরা বিশ্বম্ভরাও আকৃষ্ট হন।
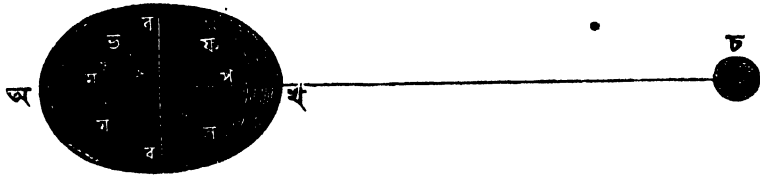
চিত্রে অখিল ভূমণ্ডল, প ফ ব ভ ম য র ল কে যদি জলময় ধর, এবং চ কে যদি চন্দ্র মনে কর, তবে প ফ ব ইত্যাদি স্থানের চন্দ্র হইতে দূরত্বের বিষমতাপ্রযুক্ত চন্দ্রাকর্ষণের বিষমতা জন্মিবে। পএ যত টান পড়ে, তাহা অপেক্ষা ফ ও লএ কম টান পড়িবে এবং ব ও রএ আরও কম টান পড়িবে এবং ম আকর্ষণের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবে। চন্দ্রের ঠিক অধোভাগে খস্থানের জলে যত জোরে টান পড়ে, তাহা অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠ পএ কম টান পড়ে, সুতরাং তথায় বর প্রদেশ হইতে জল প্রবাহিত হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠাকারে চন্দ্রের ঠিক অধোভাগে স্তূপীকৃত হয় অথাৎ খএ যখন জোয়ার হয়, বএ ও রএ তখন ভাটা পড়ে, তবেই দেখা যাইতেছে যে চাঁদ যখন মাথার উপরে (যাম্যোত্তর রেখায়) আসেন, তখন জোয়ার পূর্ণ হয় এবং চাঁদ উঠিবার বা ডুবিবার সময় ভাটা পূর্ণ হয়।

আবার ভূপৃষ্ঠ ম যে পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, অ স্থানের সাগর তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং পৃথিবী যেন একটু চাঁদের দিকে সরিয়া যান এবং তদুপরি যে জলরাশি, তাহা কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়ে, সুতরাং তথায় বর হইতে জল বহিয়া যায় এবং অএর জল ফাঁপিয়া উঠে অর্থাৎ খএ এবং অধোভাগ অএ যুগপৎ জোয়ার ঘটে।

উদাহরণ অমাবস্যার সময় চন্দ্র সূর্য্যের সন্নিকর্ষ বশতঃ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে কথঞ্চিৎ দূরে যান, আবার বিপরীত অবস্থায় পূর্ণিমার সময় সূর্য্য হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইলে পৃথিবী হইতে দূরে পড়েন। অমাবস্যার সময়ে সূর্য্যাকর্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে পড়েন। একথা অনায়াসে বুঝা যায়। পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর নিকটস্থ না হন কেন? পূর্ণিমার দিন চন্দ্র অপেক্ষা পৃথিবীর অধোভাগ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী থাকায় চন্দ্র অপেক্ষা পৃথিবী সূর্য্যের দিকে অধিক পরিমাণে সরিয়া যান, কাজেই পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে যে ব্যবধান তাহার বৃদ্ধি হয়। চান্দ্র মাসের মধ্যে চন্দ্রের দূরত্ব যেমন দুইবার বাড়ে, তেমনি চান্দ্রদিনের মধ্যে দুইবার সাগরের জল বাড়ে।

ইহার ভিতর আর একটী কথা আছে। চন্দ্রের ঠিক অধোভাগে ভূপৃষ্ঠে চন্দ্রের যে আকর্ষণ তাহার সহিত ৯০° অন্তরে যে আকর্ষণ, তাহার তুলনা করা আবশ্যক। যদি সুদীর্ঘ ও সমান দুই গাছি দড়িতে অদূরবর্ত্তী দুইটী বাঁটুল গাথিয়া একহাতে টান, তবে বাঁটুল দুইটী পরস্পরের দিকে সরিতে থাকিবে। বর্ত্তুলদ্বয়ের সমুপাগতির বেগ রজ্জুদ্বয়ের মধ্যগত কোণের অনুপাতী অর্থাৎ বর্ত্তুল দ্বয়ের অন্তরকে রজ্জুর দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল হয়, তাহার অনুপাতী। এই রূপে চন্দ্রকর্ত্তৃক চন্দ্রের অধোভাগ হইতে পৃথিবীর যে প্রদেশ ৯০° অন্তর তথা হইতে জল আকৃষ্ট হইয়া স্পর্শরেখাক্রমে চন্দ্রের অধোভাগে উচ্ছলিত হয়। ফল এই হয়, যেন তথায় পৃথিবীর আকর্ষণের বৃদ্ধি ঘটে। এই আকুঞ্চক বল বা ভূপার্শ্বে চন্দ্রাকর্ষণের ভূগর্ভাভিমুখ ত্রিংশাংশ পূর্ব্বোক্ত বিভেদক বা বিচ্ছেদক বলের অর্দ্ধমাত্র। অতএব সঙ্কোচক বল, যদি ১ ধর, তবে বিচ্ছেদক বল ২ হইবে, সুতরাং চন্দ্রের অধোভাগে এবং তাহার বিপরীত স্থলে যে বলদ্বারা জোয়ার হয়, তাহার পরিমাণ ৩ হইলে কাজেই ক্ষিতিজের জলাপেক্ষা মধ্যস্থলের জল অধিক হইল।

৬। **সূর্য্যাকর্ষণ জোয়ার ভাটার অন্যতর কারণ।**—চন্দ্রাকর্ষণে যেমন সিন্ধু-সলিল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি সূর্য্যাকর্ষণে উত্তরলিত হয়, রবিমণ্ডলের অত্যধিক দূরত্ব স্বত্বেও তন্মণ্ডলের সামগ্রীর বিপুলতাপ্রযুক্ত সামান্যতঃ তদীয় আকর্ষণ চন্দ্রাকর্ষণ অপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র বহুগুণে পৃথিবীর নিকটস্থ, তজ্জন্য পূর্ব্বব্যাখ্যাত চন্দ্রের যে বিচ্ছেদক ও আকুঞ্চক বল তাহা রবির তৎ তৎরূপ বল অপেক্ষা অনেক অধিক এবং এই আধিক্য ভূব্যাসের সহিত রবি ও চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাতের উপরও নির্ভর করে। ফলতঃ চন্দ্রাকর্ষণ সর্ব্বতোভাবে অধিক হয়।

৭। **রবি ও চন্দ্রের জলোচ্ছ্বাস-উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ ও ফল।**—গণিতের সুবিধার জন্য যদি ভূব্যাসার্দ্ধকে ১ ধর এবং তদীয় সামগ্রীকেও ১ ধর, তবে সূর্য্যের সামগ্রী ৩২২৭০০ এবং দূরত্ব ২৩ ২১৩, চন্দ্রের সামগ্রী ·০১২৩, দূরত্ব ৬০। দূরত্ব যে ৬০ ধরা গেল, তাহা চন্দ্রের সন্নিকৃষ্ট ভূপৃষ্ঠ হইতে ধরিলে ৫৯ হয় এবং বিপ্রকৃষ্ট পৃষ্ঠ হইতে ধরিলে ৬১ হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ পৃথিবীর সামগ্রী ÷ ভূব্যাসার্দ্ধ ২ চন্দ্রের আকর্ষণ $= \frac{\cdot ০১২৩}{৬০^২}$, সুতরাং চন্দ্রাকর্ষণ পার্থিব আকর্ষণের $\frac{\cdot ০১২৩}{৬০^২}$ অংশ, অতএব এই আকর্ষণ পৃথিবীর সন্নিকৃষ্ট ভাগে $\frac{\cdot ০১২৩}{৫৯^২} \times$ মাধ্যাকর্ষণ এবং বিপ্রকৃষ্টাংশে $\frac{\cdot ০২১৩}{৬১^২} \times$ মাধ্যাকর্ষণ। এক্ষণে এই দুই আকর্ষণ হইতে ৬০ দূরত্বে চন্দ্রাকর্ষণের অন্তর কত দেখিতে হইবে।

$$\text{মাধ্যাকর্ষণের} \left(\frac{\cdot ০১২৩}{৫৯^২} - \frac{\cdot ০১২৩}{৬০^২}\right) = \frac{\cdot ০১২৩ \{৬০^২ - (৬০ - ১)^২\}}{৫৯^২ \times ৬০^২} \times \text{মাধ্যাকর্ষণ}$$

$$= \frac{২ \times \cdot ০১২৩ \times ৬০}{৫৯^২ \times ৬০^২} \times \text{মাধ্যাকর্ষণ}$$

$$= \frac{২ \times \cdot ০১২৩}{৬০^৩} \times \text{মাধ্যাকর্ষণ এর আসন্ন}$$

অতএব এই আকর্ষণ নিকটস্থ দিকে কিঞ্চিৎ অধিক, দূরস্থ দিকে কিঞ্চিৎ কম অর্থাৎ যেদিকে চাঁদ থাকেন সে দিকের জোয়ার বিপরীত দিকের জোয়ার অপেক্ষা কম; কিন্তু কার্য্যতঃ হিসাবে শেষোক্ত ভগ্নাংশ গ্রহণ করিলেই চলে। অতএব সূত্র হইল এই যে

ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ ভূগর্ভ হইতে ১ অন্তরে চন্দ্রের বিচ্ছেদক বল : মাধ্যাকর্ষণ : : ২ গুণিত চান্দ্রসামগ্রী : (দূরত্ব)^{৩};

সেইরূপ সূর্য্যের বিচ্ছেদক বল : মাধ্যাকর্ষণ : : ২ × ৩২২৭০০ : ২৩২১৩^{৩}। সূর্য্যের দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ অত্যল্প, অতএব সৌরাকর্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ধরা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সঙ্কোচক বল = রবি বা চন্দ্রের আকর্ষণ × $\frac{১}{(\text{রবি বা চন্দ্রের দূরত্ব})^{২}}$

$= \frac{\cdot০১২৩}{৬০^{২}} \times \frac{১}{৬০} = \frac{\cdot০১২৩}{৬০^{৩}}$ বা চন্দ্র পক্ষে $= \frac{৩২২৭০০}{২৩২১৩^{৩}}$ সূর্য্য পক্ষে এই সঙ্কোচক বলদ্বয় পূর্ব্বোক্ত বিচ্ছেদক বলদ্বয়ে যথাক্রমে যোগ করিলে

$$\frac{\text{রবির জলোচ্ছ্বাসক বল সমষ্টি}}{\text{মাধ্যাকর্ষণ}} = \frac{৩২২৭০০ \times ৩}{২৩২১৩^{৩}};\ \text{এবং}$$

$$\frac{\text{চন্দ্রের জলোচ্ছ্বাসক বল সমষ্টি}}{\text{মাধ্যাকর্ষণ}} = \frac{\cdot০১২৩ \times ৩}{৬০^{৩}}।$$

এই দুইটি অঙ্ক কসিলেই দেখিতে পাইবে যে চন্দ্রের ও সূর্য্যের যে বলদ্বারা জোয়ার ভাটা ঘটে, সে বল অপেক্ষা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মধ্যম দূরত্বে যথাক্রমে ৬০ লক্ষ ও ১৩০ লক্ষ গুণে অধিক। অতএব $\frac{১}{৬০}$ আর $\frac{১}{১৩০}$ এর যোগে $\frac{১৯}{৭৮০} = \frac{১}{৪০}$ এর আসন্ন; অতএব পৃথিবীর জলের উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তাহা পক্ষান্তে রবি ও চন্দ্রের আকর্ষণ অপেক্ষা ৪০ লক্ষ গুণ অধিক।

পৃথিবী যদি ২১০ লক্ষ ফুট পরিমিত ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট বর্ত্তমান সান্দ্রত্বের হারাহারি সমসান্দ্র দ্রবময় গোল হইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্র মাধ্যাকর্ষণের ৪০ লক্ষ ভাগের একভাগ পরিমাণে উচ্ছ্বাসক বল হইত। কোন গোলের ও সেই গোলের অন্তর্লগ্ন গোলাভাসের গুরুত্বের যে অনুপাত, তাহা উক্ত পিণ্ডদ্বয়ের অক্ষপরিমাণের অনুপাতের সমান; অতএব কল্পিত দ্রবময় ভূগোল উচ্ছ্বাসক বলদ্বারা আকৃষ্ট হইলে উহার দীর্ঘব্যাসার্দ্ধ হ্রস্বব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা ৫½এর অধিক হইবে; কিন্তু ভূব্যাসার্দ্ধের তুলনায় সাগরের গভীরতা অকিঞ্চিৎকর; অতএব এ হিসাব খাটে না, ফলতঃ রবিচন্দ্রের আকর্ষণজনিত জলোচ্ছ্বাসপ্রযুক্ত পৃথিবীর যে বৃত্তাভাসত্ব জন্মে, তাহা ৬০ লক্ষ ভাগের এক ভাগমাত্র, অতএব মহাসমুদ্রে অত্যধিক জোয়ারের উচ্চতা ৩½ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না।

কিন্তু রবি ও চন্দ্র স্ব স্ব কক্ষার বৃত্তাভাসত্ব প্রযুক্ত সতত পৃথিবী হইতে সমদূরে থাকেন না, পর্য্যায়ক্রমে পৃথ্বীর সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট হন; এইকারণে জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে সূর্য্যাকর্ষণ ১৯ হইতে ২১ পর্য্যন্ত হয় এবং চন্দ্রাকর্ষণ ৪৩ হইতে ৫৯ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং খুব পূরাকোটালের

সহিত খুব মরাকোটালের তুলনা করিতে হইলে ৫৯+২১এর সহিত ৪৩—২১এর অর্থাৎ ৮০র সহিত ২২এর অনুপাত দেখিতে হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রথমার্দ্ধে চান্দ্রোচ্ছ্বাসের পশ্চিমে সৌরোচ্ছ্বাস ঘটে, সুতরাং উভয়বিধ উচ্ছ্বাসের ফল যে জোয়ার, তাহা কেবল চন্দ্রাকর্ষণ জনিত যে স্থানে ঘটিত, তাহার পশ্চিমে ঘটিবে, ইহাকেই বলে বিলম্বিত জোয়ার। সদৃশ কারণবশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের শেষার্দ্ধে যে জোয়ার হয়, তাহাকে দ্রুত জোয়ার বলে। সুতরাং স্থান বিশেষে জোয়ার কেবল চন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দিন দিন ২দণ্ড পরে হয় না; কথন কথন এক ঘণ্টার অধিক বিলম্বে হয়, কথন কথন ৩৮ মিনিটের মধ্যে হয়।

৭। জোয়ার ভাটার পরিমাণ চান্দ্রক্রান্তির বশবর্ত্তী। চন্দ্র যথন বিষুবমণ্ডলে থাকেন, তথন নিরক্ষপ্রদেশে জোয়ারের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ২১এ মার্চ্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর এই দুই দিবস সূর্য্য বিষুবমণ্ডলে আসেন, ঐ সময় যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পড়ে এবং চন্দ্র সূর্য্য যদি সমক্ষেত্রস্থ বা আসন্ন ক্ষেত্রস্থ হন, তবে নিরক্ষপ্রদেশে সে জোয়ার সম্বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তথন উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে জোয়ার কম হইতে থাকে, কিন্তু একস্থানে অহোরাত্রে যে দুই জোয়ার হয়, তাহার উচ্ছ্বাস সমান থাকে। চন্দ্রের উত্তরক্রান্তি যত তত যদি কোন স্থানের উত্তর অক্ষাংশ হয়, তবে ঐস্থানে এবং উহার প্রতীপ দক্ষিণ অক্ষাংশে অত্যধিক জোয়ার হয়। দিনরাত্রির ভিতর যে দুই জোয়ার হয়, তাহার মধ্যে যে জোয়ারের সময় চন্দ্র খস্বস্তিকে বা তৎসমীপে থাকেন, সেই জোয়ারই অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। অতএব চন্দ্রের ক্রান্তি উত্তর হইলে উত্তর ভূগোলে ক্ষিতিজের উপর চন্দ্র থাকিলে বেশী জোয়ার এবং ক্ষিতিজের নীচে চন্দ্র থাকিলে কম জোয়ার হয়। এই সময় দক্ষিণ খগোলে চন্দ্র ক্ষিতিজের অধোভাগে থাকিলে বেশী জোয়ার এবং ক্ষিতিজের উপর থাকিলে কম জোয়ার হয়।

৮। রবি চন্দ্র এবং দর্শকের অবস্থান ভেদে জোয়ার ভাটার ভেদ। এখনই বলা হইল যে ক্ষিতিজের উপর চন্দ্র থাকিলে যে পরিমাণে জোয়ারের জল বাড়ে, চন্দ্র ক্ষিতিজের অধোভাগে থাকিলে সর্ব্বত্র তাহার সমান পরিমাণে জল বাড়ে না, উভয়ের মধ্যে প্রায়ই তারতম্য হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ জোয়ারকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত জোয়ারকে প্রধান ও শেষোক্ত জোয়ারকে অপ্রধান বলা যায়। খস্বস্তিকে বা অধোবিন্দুতে চন্দ্র থাকিলে জোয়ারের অতিশয় বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র বিষুবমণ্ডলে থাকিলে প্রধান ও অপ্রধান উভয়বিধ জোয়ার সমান হয়। চন্দ্রের ক্রান্তি যতই হউক না কেন, দর্শকের অবস্থান যদি বিষুবমণ্ডলে হয়, তবে প্রধান ও অপ্রধান জোয়ারে কোন ভেদ থাকে না। চন্দ্রের ক্রান্তি এবং দর্শনস্থানের অক্ষাংশ যদি এক দিকৃস্থ অর্থাৎ উভয়েই নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণপার্শ্বস্থ হয়, তবে অপ্রধান জোয়ার অপেক্ষা প্রধান জোয়ার অধিক হয়, কিন্তু ক্রান্তি ও অক্ষাংশ যদি ভিন্ন দিকৃস্থ হয়, তবে প্রধান জোয়ার অপেক্ষা অপ্রধান জোয়ার বেশী হয়।

যদি চন্দ্রের লম্ব অর্থাৎ বিক্ষেপের কোটি ক্রান্তির সমান বা কম হয় এবং দর্শকের বাসস্থানের অক্ষাংশ এবং ক্রান্তি যদি এক জাতীয় অর্থাৎ এক দিকৃস্থ হয়, তবে অপ্রধান জোয়ার ঘটেনা এবং অক্ষাংশ ও ক্রান্তি যদি ভিন্ন জাতীয় হয়, তবে প্রধান জোয়ার ঘটে না।

মেরুদ্বয়ে দৈনিক উচ্ছ্বাস হয় না। তথায় কেবল দুইটী মাসিক জোয়ার হয়। চন্দ্র বিষুবমণ্ডলে থাকিলে ভাটা পড়ে।

চন্দ্রের অবস্থান ভেদে যেরূপ জোয়ারের ভেদ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যের অবস্থান ভেদেও সেইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়।

৯। **জলোচ্ছ্বাসের পক্ষে স্থানীয় ব্যাঘাত।** যদি নিখিল ভূমণ্ডল পূর্ণগোলাকার হইত, বিনা ব্যবধানে সুগভীর সমতল সাগর বেষ্টিত হইত, তবে জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে যে সকল ব্যাপারের গণিতাগত কালাদির উল্লেখ করা গেল, সে সকল ব্যাপার যথাযথারূপে যথাযথকালে ঘটিবার কোন ব্যাঘাত থাকিত না। কিন্তু বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের দশ আনামাত্র জলপূর্ণ এবং তাহারও স্থানে স্থানে গভীরতা একমাইলের অধিক হইবে না। অতএব বেলার বক্রভাব, সাগরতলের বন্ধুরতা, বায়ুর কার্য্য, স্রোতের বেগ, কূল, তল ও জলের সংঘর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ কারণ বশতঃ দৃগ্‌গত ও গণিতাগত জলোচ্ছ্বাসের একতা প্রায় সহজে ঘটে না। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের একদিকে সুমেরু হইতে নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করিয়া বহুদূর দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত আমেরিকা, অপর দিকে যুরোপ আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়। আট্‌লাণ্টিক সাগরোদ্ভূত উচ্ছ্বাস তরঙ্গের অপ্রতিহতরূপে পর্য্যটনের উপায় নাই। উত্তর ভূগোলে আট্‌লাণ্টিকের প্রবাহ প্রশান্তমহাসাগরে বিক্রত হইবার এক বেরিংপ্রণালী ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, কিন্তু এই প্রণালী ৩৫ মাইলমাত্র চওড়া, সুতরাং উত্তর পথাবলম্বনপূর্ব্বক আট্‌লাণ্টিক তরঙ্গের প্রশান্তমহাসাগরে প্রবেশ অসাধ্য। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তে হরণ নামক যে অন্তরীপ, তাহা নিরক্ষপ্রদেশ হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণে, তাহার দক্ষিণে দ্বীপমালা, আরও দক্ষিণে জলমগ্ন মহাদ্বীপের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব সাগরোচ্ছ্বাসের পক্ষে প্রসারিত হইবার জন্য সর্ব্বদক্ষিণে একটী সঙ্কীর্ণ পথমাত্র আছে এবং এ পথ দিয়া উচ্ছ্বাসতরঙ্গ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়, সুতরাং আট্‌লাণ্টিকের জল কোনরূপে প্রশান্তমহাসাগরে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

১০। **সমসাময়িক উচ্ছ্বাস রেখা।** গণিতাগত উচ্ছ্বাসের কাল ও উচ্চতা এই দুইএর কোনটীই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায়সমূহ সত্ত্বে দৃক্‌সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে, অতএব কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে কি পরিমাণে জোয়ার ভাঁটা হয়, তাহা ঠিক জানিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফল সহজে জানিবার এই এক উত্তম উপায়। ভূমণ্ডলে যে যে স্থানে যুগপৎ জোয়ার হয়, ভূচিত্রে সেই সেই স্থান দিয়া রেখা টানিয়া সেই রেখার উপর সময় লিখিয়া রাখুন। এরূপ রেখা সকলকে সমোচ্ছ্বাস রেখা বলা যায়।

১১। **উচ্ছ্বাস তরঙ্গের উৎপত্তি-স্থান।** উক্ত রূপ চিত্রদর্শন করিলে উপলব্ধি

হইবে যে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরে প্রশান্তমহাসাগরে উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের জন্মস্থান। তথায় চন্দ্রের রেখোত্তরণের ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টার পর জোয়ার আরম্ভ হয়। এই মহাতরঙ্গ যদি অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতে পারিত, তবে ইহার বেগ সাধারণ তরঙ্গের ন্যায় জলের গভীরতার উপর নির্ভর করিত। তরঙ্গের বিস্তৃতি যদি গভীরতার তুলনায় অত্যধিক হয়, তবে ঐ তরঙ্গের বেগ, কোন গুরুপদার্থ মাধ্যাকর্ষণপ্রযুক্ত ঐ জলের ভিতর দিয়া পতন কালে জলের গভীরতার অর্দ্ধপথে আসিবার সময় যে বেগ লাভ করে, সেই বেগের সমান হয়।

জলের গভীরতা যদি ২৫ ফুট হয়, তবে তরঙ্গের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৯ মাইল এবং জলের গভীরতা যদি ১০০ ফুট হয়, তবে তরঙ্গের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩৯ মাইল হয়।

”	২৫০	”	৬১	”
”	১,০০০	”	১২২	”
”	৫,০০০	”	২৭৩	”
”	২০,০০০	”	৫৪৭	”
”	৫০,০০০	”	৮৬৫	”

১২। উচ্ছ্বাস তরঙ্গের বেগ ও গতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান জল থাকিলে উচ্ছ্বাসতরঙ্গের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,০০০ মাইলের অধিক হইত, কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৭৯২৬, অতএব ইহার পরিধি ৭৯২৬ × ৩·১৪১৬ এবং চন্দ্রের উপর্য্যুপরি দুইবার মধ্য-রেখায় উপনীত হইবার ব্যবহিত কাল ২৪·৮ঘণ্টা, অতএব চন্দ্র প্রতি ঘণ্টায় ৭৯২৬ × ৩·১৪১৬ ÷ ২৪·৮ = ১০০০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করেন। চন্দ্র দিন দিন ঘণ্টায় ১০০০ মাইলের হিসাবে পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, সুতরাং জোয়ারও ঐবেগে চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিবার উপক্রম করে, কিন্তু সমুদ্রের অধিকাংশের গাধতাপ্রযুক্ত জোয়ার চন্দ্রের অনুগামী হইতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে মহোচ্ছ্বাস তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া সুগভীর প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া প্রতি ঘণ্টায় ৮৫০ মাইলের হিসাবে চলিয়া দশ ঘণ্টায় কামস্কৎকা উপকূলে উপনীত হয়। এই তরঙ্গ আবার বারিধির গভীরতার অল্পতাপ্রযুক্ত ঘণ্টায় ৪০০ মাইলের হিসাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ১২ ঘণ্টার পর নবজিলণ্ডে উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল অতিক্রম করিয়া উক্ত উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ পশ্চিম ও উত্তরাভিমুখে ভারত মহাসাগরে পতিত হয়, এবং উত্তমাশা অন্তরীপে উপনীত হইতে উহার ২৯ ঘণ্টা সময় লাগে। তথা হইতে ঘণ্টায় ৭০০ মাইলের হিসাবে চলিয়া উৎপত্তিকাল হইতে ৪০ ঘণ্টার পর অগভীর ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের উপকূল পৌঁছে, এবং তথা হইতে তত্রত্য উপসাগর ও নদীমুখে প্রবেশ করে।

১৩। অগভীর জলে উচ্ছ্বাস তরঙ্গের বেগ। সুগভীর জলে উচ্ছ্বাস তরঙ্গ ঘণ্টায় ৯০০মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, ক্রমে যত উপকূলের নিকটস্থ হইতে থাকে, তত বেগের

হ্রাস হয়, পরে ঘণ্টায় ১০০ বা ৩০ মাইল মাত্র হইয়া পড়ে এবং তদনন্তর যত সাগরশাখা ও নদীমুখে প্রবেশ করিতে থাকে, বেগ ততই কমিয়া আসে। ভাগীরথীকূলে ডায়মণ্ডহারবারের উপর জোয়ারের বেগ ঘণ্টায় ১৭ মাইল, ভাটার বেগ ১৫ মাইল; ডায়মণ্ডহারবারের নীচে জোয়ারের বেগ ঘণ্টায় ১৮ মাইল, ভাটার বেগ ১৪; সাগরের বাতীঘরের নীচে জোয়ারের বেগ ঘণ্টায় ৩৭ মাইল ও ভাটার বেগ ২৫ মাইল মাত্র।

১৪। সাগরোচ্ছ্বাস কি কারণে তরঙ্গিত হয়। যদি চন্দ্রাকর্ষণ-জনিত সাগরোচ্ছ্বাস সমুত্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রমণ্ডল অকস্মাৎ লোপ প্রাপ্ত হয় এবং কেবল সাগরের গভীরতা অনুসারে যেথানে যেমন বেগ সম্ভব, সেই বেগ অনুসারে ঢেউ চলিতে থাকে, তবে এবম্ভূত ঢেউকে অনধীন ঢেউ বলা যায়। চন্দ্রের প্রয়াসে উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ তাঁহার ঠিক অধোভাগে থাকিয়া ক্রমাগত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তে উচ্ছ্বাস তরঙ্গ চন্দ্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় ১০০০ মাইলের হিসাবে পশ্চিমাভিমুখে চলিতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ তরঙ্গ ঘটে, তবে ইহাকে সমাকৃষ্ট তরঙ্গ বলা যায়, কারণ এরূপ তরঙ্গের বেগ সাগরের গভীরতার অধীন; সুতরাং প্রস্তাব এই হইতে পারে যে এই মহা-তরঙ্গকে কি বলিব, অনধীন না সমাকৃষ্ট? আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতা এক রকম স্থূলতঃ নিরূপিত হইয়াছে; এই মহাসাগরের উচ্ছ্বাস তরঙ্গের বেগ দেখিয়া উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। উত্তর আটলাণ্টিকে নিরক্ষ প্রদেশ হইতে গ্রীনলণ্ডের দক্ষিণ পর্য্যন্ত জোয়ারের বেগ ঘণ্টায় ৬৪০ মাইল, সুতরাং জানা গেল যে, তথায় সাগরের গভীরতা ২৬।২৭ হাজার ফুটের কম নহে। আটলাণ্টিকের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ অনধীন তরঙ্গ অপেক্ষা ½ অধিক বেগবান্; এই বেগের আধিক্য রবিচন্দ্রের আকর্ষণের সাক্ষাৎ ফল; সুতরাং উচ্ছ্বাস তরঙ্গকে কিয়ৎ পরিমাণে অদৃষ্ট তরঙ্গ বলিতে হইবে। কিন্তু ঢেউ যে হিসাবে চলে, তাহা প্রধানতঃ জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে।

১৫। জোয়ারের উচ্চতা। সাগরের মধ্যগত ছোট ছোট দ্বীপে জোয়ারের জল অত্যল্পই উঠে, এমন কি কোথাও কোথাও এক ফুটের কম। আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপ সকলে জোয়ার হারাহারি ৩½ ফুটের বেশি উঠে না। বঙ্গোসাগরের উৎকল উপকূলে জোয়ার হারাহারি ২½ ফুট উঠে। উচ্ছ্বাস তরঙ্গ যতই বিস্তৃত উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জলের গাধতাপ্রযুক্ত তরঙ্গের বেগ কমিতে থাকে এবং সমোচ্ছ্বাস রেখা সকল ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট হইতে থাকে, কাজেই জোয়ারের জল উত্তরোত্তর উচ্চ হইতে থাকে এবং সাগর মধ্যে জোয়ার যখন ৩½ ফুট উঠে, উপকূলে তখন ৪।৫ ফুট মাত্র উঠিয়া থাকে।

ভারত মহাসাগরের উপকূলে নিম্নলিখিত বন্দর সকলে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় ভাটার জল যত ফুট নীচে পড়ে, তাহার উপর জোয়ারের জল যত উঠে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল;——

এডেন (আরবের দক্ষিণ) ৭ফুট ০ইঞ্চ। নাগপত্তন ২ ফুট ৯ ইঞ্চ

করাচি (গুজরাটে)	৯ফু	৪ই	মান্দ্রাজ	৩ফু	৬ই
ওখা অন্তরীপ	১৩	৬	বিশাখপত্তন	৫	০
বোম্বাই	১৪	৮	ফল্‌স পয়েন্ট	৭	৬
মার্ম্মাগোয়া	৬	১০	কলিকাতা	১২	০
পম্বেন (সেতুবন্ধ) রামেশ্বর	২	৪	রেঙ্গুন	১৮	০
গল (সিংহলে)	২	০	মৌলমেন	১৩	৬

১৬। জোয়ারের উচ্চতা উপকূলের আকারের উপর নির্ভর করে।—উপকূল যদি অনুক্রকচ হয় অর্থাৎ উপকূলে যদি অনেক সাগর শাখা থাকে এবং ঐ শাখা-গুলির মুখ যদি বিস্তৃত এবং জোয়ার প্রবেশের অনুকূল হয়, তবে উচ্ছ্বাস তরঙ্গের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় উহার উচ্চতা বাড়ে এবং শাখা প্রবেশ-স্থলে যত জোয়ার হয়, শাখার শেষ ভাগে সে জোয়ার বহুগুণে অধিক হয়।

যদি অবিস্তৃত ভূভাগ সাগরের বহুদূর অবধি যায়, তবে উহার উভয় পার্শ্বের জোয়ার অধিক বাড়ে, কিন্তু উক্ত ভূমির অন্তে জোয়ারের পরিমাণ হারাহারি অপেক্ষা কম হয়।

যাহা কিছু বলা হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ (নিম্নলিখিত স্থান সকলে) ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১০ জানুয়ারি পূর্ণিমার জোয়ারের উচ্চতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

পম্বেন	২	ফুট	৯	ইঞ্চ
মান্দ্রাজ	৩	,,	২	
বিশাখপত্তন	৪	,,	১	
ফল্‌স্‌পয়েন্ট	৭	,,	৭	
কলিকাতা	১৫	..	৩	

১৭। নদীতে জোয়ার। সাগরোপকূলে যে সকল কারণে জোয়ারের উচ্চতার বৃদ্ধি দেখা গেল, নদীতেও সেইরূপ কারণে তদ্রূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। নদী যদি বরাবর সমান চওড়া ও সমান গভীর হয়, তবে সংঘর্ষণ নিবন্ধন জোয়ারের উচ্চতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়; কিন্তু যদি নদীর মোহনা হইতে উপর দিকে ক্রমশঃ শীঘ্র শীঘ্র কম চওড়া হইতে থাকে কিম্বা গর্ভে চড়া দৃষ্ট হয়, তবে জোয়ারের জল অধিক উচ্চ হয়।

ভাগীরথীতে যে "বান ডাকে" বলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখে এবং ভাদ্র আশ্বিনে যে ষাঁড়া-ষাড়ীর কোটাল হয়, তাহার কারণ গর্ভের চড়া ও চওড়ার অল্পতা। ঘুষুড়ীর টেঁকে কলিকাতায় বাগ্‌বাজারের সম্মুখে ও চুচুড়ার কলেজের সম্মুখে যে বান ডাকে, তাহা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই দেখা গেল, ভাগীরথী মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে একবারে গুরুতর গম্ভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক ভয়ানক উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এই তরঙ্গের বেগে পড়িয়া কোন কোন নৌকা চূর্ণ হইয়া যায়, কোন কোন নৌকা যেন দাসত্ব শৃঙ্খল স্বরূপ নোঙ্গর শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নবাস্বাদিত স্বাধীনতা

মধুপানে মত্ত হইয়া উর্ম্মিশীর্ষে নর্ত্তন করিতে করিতে নানা বিভ্রমবিলাসপ্রকাশপূর্ব্বক জলমধ্যে লীলা সম্বরণ করে, মাঝিরা সামাল সামাল করিতে থাকে, কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়ে, কোন নির্ভীক নাবিক এই দুর্যোগকে সুযোগ জ্ঞান করিয়া 'দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর' স্মরণপূর্ব্বক নৌকা খুলিয়া যাত্রা করে; স্নানার্থী ও পানার্থীরা নানাভঙ্গে পলায়ন করিতে থাকে; হুলুস্থূল ব্যাপার। এ পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত যেন এক তরঙ্গসেতু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইতেছে, এক তরঙ্গের উপর আর এক তরঙ্গ, তাহার উপর আর এক তরঙ্গ, এইরূপ যাবৎ না উভয়কূল জলপূর্ণ হয়, তাবৎ এক নয়ন-ভয়দ চমৎকারশোভা দর্শকেরা নয়নগোচর করেন।

১৮। এক স্থানের দিনের জোয়ার রাত্রির জোয়ারের সমান হয় না। রবি ও চন্দ্র উভয়ে যদি সর্ব্বদা বিষুবমণ্ডলের ক্ষেত্রে থাকিতেন এবং মৃণ্ময়ী যদি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে অগাধ জলে পরিপ্লুত থাকিতেন, তাহা হইলে অহোরাত্রির মধ্যে যে দুইটি জোয়ার হয়, তাহার অসমতা প্রায় ঘটিত না। কিন্তু যখনই রবি বা চন্দ্র বিষুবমণ্ডল অতিক্রম করেন, তখনই আর রাত-জোয়ার আর দিন-জোয়ারের সহিত মিলে না। চন্দ্র কখন কখন ২৮° পর্য্যন্ত বিষুবমণ্ডল হইতে উত্তরে যান; যে যে স্থানের অক্ষাংশ ২৮° সেই সেই স্থানের জোয়ার অত্যধিক হয়। কলিকাতার অক্ষাংশ ২২° ২৩´ উত্তর, তজ্জন্য যে দিন চন্দ্রের ক্রান্তি ২২°।২৩´ হয়, সেই দিন কলিকাতার জোয়ার বাড়ে।

১৯। দৈনিক জোয়ারের বিষমতা সর্ব্বত্র সমান না হইবার কারণ।—শুদ্ধ রবি-চন্দ্রের আকর্ষণপ্রযুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরে যে জলোচ্ছ্বাস জন্মে এবং সেই উচ্ছ্বাস ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে দেখা যায়, এমত নহে। উচ্ছ্বাসের উৎপত্তি হইতে বন্দরে আগমন পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা কখন ২৪ কখন বা ৪৮ কখন বা তদধিক হয়। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তরঙ্গ নানা সাগরোপসাগর দিয়া পর্য্যটন করে এবং সেই সেই জল ও ঐ তরঙ্গ তৎকালে চন্দ্রার্ক দ্বারা আকৃষ্ট হয়; এইরূপ আকৃষ্ট হওয়াতে জোয়ার সম্বন্ধে একটি সংশ্লিষ্ট ফল জন্মে; সুতরাং রাত-জোয়ারে ও দিন-জোয়ারে যে পার্থক্য তাহা মূলেই হয় থাকে না, না হয়তো অতিশয় বাড়িয়া যায়।

২০। চব্বিশ ঘণ্টায় চারি জোয়ার।—স্কটলণ্ডের উত্তরে উত্তর সাগর এবং ইংলিস প্রণালী এই দুই দিক্ দিয়াই জোয়ার আইসে। উহারই মধ্যে কোন কোন স্থানে এক দিকের জোয়ার অন্য দিকের জোয়ারের উপর পড়িয়া একীভূত হইয়া যায়, ভেদ কিছু বোঝা যায় না। কোন কোন স্থানে এক জোয়ার আসিবার ২।৩ ঘণ্টা পরে জোয়ার আইসে, সুতরাং রাত্রি দিনের মধ্যে চারিবার জোয়ার দেখা যায়।

২১। প্রশান্ত মহাসাগরে জোয়ার।—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে তাহিতি এবং সোসাইটি নামক দ্বীপপুঞ্জদ্বয় সমীপে জোয়ার ও ভাটার পরিমাণ এবং আরম্ভকাল সম্বৎসর সমভাব থাকে। প্রতি দিন দুই প্রহর ও রাত্রি দুই প্রহরের সময় জোয়ার আরম্ভ হয়

এবং প্রাতে ৬টা ও সন্ধ্যা ৬ টার সময় ভাটা পড়ে। ভাটার উপর জোয়ার ১৮ ইঞ্চি না হয় জোর ২৪ ইঞ্চি উঠে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের বিশিষ্ট কারণ যে কি তাহা বলা যায় না। তবে একটা কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহিতি বন্দরে, মাথার উপর যখন চাঁদ আসেন তাহার ৬ ঘণ্টা পরে, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্বাংশ হইতে জোয়ার আসিয়া উক্ত বন্দরে উপনীত হয়, সুতরাং তখন চাঁদ অস্তমিত হওয়াতে ভাটা আরম্ভ হয়। তবেই যেমন জোয়ার আসিল, অমনই ভাটা পড়িল, কাজেই জল সমভাব প্রাপ্ত হয়।

২২। ভূমধ্যসাগরে বা তৎসদৃশ জলভাগে জোয়ার।—ভূমধ্যসাগর প্রায় ২৪০০ মাইল অর্থাৎ ভূপরিধির দশমাংশ লম্বা, তথাপি মহাসাগরে জোয়ারের জল যত উঠে, তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র এখানে উঠিয়া থাকে; জিব্রল্টর প্রণালীতে জোয়ারের উচ্চতা ২ বা ৪ ফুট; ভিনিস নগরের নিকট ১½ ফুট হইতে ৪ ফুট এবং টুলিসে কখন কখন ৩ ফুট পর্য্যন্ত উঠে। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরে জোয়ার টের পাওয়া যায় না।

২৩। জোয়ারের কার্য্য।—জলের হ্রাস বৃদ্ধি প্রযুক্ত স্রোত জন্মে; ভাগীরথীতে হুগলি পর্য্যন্ত জোয়ার যে কত তেজে উঠে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। যদি জোয়ারের জল প্রবেশ করাইয়া কোন জলাশয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখা যায়, এবং পশ্চাৎ উহার মোহনা কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে জল যখন তেজে বাহির হইতে থাকে, তখন তদ্দ্বারা কোন জলযন্ত্র চালাইয়া গমভাঙ্গা বা তদ্রূপ অন্য অনেক রকম কার্য্য করান যাইতে পারে। তবেই জোয়ারের জল একটি প্রকৃত কার্য্যকারী বল। যদি ষ্টীম্ এঞ্জিন অপেক্ষা জল দ্বারা জাঁতা চালান কম খরচায় হইল, তবে ভাগীরথীর উভয়কূলে শত শত জলযন্ত্র দ্বারা তৈল প্রস্তুত, গম পেষা, পাটকাটা প্রভৃতি অনেক প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইত। শতাশ্ববলবিশিষ্ট জলযন্ত্র চালাইতে ১৪০ বিঘা জলাশয় লাগে।

সে যাহা হউক জলোচ্ছ্বাস দ্বারা কোন না কোন কার্য্য হইতেছে। জোয়ার দ্বারা সাগর-শাখার নদ ও হ্রদের কূল অনবরত খাইয়া যাইতেছে; এইরূপ ব্যাপারকে ভাঙ্গন, ধস বা অতড়া খসা বলে। এইরূপে মাটী কাটিয়া স্থানান্তরে ফেলিতে হইলে কত জন মজুর লাগিত। অতএব জোয়ার দ্বারা অনবরত কার্য্য হইতেছে, সুতরাং অনবরত তাহার বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং বলক্ষয় ভিন্ন কার্য্য হয় না তাহা কাহার অবিদিত নাই। জোয়ারের বল কোথা হইতে আসিল? জোয়ারের নিমিত্ত কারণ চন্দ্রাকর্ষণ বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকারী বল চন্দ্রগত নহে পৃথ্বীগত। ব্যাপার কি তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

২৪। পৃথিবীর অঙ্গাবর্ত্তন এই বলের মূল।—ষ্টীম এঞ্জিনের ফ্লাই হুইলের আবর্ত্তন যদ্রূপ এঞ্জিনের কার্য্যের কারণ, পৃথিবীর আহ্নিক গতিও তদ্রূপ জোয়ারের কার্য্যের কারণ। এঞ্জিনের সমস্ত বল ফ্লাই হুইলে সঞ্চিত হয়; উহার প্রত্যঙ্গরূপ উপযন্ত্র দ্বারা

যে সমস্ত কার্য্য সমাধা হয়, তাহা ঐ ফ্লাইহুইলে সঞ্চিত বলের ফল মাত্র। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড অত্যদ্ভুত ফ্লাইহুইল, ইহার আকার যেমন, বিশাল বেগও তেমনই; এবং ইহার বলের ইয়ত্তা নাই। যাবৎ না এই বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাবৎ এই ভূচক্রের আর বিরাম নাই।

২৫। জোয়ার অহোরাত্রের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ।—এঞ্জিনের ফ্লাই-হুইলের বল যতই কার্য্য করিয়া কমিতে থাকে, ততই উহা এঞ্জিন দ্বারা পূর্ণ হয়; কিন্তু ভূচক্রে এঞ্জিন নাই, ইহার বল যদিও অপরিসীম, তথাপি বুঝিতে হইবে যে প্রতিনিয়ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষয় হইতেছে। ফ্লাইহুইল এঞ্জিন হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ঘুরিতে থাকে, পরে একেবারে থামিয়া যায়; কিন্তু ভূচক্রের এতই বল ও এতই বেগ যে যুগান্তেও সে বেগের হ্রাস জানিতে পারা যায় না। জোয়ারের কার্য্যজনিত পৃথিবীর আহ্নিক গতির অবসান মন্বন্তরে হইলেও হইতে পারে। তবেই বোঝা গেল যে জোয়ার জন্য পৃথিবীর অক্ষা-বর্ত্তনের বেগ ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে, সুতরাং অহোরাত্রের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

২৬। অহোরাত্র হ্রাসের সীমা।—কল্য অপেক্ষা অদ্য অহোরাত্রের পরিমাণ একটু বেশি হইয়াছে, আগামী কল্য আরও একটু বাড়িবে; কিন্তু এ বৃদ্ধির পরিমাণ এতই কম যে সহস্র বর্ষান্তে বেধ দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না। এবম্বিধ দীর্ঘকাল গণনায় এককের স্থলে শতক ধরিলেও চলে না। ত্রেতার প্রারম্ভে যে অক্ষাবর্ত্তনের কাল ছোট ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দিনমান (অহোরাত্রের মান) এক্ষণে ২৪ ঘণ্টা, কোন কালে ১৮, কোন কালে ১২ এবং কোন কালে ৬ ঘণ্টা মাত্র ছিল। দিনমান কোন কালে ৬ ঘণ্টার কম ছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। দিন যত ছোট হয়, আবর্ত্তন বেগ তত বাড়ে, সুতরাং নিরক্ষপ্রদেশ ততই ফাঁপিয়া উঠে; এবং নিরক্ষদেশ যতই ফাঁপে ততই অক্ষাবর্ত্তন হয়, অক্ষাবর্ত্তন জনিত পার্থিব পদার্থনিচয় কেন্দ্র বিমুখ বলের বশবর্ত্তী হয়। পৃথিবী যখন অত্যন্ত বেগে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকিবেন, তখন পদার্থসমূহের সংশ্লেষের অপচিতি প্রযুক্ত সুদূরে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। গমপেষা জাঁতা যদি অত্যন্ত বেগে ঘুরাণ যায়, তবে উহা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চারিদিকে ছট্‌কাইয়া পড়িবে। তবেই অক্ষাবর্ত্তনের বেগের এমনই একটি সীমা আছে যে, তাহার অধিক পৃথিবী আর ধারণ করিতে পারেন না, ফলে বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সে বেগের পরিমাণ যে কত, তাহা ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য। কারণ এরূপ বেগের পরিমাণ মেদিনীর উপকরণীভূত পদার্থ সকলের গুণের উপর, তাপমাণের উপর, চাপের উপর এবং আর আর পাঁচ রকমের উপর নির্ভর করে, ইহার মধ্যে কোনটাই ঠিক জানা নাই। বিজ্ঞান বিশারদেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী ৩ বা ৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিলে বিদীর্ণ বা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

২৭। পৃথ্বীন্দু এই দ্বিজ্যোতিষিক বিগ্রহের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।—এক্ষণে জানা গেল যে, চন্দ্রাকর্ষণজনিত অতি প্রাচীন কাল হইতে দিনমান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া

বর্ত্তমান কালে ২৪ ঘণ্টা হইয়াছে। দিনমানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের দূরত্বের বৃদ্ধি হই-তেছে। এক্ষণে চান্দ্রকক্ষার ব্যাসার্দ্ধ ২,৪০,০০০ মাইল; জোয়ার ভাটা প্রযুক্ত এই ব্যাসার্দ্ধ অনবরত বাড়িতেছে। চান্দ্রকক্ষার ব্যাসার্দ্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এ কথা বলিলেই বলা হইল যে, ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে কমিতেছিল। চন্দ্র অদ্য যতদূরে আছেন, কল্য কিয়ৎ পরিমাণে নিকটে ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই; যদিও দূরত্বের দৈনিক বার্ষিক অন্তর অকিঞ্চিৎ-কর, বুঝা যায় না বলিলেই হয়, তথাপি লক্ষ, দশলক্ষ অথবা কোটি বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের অনেকটা কাছে ছিলেন। এমনও সময় ছিল, যখন ২৪০০০০ মাইলের স্থলে ৪০০০০,২০০০০ বা ১০০০০ ছিল। মন্বন্তরাবধি যদি প্রকৃতির নিয়ম সকল সমভাবে চলিয়া থাকে। এবং কোন বাহ্য প্রতিবন্ধক না ঘটিয়া থাকে, তবে আরও কম ছিল বলিলে বা দোষ কি। পৃথিবীর অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক যে চন্দ্র ভ্রমণ করিতেন, তাহা সন্দেহ স্থল নহে! এ অবস্থায় চন্দ্রের আবর্ত্তন কাল গণিতের অনায়ত্ত নহে। এই অপূর্ব্বকালে চন্দ্র ৩ বা ৪ ঘণ্টার মধ্যে আবর্ত্তিত হইতেন।

২৮। চন্দ্রের জন্ম।—এখন যদি জিজ্ঞাসা কর, চাঁদ কেমন করিয়া পৃথিবীর এত নিকটে আসিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে যে ধরণী যখন স্খনম্য অবস্থায় ছিলেন, তখন তাহার দেহ হইতে চন্দ্রপিণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহা কেবল অনুমান মাত্র; প্রকৃত ঘটনা বলিয়া সহসা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচ্য। এরূপ অনুমানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব, তথাপি এ মতকে অযৌক্তিক বা অমূলক বলা যায় না। মতটি যে সন্দেহ-পরিশূন্য, তাহা বলা বাহুল্য, জ্যোতিষীদিগের মধ্যে এত সাহস-পূর্ব্বক এরূপ অদ্ভুত কল্পনা কেহ কখন করেন নাই।

সুদক্ষ গণিতজ্ঞ ডারবীন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ৩ ঘণ্টা মধ্যে পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন হইত এবং তৎকালে ঐ ৩ ঘণ্টার মধ্যে চন্দ্রের ভভ্রম সম্পন্ন হইত। এই সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে দ্রবময়ী ছিলেন এবং সূর্য্যাকর্ষণে প্রচণ্ড ভয়ানক উচ্ছ্বাসপ্রযুক্ত নিরক্ষপ্রদেশ হইতে একখণ্ড দ্রব পদার্থ বিমুক্ত হইয়া নভোমণ্ডলে সুধাংশুরূপে আবির্ভূত হইলেন। তবে চন্দ্রই কুজ হইলেন; মঙ্গল ভূমিসূত নহেন!

২৯। অস্থায়ী সাম্যভাব।—আদি অবস্থায় পৃথিবী ও চন্দ্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন প্রাচীন পৃথিবীর আবর্ত্তন কাল ২৪ ঘণ্টার স্থলে ৩।৪ ঘণ্টা ছিল; ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর আবর্ত্তন হইত, সেই ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রাচীন পৃথ্বীপরিত চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেন, সুতরাং তখন পৃথ্বীন্দু মুখামুখী করিয়া ঘুরিতেন। এরূপ ভ্রাম্যমাণ বর্ত্তুলদ্বয়ের অস্থায়ী সাম্যভাব কতক্ষণ থাকিতে পারে? সূচখাড়া হইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারে? সূচ এক দিকে না এক দিকে অবশ্য পড়িবেই। চন্দ্র এই অবস্থায় টলটলায়মান হইলেন, তিনি আর তিষ্টিতে পারিলেন না, তাঁহাকে এক দিকে না একদিকে পড়িতে হইল। উভয় শঙ্কটে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য বিচারপূর্ব্বক যাহা করিলেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্র

দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে, তিনি আর জননীগর্ভে পতিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি সেয়ানা ছেলের মত মায়ের কোল ছাড়িয়া মায়ের তফাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলিতে লাগিলেন।

৩০। চন্দ্রের ভগন কালের সহিত সাবন দিনের সম্বন্ধ।—চন্দ্র যত উত্তরোত্তর সরিতে লাগিলেন, ততই তাহার ভগন কালের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং ৩।৪ ঘণ্টা হইতে এক্ষণে ভগনকাল অর্থাৎ চান্দ্রমাস ৬৫৬ ঘণ্টা হইয়াছে এবং চন্দ্রের প্রস্থান অনুযায়ী পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তনের কাল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্র যেই একটু সরিয়া গেলেন, অমনই আর পৃথিবীকে তাঁহার দিকে অনবরত মুখ ফিরাইয়া রহিতে হইল না। চন্দ্র যখন অনেক দূর সরিয়া পড়িলেন, তখন তাহার ভগন কাল অপেক্ষা পৃথিবীর আবর্ত্তন কাল কম হইল। চন্দ্র যত পৃথিবী হইতে তফাৎ হইতে থাকেন, ততই তাঁহার ভগন কাল বাড়িতে থাকে; ক্রমে পৃথিবীর ৩।৪ বা ততোধিক আবর্ত্তন বা দিন চন্দ্রের বেগ কাল বা চান্দ্র মাসের সমান হয়।

এইরূপ চান্দ্রমাসে দিন সংখ্যার বৃদ্ধি হয় বলিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ বেশী হয় না, প্রত্যুত কমিতে থাকে। যেমন পৃথিবীর আহ্নিকগতি ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে, তেমনই চন্দ্রের ভভ্রমের বেগ কমিতেছে; কিন্তু যদিও পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তনের কাল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি চন্দ্রের ভগন কালের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থাৎ পৃথিবীর অনেকবার ঘুরা হইলে চন্দ্রের একবার ঘুরা হয়। এইরূপে যুগ, মহাযুগ যেমন অতিবাহিত হইতে থাকে, তেমনই চান্দ্রকক্ষা বিস্তৃত হইতে থাকে, পরিশেষে এমন কাল উপস্থিত হয় যে তখনই চন্দ্রের গতি পরম সীমা পায়। এ সময়ে চন্দ্রের ভগন কাল পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন-কালমানে অত্যধিক হয়; এখন চান্দ্র মাস ২৯ দিনে হয়। তখনকার মাস ও দিন এখনকার মাস ও দিনের সমান নহে। এই দ্বিবিধ কালের পরিমাণ বর্ত্তমান কালাপেক্ষা কম ছিল। ফলে এই—তখন পৃথিবী স্বীয় কক্ষে ২৯ বার ঘুরিলে চন্দ্রের একবার ভভ্রম হইত। এই কাল বা কালের অবধি অতিবাহিত হইয়াছে, ঐ কাল যে কখন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা এখন বৃথা, সে যে কতযুগ হইল, তাহা কে বলিতে পারে; কোটি বর্ষ বা দশকোটি বর্ষ এ কেবল অনুমান মাত্র।

এই কাল অতিবাহিত হইলেই, পৃথ্বীন্দুবিগ্রহ সেই অপূর্ব্ব আদিম অবস্থার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, সেই অন্তিম অবস্থার অনেক অংশে আদিম অবস্থার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে চান্দ্রকক্ষার ব্যাস অবিচলিতভাবে অথচ অল্পে বাড়িতে আরম্ভ করিল, সুতরাং মাসের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু এখন দিনমানের সহিত মাসমানের অনুপাত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, এই অনুপাত মহাযুগান্তে ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া কথিত কালে উনত্রিশ হইয়াছিল। এখন ঐ অনুপাত আবার কমিতে লাগিল, চন্দ্রের এক ভভ্রম ২৯ এর স্থলে পৃথিবীর ২৮ আবর্ত্তন হইল; অনুপাতক্রমে ১ : ২৭ হইল, এই সম্বন্ধ এক্ষণে হাজার

হাজার বৎসর পরেও চলিবে, চিরকাল কিন্তু এ ভাব থাকিবে না। অনন্তকালব্যাপী মহা পরিবর্ত্তনের এই এক অবস্থা মাত্র। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের মনে এ অবস্থা স্থায়ী বলিয়া বোধ হইতে পারে।

৩১। পৃথ্বীন্দুবিগ্রহের ভবিষ্যৎ গতি।—এই বিগ্রহের পূর্ব্বকথা বলার পর ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখা গেল; উত্তর কালে ইহার কি গতি হইবে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। যদি অস্মদাদির পরিচিত প্রকৃতির নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, যদি অস্মদাদির অপরিজ্ঞাত কোন বাহ্যব্যাঘাত না হয়, তবে সুদূর ভবিষ্যৎ কালে চন্দ্রের যে কি দশা ঘটিবে, তাহা স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। চন্দ্রকক্ষার বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ বৃদ্ধি চিরকালই হইবে; মাসমান ও দিনমান কমিতে থাকিবে, কিন্তু মাসের পরিমাণ, দিনের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে, ক্রমে ২৬ দিনে মাস হইবে। এইরূপে ১০ দিনে, অবশেষে একদিনে একমাস হইবে।

এক দিনে একমাস,—ইহার মানে এই যে পৃথিবীর একবার অক্ষাবর্ত্তন করিতে যত সময় লাগে, তত সময়ে চন্দ্রের একবার পৃথিবীকে ঘুরা হইবে, তখন অবশ্য দিনমান খুব বেসী হইবে। আমাদের এখনকার হিসাবে সে দিনের পরিমাণ কত, তাহা ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন। এই মহাদিনের মান এখনকার ন্যূনধিক ৫৭ দিন হইবে, অর্থাৎ এমন সময়ও আসিবে যখন পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন কাল ২৪ ঘণ্টার স্থলে ১৪০০ ঘণ্টা হইবে এবং চন্দ্র ঠিক সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিবেন। পৃথ্বীন্দুর এ অবস্থা ঘটিতে প্রায় ১৫ কোটি বৎসর লাগিবে।

অতএব পৃথ্বীন্দু বিগ্রহের আদিম অবস্থার সহিত উহার অন্তিম অবস্থার এই সাদৃশ্য দেখা যায় যে, উভয়ত্র দিনমান ও মাসমান সমান। প্রথম অবস্থার মাস ও দিন বর্ত্তমান মাস ও দিনের সামান্য অংশ মাত্র। শেষ অবস্থার মাস ও দিন এখনকার মাস ও দিনের বহু গুণ বড়। কিন্তু এই অবস্থাদ্বয়ে বিষম বিপর্য্যয়ও দৃষ্ট হয়, প্রথমে অস্থায়ী সাম্যভাব, অন্তে অনপায়ী সাম্যভাব।

৩২। চন্দ্রের কেবল একদিক্ দেখা যায় কেন?—যখন দিন ও মাস সমান হয়, তখন পৃথিবীর একদিক্ সতত চন্দ্রপানে ফিরিয়া থাকে অর্থাৎ এই অবস্থায় পৃথ্বীচন্দ্র যেন স্নেহরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করেন। যত কাল দিন ও মাসের মান সমান থাকিবে, ততকাল ভূগোল সেই একার্দ্ধ চন্দ্রের দিকে ফিরাইয়া ঘুরিবে।

এখন চাঁদ কেন আমাদিগের দিকে একার্দ্ধ ফিরাইয়া ঘুরেন, তাহা দেখিতে হইবে। যে সময়ের মধ্যে চন্দ্রের অক্ষাবর্ত্তন হয়, সেই সময়ের মধ্যে চন্দ্রের ভ্রমণ সম্পন্ন হয়, ইহার আধিভৌতিক কারণ জলোচ্ছ্বাস। চন্দ্রমণ্ডলের বন্ধুরতায় পূর্ব্বকালে তত্রত্য ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সকল জ্বালামুখ এখন নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কোন

সময়ে চন্দ্র অবশ্য অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অর্দ্ধতরলাবস্থায় ছিলেন। এই উত্তপ্ত ও সুখনম্য অবস্থায় পৃথিবীর আকর্ষণে চন্দ্রমণ্ডল অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকিবে। আমাদের সমুদ্রের যে জোয়ার হয়, চাঁদে জোয়ার তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, কারণ পৃথ্বী চন্দ্রাপেক্ষা বহু গুণে ভারি।

চন্দ্রের অক্ষাবর্ত্তন ও ভভ্রম সমকালে সম্পন্ন হয় বলিয়াই আমরা চন্দ্রের এক দিক্ মাত্র দেখিতে পাই। এই অবস্থা সম্পন্ন করিবার জন্য উচ্ছ্বাসের প্রভূত শক্তি আছে। চাঁদ যদি অপেক্ষাকৃত মন্দবেগে আবর্ত্তিত হইতেন, তবে অগ্নিগিরি হইতে বিরুত দ্রবপদার্থসমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধিকরবেগে ঘুরিতে হইত এবং যাবৎ না অক্ষাবর্ত্তন ও ভভ্রমের কাল সমান হইত, তাবৎ আর চন্দ্রের নিস্তার ছিল না। আবার চন্দ্রের কক্ষাভ্রমণ অপেক্ষা অক্ষাবর্ত্তন যদি অধিকতর বেগে হইত, তবে উচ্ছ্বাসের তেজের আর পরিসীমা থাকিত না, তখন চন্দ্রের আবর্ত্তন বেগ উচ্ছ্বাস কর্ত্তৃক মন্দীভূত হইয়া ভভ্রমের সহিত সমান হইয়া পড়িত।

৩৩। চন্দ্রের অপর দিকে কি আছে?—চন্দ্র কি কখন উচ্ছ্বাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না? এ কথার জবাব দেওয়া বড় সোজা নহে। সুধাকরের বাহ্যলক্ষণ দৃষ্টে বোধ হয় যে, সুদূর ভবিষ্যতে উচ্ছ্বাস শৃঙ্খল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কারণ চন্দ্র যখন তল্‌তলে ছিলেন, তখন তাহার উপর জোয়ারের যেরূপ অত্যাচার ছিল, এখন আর সেরূপ উপদ্রব নাই। চন্দ্রে সমুদ্রবৎ জলরাশি নাই এবং তথায় জ্বালামুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ ধাতুনিস্রবের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; অতএব চন্দ্রমণ্ডলের বহির্ভাগ উচ্ছ্বসিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভিতর টল্‌টলায়মান হইলেও হইতে পারে; ভিতর এখনও গরম, সুতরাং নরম আছে, বাহিরের মত নিরেট ঝামা হইয়া যায় নাই; তবে কি না এমন দিনও হইবে, যখন বাহির-ভিতর সত্য আকাশবৎ এই রকম ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। যখন সোমমণ্ডলের উপকরণীভূত পদার্থনিচয় কালবশে নিতান্ত কঠোরতা লাভ করিবে, তখন আর তথায় উচ্ছ্বাসের আধিপত্য থাকিবে না,—তখন আর অক্ষাবর্ত্তন ও কক্ষাবর্ত্তন কালের সমতা থাকিবে না। কক্ষাবর্ত্তনের কাল বাড়িতেছে এবং যতদিন জোয়ারের শাসন থাকিবে, ততদিন অক্ষাবর্ত্তন বাড়িবে। জোয়ারের আধিপত্য ঘুচিলেও আবর্ত্তন কাল এখনকার মত থাকিবার কোন বাধা হইবে না; কিন্তু কক্ষাবর্ত্তন কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; তখন জ্যোতির্বিদেরা, জ্যোতির্বিদেরা কেন যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনিও দেখিতে পাইবেন চন্দ্রের অপর দিকে কি আছে।

৩৪। নভোমণ্ডলে কি জোয়ার ভাটা হয়?—অর্কেন্দুর আকর্ষণবশতঃ পার্থিব সাগরের জল যেমন উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনই বায়ুসাগরের বায়ু উচ্ছ্বসিত হইবে তাহার সন্দেহ কি? রবি চন্দ্রের আকর্ষণ জলের উপর যেমন হয়, তেমনই বায়ুর উপর হইবে কি? কিন্তু বায়ুসাগরে যে জোয়ার হয়, তাহা আমরা টের পাইব কেমন করিয়া? আমরা বায়ুর

নীচে আছি, উপরে জোয়ার ভাটা হইতেছে জানিবার উপায় নাই। আমরা যদি সমুদ্রের তলে থাকিতাম, তবে জোয়ার হইল কি না দেখিতে পাইতাম না; কেবল জলের ভার দ্বারা কিঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পারিতাম। তেমনই নভোমণ্ডলে জোয়ার কত হয়, তাহা কেবল বায়ুমানযন্ত্র দ্বারা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়।

৩৫। অন্তর্ভৌম জোয়ার।—চন্দ্রাকর্ষণে কেবল যে সামুদ্রিক ও নাভস জোয়ার হয় তাহা নহে। অন্তর্ভৌম জোয়ারও ঘটে। বিশ্বম্ভরার আভ্যন্তরিক উত্তাপ দৃষ্টে বোধ হয় যে যদিও তাঁহার গর্ভ সম্পূর্ণ তরল নহে, তথাপি আমাদের অধোভাগে কিয়দ্দূরে যে দ্রবস্তর আছে, তাহার সন্দেহ নাই, চন্দ্রাকর্ষণে তাহা বিলোড়িত হইতে পারে। এ মতের সারবত্তার পরীক্ষায় ব্যাপৃত জনৈক সুপণ্ডিত দেখিয়াছেন যে তিথি অনুসারে ভূমিকম্প শ্রেণীবদ্ধ করিলে অধিকাংশ ভূমিকম্প পক্ষান্তে এবং যে যে, দিন চন্দ্র নীচস্থ হন সেই সেই দিনে ঘটে।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অক্ষাবর্ত্তন	Rotation
অগ্ন্যুৎপাত	Volcanic erruption
অনধীন	Free
অনপায়ী সাম্যভাব	Stable equilibrium
অনুক্রকচ	Indented
অনুপার্থিব	Perigee
অপ-পার্থিব	Apogee
অন্তর্লগ্ন	Inscribed
অস্থায়ী সাম্যভাব	Unstable equilibrium
আকুঞ্চক	Contracting
আদেশ	Prediction
অন্তর্ভূমিক বা অন্তর্ভৌম	Inter-terrestrial
উচ্ছ্রায়	Height
উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ	Tidal wave
খস্বস্তিক	Zenith
গাধতা	Shallowness

উৎপত্তি	Origin
জ্বালামুখ	Volcano
তরঙ্গিত হয়	Oscillate
ফেঁত	Priming
প্রতীপ	Opposite
পৃথ্বীন্দু দ্বিজ্যোতিষিক বিগ্রহ	Earth and Moon System
পুরা কোটাল	Spring tide
বন্দরের সংস্থিতি	Establishment of the port
বান ডাক	Bone
ভগন কাল	Period of revolution
ভূগর্ভ	Centre of Earth
ভূপৃষ্ঠ	Surface of Earth
মরা কোটাল	Niptide
রেখোত্তরণ	Meridian passage
বন্ধুরতা	Unevenness
বিভেদক	Seperating
বিক্ষেপ	Latitude
বেলা	Coast
ব্যাপার	Phenomenon
শ্লিষ্টাংশ	Resolved part
ষাঁড়াষাঁড়ীর কোটাল	Bore, mascaret
সমসান্দ্র	of equal density
সমসাময়িক উচ্ছাস রেখা	Contidal line
সমাকৃষ্ট	Forced
সামগ্রী	Mass
সমুপাগতি	Approach
সুখনম্য	Pliable

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"এখন দক্ষিণ রায়, সব ভাটী অধিকার,
হিজলীতে কালুরায় থানা।
সর্ব্বত্রে সাহেব পীর, সবে নোয়াইবে শির,
কেহ তাহে না করিবে মানা॥
এত বলি অন্তর্ধান, হইলেন ভগবান,
কাহার শকতি মায়া বুঝে।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাণী, নরে ঘরে ঘরে জানি,
তদবধি এইরূপ পূজে॥"

ইহার মধ্যে মোট ইতিহাস এইটুকু বুঝা যায়, বড় খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায় উভয়ে বিপরীত দিক্ হইতে সুন্দরবন কাটিয়া আবাদ করিয়া ঢুকিতে ছিলেন। প্রথমে উভয়ে উভয়ের অধিকার কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলে দক্ষিণরায়ের নিকট বড়খাঁ গাজী পরাস্ত হইয়া বন্ধুতা স্থাপন করেন। কিছু দিন পরে গাজী অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। গাজী তখন খনিয়াতে থাকিতেন এবং রায় খাঁড়ীতে থাকিতেন। খনিয়ার লোকে রায়ের নিকট গাজীর অত্যাচার কথা জানাইলে রায় তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। হিজলীর অধিপতি কালুরায় মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে আসেন, কিন্তু বোধ হয় যুদ্ধে গাজীর মৃত্যু হয়। "সর্ব্বত্র সাহেব পীর, সবে নোয়াইবে শির"—ইহা হইতে গাজীর অধিকৃত ভূভাগের নির্দ্দিষ্ট সীমা জানা যায় না।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য দেবতার কথা এই পর্য্যন্ত; কিন্তু তাহার পর গ্রন্থের নায়ক পুষ্পদত্ত ছত্র-ভোগে পঁহুছিয়া ত্রিপুরাভবানীর পূজা করিয়া মগরা অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাসাগরে উপনীত হইলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ সগরবংশ ধ্বংস ও গঙ্গার উৎপত্তি কথার বর্ণনা আছে, তৎপরে উড়িষ্যার কূলে আসিলে প্রসঙ্গতঃ জগন্নাথের কথাও হইল। তৎপরে রামেশ্বরে পঁহু-ছিয়া প্রসঙ্গতঃ রামায়ণও হইল। তাহার পর কবিকঙ্কণের গল্প ঠিক অনুসৃত হইয়াছে।

সাধুর গমন-পথের স্থানগুলা এখানে বলা ভাল।

"ভক্তিভাবে প্রণমিয়া দক্ষিণের রায়।
তরণী লইয়া তবে সদাগর যায়॥
ছত্রভোগে পূজা কৈল ত্রিপুরা ভবানী।

মগরা বাহিয়া চলে সাধুর সন্তান।

* *

গঙ্গাসাগরেতে গিয়া দিল দরশন।

* *

মল্ল তোরণের রাজ্য বাহিল কৌতুকে।
মার্কণ্ড রাজার দেশ বাহিল তরণী॥
বাবুর মোকাম বহিয়া চলে তার পর।

* *

উড়িষ্যার নিকটে দিলেন দরশন।

* *

গিয়া সেতুবন্ধ পাছে, ভকতি করিয়া পূজ
দয়ার অবধি রামেশ্বর।

* *

শ্রীআদ্যা দহের নিকটে দিলেন দরশন।

* *

তবেত কাঁকড়াদহে উত্তরিল গিয়া।

* *

তবে সবে জোঁকদহ মাঝে উত্তরিল।

* *

ছোটতাল বড়তাল করিয়া পশ্চাত।

* *

কালিদহ বাহিয়া সিংহল করি বাম।
রাজদহে উত্তরিল ভণে কৃষ্ণরাম॥

* *

অনেক দিনের পর ডিঙ্গা লইয়া সদাগর
সমুদ্র তরিয়া পাইল কূল।"

কবি উড়িয়াদিগের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন,—

"সুখে করে বিকি কিনি, পুরুষ মদন জানি,
পদ্মিনী সমান যত নারী॥"

কবি তুরঙ্গ-সহরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে তখনকার কালে মুসলমানের অধীন বর্দ্ধিষ্ণু সহরের অবস্থা বুঝা যায়;—

"চৌহরা বাজার দেখে অনেক দোকান।
পুরুষ রমণী কাম রতির সমান॥
যোগসিদ্ধ যোগীগণ আছে যোগাসনে।
বিভূতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে॥

অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে॥
সোণার কলম কাণে দোয়াতি সম্মুখে।
কিতাবত নিপুণ কায়স্থগণ লেখে॥
তার পর বৃহন্দে আছেন নরনাথ।"　ইত্যাদি

ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান বর্ণনায় নগরটীকে কয়েকটী বৃহন্দে ভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাপেক্ষা প্রাচীন কবি কৃষ্ণরামের গ্রন্থেও বৃহন্দ নামে নগরের বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান পুঁথিখানি যে পর্য্যন্ত আছে, তাহাতে পুষ্পদন্তের গল্পও শেষ হয় নাই। দক্ষিণ-রায়ের কথিত হিজলীর কালুরায়ের বিশেষ কিছু ও নরসিংহের কথা কিছুই জানা গেল না।

রায়মঙ্গল সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। রায়মঙ্গলে কবির কবিত্ব বিশেষ কিছু নাই। খুঁজিলে সুন্দর কবিত্বপূর্ণ গুটী কুড়িক কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিস্তর অপ্রচলিত শব্দ আছে; তাহার সকলগুলির অর্থ জানা যায় না।

(১) তরকচ—তূণ।

"তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।"
"দুই তরকচ বাঁধা পরিপূর্ণ বাণে॥"

(২) খড়িবজ্র—গণক, দৈবজ্ঞ।

"শুনিয়া সাধুর বাণি　　বড় উতরোল শুনি
খড়িবজ্র আনে ডাক দিয়া।
গণিয়া কহিল সার　　দমুজের গুরুবার
শুভ হস্তা নক্ষত্র তৃতীয়া॥"

(৩) ওলাইল—নামাইল, ভাসাইল।

"শুভক্ষণে সাত ডিঙ্গা ওলাইল জলে।"

(৪) ভাতিওলে—(?)

"গুরুভার নোঙ্গর কতেক ভাতিওলে॥"

(৫) জুঝার—লড়াইয়ে, যুদ্ধব্রিৎ।

"হরিণ লইল খাসি গারোড় জুঝার।

(৬) টঙ্গভাঙ্গা—ঠ্যাংভাঙ্গা, যে পা ভাঙ্গিয়া দেয়। টাঙ্গ হিন্দি শব্দ, অর্থ পদ।

"প্রলয় যমের বাড়া টঙ্গভাঙ্গি দিই নাড়া
ঠায় পড়ে খাইয়া আছাড়।"

(৭) গাট্যার—নৌকার।

"সদাগর কুতুহলে কর্ণধার সঙ্গে চলে
দেখিবারে প্রভু জগন্নাথ।
গাট্যার গাবর যত সবে অতি হরষিত
পুরিবে মনের সাধ॥"

(৮) গাবর—দাঁড়ি মাঝি।

"জিনিয়া তালের গাছ জোঁকের শরীর।
রাখিল সাধুর ডিঙ্গা গাবর অস্থির॥"

ভারতচন্দ্রের স্তায় কৃষ্ণরামের কাব্যের দু-একটী বিবরণ বাঙ্গালায় প্রবাদ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়,—

(৩) "কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল।
গাঁয়ে নাহি মানে যেন আপনি মণ্ডল॥
(৪) "নীচ লোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।
লছমী ছাড়িলে শেষে দুঃখ নানা জাতি॥"

তবে বলা যায় না এগুলি বাঙ্গালায় চিরন্তন প্রবাদ কি না? কৃষ্ণরাম একটী নূতন উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। চন্দ্রের সহিত মনুষ্য মুখের তুলনা করাই কবি প্রসিদ্ধি কিন্তু কৃষ্ণরাম বলেন,—

"ইন্দ্রনিন্দি বদন মদন জিনিরূপ।"

এই কাব্যের প্রধান সংযোগ স্থল কবি কৃষ্ণরামের আঠারভাটী ও খনিয়া কোথায়, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই, কিন্তু "রায়মঙ্গলের" জন্মস্থান খাসপুর পরগণা ও বড়িষ্যা গ্রাম এখনও ঐ নামেই আমাদের নিকট পরিচিত। তাঁহার কাব্যের নায়ক পুষ্পদত্তের নৌপথের স্থান গুলিও বর্ত্তমান আছে। তবে বড়দহ কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। কৃষ্ণরামের "মেদন মল" বর্ত্তমান ময়দানমল। তৎপরে পুষ্পদত্ত এখনকার দক্ষিণ-বারাসতে উপস্থিত হন।

কৃষ্ণরামের সময় বড়িষ্যা বেহালা অঞ্চলেও বাঘের উপদ্রব ছিল। গাজীর ব্যাঘ্রসেনা সংগ্রহের বর্ণনার সময় তিনি লিখিয়াছেন;

"বড় খাঁ গাজী, ভড়কে সাজি,
আইল অনেক বাঘ।

সমনে অবতার, গমনে অনিবার,
পবনে না পায় লাগ॥
বালাণ্ডা বালিয়া, যে ছিল চলিয়া,
আইল পাইঘাটী আর।
মেদনমলে, বাঘেরা সকলে,
সাজিয়া চলিল আগে।
বরিদহাটী ময়দা, তাহাতে জেয়দা,
ডাকিতে বড় ভয় লাগে॥
বেহালা মাগুরা বলবান বাঘেরা,
গিয়াছে রায়ের কাছে।
গাজীর অম্লে, অম্লে অম্লে,
আইসে যে যে আছে॥

এই কবিতার লিখিত বালাণ্ডা, বালিয়া, পাইঘাটী, মেদনমল, ময়দা, বরিদহাটী, মাগুরা প্রভৃতি স্থানগুলি সুন্দরবনের উপকণ্ঠস্থ গ্রামের নাম। ঐ গুলি এখনও ঐ নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত। বেহালা মাগুরা পরগণার অন্তর্গত বড়িশার নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

কবি বাঙ্গালা শব্দে ফারসীর বহুবচন যোগ করিয়া গিয়াছেন,—"নলনান বাঘরান।" (বাঙ্গালায় বাঘান হওয়া উচিত, কিন্তু চাকরাণ জমাদারান প্রভৃতি শব্দের সাহায্য দোষে এরূপ হইয়াছে বোধ হয়।) এতদ্ভিন্ন, কসুর, গোলাম, জওয়াব প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

কবি কৃষ্ণরাম যে কেবল পীর গাজীর মুখেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা উর্দ্দু কবিতা ব্যবহার করাইয়াছেন তাহা নহে; তুরঙ্গ-সহরের ঘাটোয়াল ও কোটালের মুখেও ঐ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আমরা বলিতে পারি যে বিভিন্নভাষা ব্যবহারে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় এ বিশ্বাসও কবির ছিল এবং কবিও নিজে সংস্কৃত ও ফারসী জানিতেন তাহা প্রমাণিত হয়। সংস্কৃত জ্ঞানের প্রমাণ স্বরূপ ইহাতে কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। যেমন অনডুহ। পুঁথি খানিতে একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। লিপিকারেরা "ফ" বর্ণটীর উপর কিছু বীতরাগ। ইহাতে যেখানে "ফেলা" ক্রীয়ার কোন পদ (ফেলিল, ফেলে, ফেলাইল লিখিত হইয়াছে, সেই খানেই "ফ" র পরিবর্ত্তে "প" লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "ফণি" "ফণা" প্রভৃতি শব্দ লিখিতে "ফ" ই ব্যবহৃত হইয়াছে, 'প' নহে!

রায়মঙ্গল সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রচলিত আর একটী মাত্র কথা বলিয়া অদ্য প্রবন্ধ উপসংহার করিব। কবি কৃষ্ণরামের "কালিকামঙ্গল" নামে আর একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। সে কাব্যের গল্পাংশই বিদ্যাসুন্দরের গল্প। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য-পত্রিকায় কবিকৃষ্ণরাম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া

যে কৃষ্ণরামই আদি বিদ্যাসুন্দর লেখক। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী নামক ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবিও কালিকামঙ্গল নামে বিদ্যাসুন্দর লিখিবার সময় নিজ গ্রন্থে একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥"

এতদ্দ্বারাও আমরা জানিতে পারিতেছি যে কৃষ্ণরামই যখন প্রথম বিদ্যাসুন্দরের লেখক, তখন তিনি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দেখিয়াই বোধ হয় কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন, অতএব তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান থাকাও অসম্ভব নহে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদের মতে, কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল লিখিবার পরে কালিকামঙ্গল লেখেন। তাঁহার নিকট ১১৫৯ সালের (১৭৫২ খৃষ্টাব্দের) কালিকামঙ্গলের পুঁথি আছে। উহার ভূমিকা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণরাম শেষ দশায় চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত কালিকামঙ্গলের সূচনা ভাগ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

বঙ্গীয় সাময়িক পত্র।

—০:০—

আজ কাল অনেকেই এদেশের ইতিহাস নাই বলিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে কাহাকেও তাদৃশ যত্নশীল দেখা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় কয়খানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই তাহার সবিশেষ সংবাদ অবগত নহেন। ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন বাগাড়ম্বরে জগতের কোন উপকার সংসাধিত হয় না। ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে শিথিল প্রযত্ন হইলে চলিবে কেন? যত্ন সহকারে উপাদান সংগ্রহ করিলে ভাবী ইতিবৃত্ত লেখকের পথ সুগম হইতে পারে, এই আশায় অদ্য আমরা নিম্নে সম্পাদকগণের নাম সহ এতদ্দেশ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্র-সমূহের এক বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিলাম। এই তালিকায় অনেক ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইবে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে এই প্রথম উদ্যম বলিয়া ভরসা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ সঙ্কলয়িতার ত্রুটী মার্জ্জনাপূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উপকার বিধান করিবেন।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
	হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।
অদৃষ্ট	রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
অনাথিনী	থাকমণি দেবী।
অনুসন্ধান	দুর্গাদাস লাহিড়ি।
অনুশীলন	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
অবকাশতোষিনী	অপ্রকাশিত।
অবলাবান্ধব	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
আচার্য্য	অপ্রকাশিত।
আদর্শ	মদনমোহন মিত্র।
আদরিণী	অপ্রকাশিত।
আভা	
আলোচনা	"
আর্য্যদর্শন *	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
আর্য্যপ্রতিষ্ঠা	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ
আর্য্যপ্রতিভা	কালীবর বেদান্তবাগীশ।
আর্য্যপ্রদীপ	অপ্রকাশিত।
আর্য্যপ্রভা	"
আর্য্যপ্রবর	জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়।
আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ	রামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।
আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী	অপ্রকাশিত।

—০—

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
উপহার	অপ্রকাশিত।
একাকিনী	যশোদানন্দন সরকার।

—০—

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
কর্ণধার	হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
কল্প	অপ্রকাশিত
কল্পনা	অপ্রকাশিত।
কল্পলতা ও প্রকৃতি	"
কল্পদ্রুম	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
কাঁচরাপাড়া-প্রকাশিকা	রাজেন্দ্রকুমার রায়।
কারিকরদর্পণ	"
কায়স্থকারিকা	অনুপচাঁদ মিত্র।
কায়স্থকিরণ	রাজনারায়ণ মিত্র।
কবিতা-কুসুমাঞ্জলি	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।[১]
কুমুদিনী	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কুসুম	অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র।
কুসুমমালা	অপ্রকাশিত।
কৃষিগেজেট	গিরিশচন্দ্র বসু।
কৃষি-তত্ত্ব	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
কৌমুদী	রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।

—০—

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
খ্রীষ্টমহিলা	কামিনী শীল।
খ্রীষ্টিয় বান্ধব	অপ্রকাশিত।
গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	হরিনাথ মজুমদার
গস্পেল ম্যাগাজিন	অপ্রকাশিত।[২]
গান ও গল্প	মতিলাল বসু।[৩]
গোপালভাঁড়	অপ্রকাশিত।

—০—

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
চস্‌মা	জীবনকৃষ্ণ সেন।
চিকিৎসাতত্ত্ব	অপ্রকাশিত
চিকিৎসাদর্শন	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
চিকিৎসাসম্মিলনী	অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।

---

* এই পত্র সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা বাঙ্গালার এক খানি। পরে মাসিক পত্র।

১ এই পত্রিকা ১২৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাই ঢাকা নগরের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পত্রিকা ...য়িক পত্র।

২ ইহা ১৮১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

৩ ইহা ১২৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
চিকিৎসাজ্বরবিজ্ঞান	আশুতোষ সেন।	দর্শক	অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী।
চিকিৎসক ও সমালোচক	সত্যকৃষ্ণ রায়।	দারোগার দপ্তর	প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
চিত্রকর	কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	দাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
চিত্রদর্শন	অপ্রকাশিত।	দিবাকর	রাজেন্দ্রলাল সিংহ।
		দিগ্দর্শন	মার্সম্যান সাহেব।[৮]
ছাত্র-বৃত্তি	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।	দীপিকা	অপ্রকাশিত।
	——	দ্রব্যগুণতত্ত্ব	"
	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু[৪]।	ধর্ম্মতত্ত্ব	কেশবচন্দ্র সেন।
জমিদারী পঞ্চায়ত	অপ্রকাশিত।	ধর্ম্মপ্রচারক	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।
জাহ্নবী	বীরেশ্বর পাঁড়ে।	ধর্ম্ম বন্ধু	অপ্রকাশিত।
জ্যোতিঃ	অধরচন্দ্র বসু।	ধরণী	
জ্যোতিরিঙ্গণ	হারাণচন্দ্র রায়।		—
জ্ঞানাঙ্কুর	শ্রীকৃষ্ণদাস[৫]।	নবজীবন	অক্ষয়চন্দ্র সরকার[৯]।
জ্ঞানারুণোদয়	অপ্রকাশিত।	নবপ্রবন্ধ	তিনকড়ি ঘোষাল।
জ্ঞানপ্রভা		নববিধান	অপ্রকাশিত।
		নব্যভারত	দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা	অক্ষয়কুমার দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬]।	নলিনী	নরেন্দ্রনাথ বসু।
		নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	নন্দকুমার কবিরত্ন।
তত্ত্বকৌমুদী	শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমাপদ রায়।		—•—
		পঞ্চানন্দ	ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
তত্ত্ব-মঞ্জরী	কালিদাস নাথ।	পরিচারিকা	অপ্রকাশিত।
তপস্বিনী	অপ্রকাশিত।	পাকপ্রণালী	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।
তমোলুকপত্রিকা	ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত[৭]	পাক্ষিক সমালোচক	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়[১০]
তৃপ্তি	অপ্রকাশিত।	পুরোহিত	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

৪ ১২৯৭ সালের পৌষ মাসে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫ ১২৭৯ সনে রাজসাহী হইতে এই প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়।

৬ ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এই সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার জন্ম হয়।

৭ ১২৮০ সালে এই পত্রিকা তমোলুক হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮ এই পত্র ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র।

৯ এই প্রসিদ্ধ পত্র ১২৯১ সনের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

১০ ১২৯০ সনের ফাল্গুন মাসে এই পত্র দারভাঙ্গা সহর হইতে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
পূর্ণশশী	বিনোদবিহারী গোস্বামী।
পল্লীপরিদর্শন	অপ্রকাশিত।
পূর্ণিমা	"
প্রকৃতি	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রচার	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রবাহ	দামোদর মুখোপাধ্যা
প্রমোদি	অপ্রকাশিত।
প্রকৃতির	"
প্রতিমা	বামদেব দত্ত।
প্রভা	অধরচন্দ্র মিদ্যা।
প্রতিধ্বনি	রাধাগোবিন্দ প্রামাণিক।
প্রতিবিম্ব	অপ্রকাশিত।
প্রমোদী	ললিতমোহন রায়।
প্রজাপ.	অপ্রকাশিত।
প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ	সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার
প্রিয়দর্শন	অন্নদাপ্রসাদ পাল।

—০—

ফলিতজ্যোতিষ	রসিকমোহন চট্টোপাধ্যা

—০—

বঙ্গদর্শন	বঙ্কিম চন্দ্রচট্টোপাধ্যায়[১১]
বঙ্গমহিলা	ভুবনমোহন সরকার।
বঙ্গমিহি	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বসন্তক	অপ্রকাশিত।
বান্ধব	কালীপ্রসন্ন ঘোষ।[১২]
বাঙ্গালি	শ্রীনাথ চন্দ্র।
বাসনা	অপ্রকাশিত।
বামবোধিনীপত্রিকা	উমেশচন্দ্র দত্ত।[১৩]
বালক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিবিধার্থসংগ্রহ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[১৪]
বিশ্বকোষ	নগেন্দ্রনাথ বসু।[১৫]
বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা	শিশিরকুমার ঘোষ।
বিশ্বজীবন	মহেন্দ্রনাথ হালদার।
বিজ্ঞান...দী	জগমোহন তর্কালঙ্কার।
বিদ্যাদর্শ	অক্ষয়কুমার দত্ত।[১৬]
বিজ্ঞানদ	বীরেশ্বর পাড়ে।
[illegible]	ভুবনমোহিনীদেবী বা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বিশ্বদ	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বিভা	চারুচন্দ্র ঘোষ।
বিদ্যাকল্পদ্রুম	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো
বিক্রমপুরপ্রকাশ	মহিমচন্দ্র চক্র
বীণা	রাজকৃষ্ণ রায়।
বীণাপাণি	অপ্রকাশিত।
বেদব্যাস	ভূধর চট্টোপাধ্যায়।
বেঙ্গলগেজে	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।[১৭]
বৈষয়িক ত	শশীশেখরেশ্বর রায়।

১১ সন ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে এই সুবিখ্যাত পত্রের প্রকাশারম্ভ হয়।

১২ এই প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র ১২৮১ সালের আষাঢ় মাস হইতে ঢাকা নগরে প্রকাশিত হয়।

১৩ ১২৭০ সালের ভাদ্র মাস হইতে স্ত্রী জাতির কল্যানকামনায় ইহা প্রকাশিত হয়।

১৪ এই প্রসিদ্ধ সচিত্র পত্র ১৮৫১ খৃঃ অব্দের কার্ত্তিক মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে ইহাই হস্তান্তরিত হইয়া রহস্যসন্দর্ভ নামে অভিহিত হয়।

১৫ এই মহাভিধান ১২৯৩ সাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

১৬ ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এই পত্রের প্রথম প্রকাশ হয়।

১৭ ১৮১৬ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রচারিত হয়। অনেকের মতে ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন	রামমোহন রায়।[18]
ব্যবসায়ী	শ্রীনাথ দত্ত।
ভারত	অপ্রকাশিত।
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবী।
ভারতশ্রমজীবী	শশিভূষণ বিশ্বাস।
ভারতবর্ষীয় আর্য্যপত্রিকা	গোপাললাল বসু।
ভারত-ভিখারিণী	অপ্রকাশিত।
ভারতসুহৃদ্	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।
ভারতকোষ	রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব।
ভিষক্	যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
ভিষক্ দর্পণ	অপ্রকাশিত।
ভ্রমর	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[19]

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
মধ্যস্থ	মনোমোহন বসু।
মজলিস	দুর্গাদাস দে।
মহাপাপ বাল্যবিবাহ	নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
মধুকর	উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।
মহাবিদ্যা	কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।
মালঞ্চ	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।[20]
মাসিকপত্রিকা	প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার।[21]
মাসিক প্রকাশিকা	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
মাসিক প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
মাসিক উপন্যাস	দামোদর মুখোপাধ্যায়।
মাসিক সমালোচক	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
মিত্রপ্রকাশ	হরিশচন্দ্র মিত্র।
মিত্রোদয়	হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়।
মুকুল	শিবনাথ শাস্ত্রী।
মুক্তাবলী	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
রহস্যসন্দর্ভ	প্রাণনাথ দত্ত।
রসসাগর	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়।
রত্নাকর	অপ্রকাশিত।
রসিকরাজ	„
রামধনু	সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ।
রাজচিকিৎসক	অপ্রকাশিত।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
লক্ষ্মী ও সরস্বতী	অপ্রকাশিত।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
শিক্ষাদর্পণ	ভূদেবমুখোপাধ্যায়।
শুভকরী	মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত।
শুভাকাঙ্ক্ষী	বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীমন্ত সওদাগর	চন্দ্রকিশোর রায়।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সখা	প্রমদাচরণ সেন।
সৎসঙ্গ।	অপ্রকাশিত।
সর্ব্বার্থসংগ্রহ	অতুলনাথ তর্কবাগীশ ও কালীবর বেদান্তবাগীশ।

১৮ ১৮২১ খৃঃ ইহা প্রকাশিত হয়।
১৯ এই পত্র ১৮২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।
২০ ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ হইতে এই পত্র প্রকাশিত হয়।
২১ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ইহা বঙ্গসাহিত্য জগতে অবতীর্ণ হয়।
২২ ১২৯২ সনে এই পত্র প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম।
সর্ব্বশুভকরী	মদনমোহন তর্কালঙ্কার।[২৩]
সহোদর	অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সদানন্দ	হরিহর নন্দী।
সনাতনী	অপ্রকাশিত।
সরোজিনী	বিহারীলাল গোস্বামী।
সমীরণ	দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহচরী	বীরেশ্বর পাঁড়ে।
সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র	অদ্বৈতচরণ আঢ্য।
সজ্জনতোষিণী	কেদারনাথ তত্ত্বনিধি।
সমাজ ও সাহিত্য	গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।
সমালোচনী	কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।
সত্যার্ণব	অপ্রকাশিত।
সমদর্শী	শিবনাথ শাস্ত্রী[২৪]।
সমাজদীপিকা	অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
সাথী	ভুবনমোহন রায়।[২৫]
সাহিত্য	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা	রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ বসু।[২৬]
সাধনা	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সারস্বত প্রসূনাঞ্জলি	অঘোরনাথ ঘোষ।
সাহিত্যভাণ্ডার	অপ্রকাশিত।
সাহিত্যকল্পদ্রুম	ব্যোমকেশ মুস্তফী।
সাহিত্যকুসুম	অপ্রকাশিত।
সাহিত্যসেবক	অপ্রকাশিত।
সুহৃদ্	অপ্রকাশিত।
সুবোধিনী	ভোলানাথ মিত্র।
সুলভপত্রিকা	দ্বারকানাথ রায়।
সুকথা	অপ্রকাশিত।
সেবক	অপ্রকাশিত।
হরবোলা ভাঁড়	অপ্রকাশিত।
হানিমান	"
হিন্দুপত্রিকা	যদুনাথ মজুমদার।
হিন্দুবিলাস	প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হিন্দুদর্পণ	ষোড়শীচরণ মিত্র।
হিন্দুদর্শন	অপ্রকাশিত।
হিন্দুসুহৃদ্	"
হিতবোধ	অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
হিতৈষিণী	চারুচন্দ্র রায়।
হুতুম	অপ্রকাশিত
হোমিওপাথীচিকিৎসক	জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী
হোমিওপ্যাথি-প্রচারক	পূর্ণচন্দ্র সেন।
হেমলতা	মহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

---

২৩ ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এই প্রকাশারম্ভ হয়।

২৪ ১২৮১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে এই পত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

২৫ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার জন্ম।

২৬ ১৩০২ সনের শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

মহারাষ্ট্র ভাষা।

এই ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রাচীন এবং আধুনিক। প্রাচীন ভাষাটী দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম লিপি হইতে এই ভাষার কতকটা দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। শালিবাহন রাজার "গাথাসপ্তশতী" প্রথম শকাব্দে, এই প্রাচীন ভাষাতে লিখিত। ইহা সংস্কৃত মূলক এবং ইহাই প্রাকৃত ভাষা। এই ভাষার দৃষ্টান্ত কালিদাসাদি কবি-বিরচিত নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

দৌলতাবাদের যাদববংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে, আধুনিক ভাষার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১১১৩ হইতে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাদব বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জৈত্র পাল এবং রামদেব সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। জৈত্র পালের রাজত্বকালে ১২০০ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রের প্রথম কবি মুকুন্দরাজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি তিন খানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যগুলির নাম—বিবেকসিন্ধু, পরমামৃত এবং মূলস্তম্ভ। প্রথম দুখানি তত্ত্ববিষয়ক। তৃতীয় খানি, মহাদেবের গুণকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। ইহার পর, নামদেব এবং জ্ঞানদেব প্রাদুর্ভূত হন। নামদেব ১২৭০ এবং জ্ঞানদেব ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নামদেব অভঙ্গ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা রামদেব রাজার রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা, যাহা জ্ঞানেশ্বরী নামে বিখ্যাত, জ্ঞানদেবেরপ্রধান গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন তিনি অমৃতানুভব (বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ), পবনবিজয়, যোগবাশিষ্ঠের টীকা, পঞ্চীকরণ, হরিপাঠ, শ্রীবিঠ্ঠল বর্ণন এবং আলন্দী-মাহাত্ম্য রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের ভ্রাতা নিবৃত্তি এবং সোপান এবং তাঁহার ভগ্নী মুক্তাবাইও কবিতা লিখিতে পারিতেন।

জ্ঞানদেবের পর, বহুকাল কোন কবির প্রাদুর্ভাব হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মুসলমানগণ দক্ষিণাপথ আক্রমন করে এবং দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। রাজার উৎসাহ অভাবে, ভাষার অনুশীলন হইতে পারে নাই, এবং এই জন্য কোন কবির আবির্ভাব হয় নাই। ১৬শ শতাব্দীতে, মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিলে, কবিগণ দেখা দিতে লাগিলেন।

প্রথমে একনাথ মহারাজ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইনি ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মূল সংস্কৃত হইতে মহারাষ্ট্র ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা একনাথী ভাগবত বলিয়া বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন, একনাথ রুক্মিণীস্বয়ম্বর, ভাবার্থরামায়ণ, আত্মসুখ, হস্তা-মলক এবং আনন্দলহরী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কাব্যগ্রন্থ রচনা ব্যতীত ইনি ধর্ম্ম-প্রচার এবং সমাজ সংস্কার কার্য্য ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে একনাথ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

একনাথের পর, দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম তুকারাম এবং রামদাস। তুকারাম ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনুমান ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। ইনি মহারাষ্ট্র কবিদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইঁহার রচিত অভঙ্গগুলি ভুবন বিখ্যাত। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় ইহার কএকটী অনুবাদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কবি রামপ্রসাদের পদগুলি যে ভাবে রচিত, তুকারামের অভঙ্গগুলিও সেই ধরণের। রামপ্রসাদ যেমন তাঁহার জননী কালীর কাছে নানা প্রকার আবদার করিতেন ও তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন, তুকারামও তাঁহার অভীষ্ট দেবতা বিঠোবার নিকট, সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। রামদাস ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর গুরু ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ "দাসবোধ"। এতদ্ভিন্ন, ইনি মনকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি নানা প্রকার সদুপদেশে পরিপূর্ণ। তৎসম্বন্ধে, কোন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে, খ্যাতনামা সলমন রাজার (King Solomon) প্রভার্ব (Proverbs) নামক উপদেশগুলির সহিত কোন কোন অংশে ইহার তুলনা হইতে পারে।

রামদাসের পর, শ্রীধর কবি উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। ইনি রামবিজয়, হরিবিজয়, পাণ্ডবপ্রতাপ, এবং শিবলীলামৃত নামক কএকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া তিনি আপামর সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই কএকখানি গ্রন্থের মধ্যে রামবিজয় অতি উপাদেয়। ইহার একস্থলে গ্রন্থকার পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'এই গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্রভাষায় লিখিত বলিয়া যেন উপেক্ষিত না হয়। যথার্থ বটে যে, মূল সংস্কৃত পড়িলে বিশেষ আনন্দলাভ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোক এবং অপরাপর যাহারা সংস্কৃত অবগত নহে, তাহাদের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য মহারাষ্ট্রভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক। সংস্কৃত ধনীর পরিচ্ছদের স্বরূপ। কিন্তু, দীন ব্যক্তিগণ কম্বল ব্যবহার করে। মহারাষ্ট্রভাষা কম্বলের স্বরূপ, তাহা দীন ব্যক্তিগণের জন্য।' শ্রীধরের গ্রন্থ কএকখানি সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃহে পাঠ করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তাহা মহা আনন্দে শ্রবণ করেন।

মুক্তেশ্বর এবং বামন শ্রীধরের সমসাময়িক ছিলেন। ইহারা মহাভারত, রামায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কবিদ্বয়ের পর, মোরোপন্থ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর স্বর্গলাভ হয়। মোরোপন্থের প্রধান কাব্য কেকাবলী ইহা একখানি মৌলিক গ্রন্থ। কিন্তু, ইহার রচনা তুকারাম কিম্বা শ্রীধরের ন্যায় প্রাঞ্জল নহে। এইজন্য তাহা সুখপাঠ্য নহে। এই শতাব্দীতে অমৃতরায়, মহীপতি এবং রঘুনাথ পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হন। অমৃতরায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। ইনি মহারাষ্ট্রদিগের

কএকটী বিজয়গীতি রচনা করিয়াছিলেন। মহীপতি সাধু এবং ভক্তগণের জীবনচরিত কবিতায় প্রকাশ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ভক্তি-বিজয় এবং সত্যবিজয় অতীব প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ পণ্ডিত দময়ন্তী স্বয়ম্বর নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি আর কিছু লেখেন নাই। কিন্তু, এই একখানি গ্রন্থেই তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

যেমন বঙ্গদেশে, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সময় হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত আদিরসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং কি গ্রন্থে কি গানে তাহা প্রকাশ পাইত ; দাক্ষিণাত্যেও সেই প্রকার ঘটিয়াছিল, প্রভেদমাত্র এই যে, মহারাষ্ট্রীয় কবিগণ তাহা গানেতে ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু, রামজ্যোষী, বহুসঙ্খ্যক গান রচনা করিলেও, তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা ছিল না। গান ব্যতীত, তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক পদ, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

মহারাজ শিবাজীর সময় হইতে গদ্য লেখা প্রচলিত হইয়াছে। রাজাজ্ঞা অনুসারে, রাজকর্ম্মচারিগণ ভূপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ সংগ্রহ করিতেন। এই বৃত্তান্তগুলি "বখর" নামে বিখ্যাত। মহারাজ শিবাজীর "বখর" সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। এই বখরগুলি অবলম্বন করিয়া গ্রাণ্ডডফ্ (Grant Duff) সাহেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে, তিনখানি গদ্য গ্রন্থের বিষয় জানা গিয়াছে, যথা—বিদুরনীতি, বেতালপঞ্চবিশি এবং শুকভারতী। শিবাজী মহারাষ্ট্রভাষার সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে "রাজব্যবহারকোষ" নামক একখানি অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে মুসলমানী শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে, অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, কতকগুলি সংস্কৃত, পারসী এবং ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত। উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত, জ্ঞানদেব, নামদেব, জনার্দ্দনপন্থ, একনাথ, তুকারাম, রামদাস স্বামী, মাণিক প্রভু, আক্কেলকোট স্বামী, এবং দেব মামলেদার প্রভৃতি সাধুগণের জীবনী, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী এবং রাজত্ব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনচরিত, সারস্বত ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্ত, মরাঠীয়া 'বিষয়ী' চার উদ্গার, বিচারমাধুকরী এবং নিবন্ধ-মালা নামক প্রবন্ধ পুস্তক মৌলিক গ্রন্থ মধ্যে গণ্য করা যায়।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালাভাষার সহিত মহারাষ্ট্রভাষার কিছু সৌসাদৃশ্য আছে কি না। উভয় ভাষাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত বিস্তর শব্দ মহারাষ্ট্র ভাষাতে আছে। তাহার মধ্য হইতে, উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি উদ্ধৃত করিলাম ;—ঈশ্বর, সমুদ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, লোক, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিংহ, আত্মা, দিবস, রাত্র, আকাশ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, পাপ, সত্য, উত্তম, সুন্দর, উৎকৃষ্ট, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, পবিত্র, ন্যায়,

দয়া, মান, পুস্তক, কেশ, বনপতি, ধান্য, আসন, ধাতু, মূর্খ, চোর, বিদ্যার্থী, শিক্ষক, মন্ত্রী, অধিক, বেত, ঘর, হাড়, কিনারা, বস্ত্র, কান, দুধ, আগার, নাম, দাঁত, কাপড়। এই সকল শব্দ দেখিয়া, পাঠক বিবেচনা করিতে পারেন যে, মহারাষ্ট্রভাষা শীঘ্র আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু তৎপক্ষে কএকটী বাধা আছে। যথা,—উভয় ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও, দেখা যায় যে, বাঙ্গালাভাষায় কোন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, মহারাষ্ট্রভাষায় সেই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য, তাহার প্রতি শব্দ অবলম্বন করা হইয়াছে। বুঝাইবার জন্য এখানে কএকটী দৃষ্টান্ত দিলাম ;—

মহারাষ্ট্র।		বাঙ্গালা।
পাণীয়	... ...	জল
মার্জার	... ...	বিড়াল
পুষ্কল	... ...	প্রচুর

উল্লিখিত তিনটী শব্দ মহারাষ্ট্রীয়গণ চলিত ভাষায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আবার অনেকগুলি শব্দ উভয় ভাষাতে এক অর্থব্যঞ্জক হইলেও, তাহা ভাষাভেদে বিকৃত অবস্থা ধারণ করিয়াছে। যথা ;—

মহারাষ্ট্র।		সংস্কৃত বা বাঙ্গালা।
তান্দূচ	... ...	তণ্ডুল
পাউস	... ...	পয়ঃ
মাঞ্জর	... ...	মার্জার
উন্ দীর	... ...	ইঁদুর
কুত্রা	... ...	কুকুর

এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্রভাষাতে প্রচলিত হিন্দি শব্দও আছে। যথা সুতার, লোহার, বয়েল, জগা, জাগা, চুনা, আঙ্গরাখা, কাম্।

উপরে উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষার অন্তর্গত শব্দগুলি কি প্রকারে মহারাষ্ট্রভাষায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহার কএকটী দৃষ্টান্ত দিলাম ;—

মহারাষ্ট্র	বাঙ্গালা
(১) মান্ জব আণি উন্দীর ত্যা মনুষ্যা জবড়ুন পড়ালে।	(১) বিড়াল এবং ইন্দুর ঐ মনুষ্যের নিকট হইতে পলাইল।
(২) তান্দূচ তুম্ চে আহেত।	(২) ঐ তণ্ডুল তোমার।
(৩) পাবসাচেঁ পাণী গোড়েঁ অসতেঁ।	(৩) বৃষ্টির জল মিষ্ট।
(৪) মনুষ্যালা আত্মা অসতো।	(৪) মনুষ্যের আত্মা আছে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর উন্নতির মুখে ধাবিত হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্য যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। সাহিত্য বিষয়ে এরূপ দ্রুত উন্নতি অপর কোন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা অল্পতোয়া তটিনীর ন্যায় ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু আজ সেই ভাষা বিপুল-পয়ঃশালিনী পৃথুলোদরা তরঙ্গিণীর স্রোতলীলা প্রকাশ করিতেছে। যে ভাষায় এক দিন কলনাদিনী কল্লোলিনীর কুলুকলুধ্বনি সমুত্থিত হইত, সেই ভাষায় আজ শত সিন্ধুর গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে——যে ভাষা এক দিন বসন্তবেহাগের মৃদুল হিল্লোলে শ্রুতিসুখকর ঝঙ্কার তুলিয়াছে, সেই ভাষা আজ ভৈরবী দীপকের উদ্দীপনাময় ভাবে সঙ্গীতালাপ করিতেছে। আদিরসের রসময় ভাবে যে ভাষার ধনাগার সম্পূর্ণ হইয়াছিল, আজ সেই ভাষার প্রবৃদ্ধায়তন ভাণ্ডার নানাভাবের সন্নিবেশে ঐশ্বর্য্যময় হইয়া উঠিতেছে। অপরাপর জাতির চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিয়া, বঙ্গের সুধী সন্তানগণ মাতৃভাষার জন্য নূতন ভাব সংগ্রহ করিতেছেন এবং সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার হইতে মনোমত শব্দ বাছিয়া সেই সকল ভাবকে নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীসম্পাদন করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার গৌরবের এই মধ্যাহ্ন-সান্নিহিত কাল। বাঙ্গালার বহুকৃতবিদ্য সন্তান ভাষার গৌরব বৃদ্ধির জন্য একসংকল্প হইয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ গঠিত হইয়াছে।

ভাষা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন্ জাতি কোন্ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে জাতির যে বিষয়ে আলোচনা অধিক থাকে—যে বিষয়ে পারদর্শিতা এবং ভূয়োদর্শন জন্মে—সেই বিষয়ের শব্দই সেই জাতির ভাষায় অধিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরাজ জাতি পোতচালনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদের ভাষায় নৌশব্দ (Nautical terms) অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ইংরাজ জাতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহেন; বৈজ্ঞানিক শব্দও ইংরাজী ভাষায় বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুজাতি অধ্যাত্ম জগতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন;—সংস্কৃত ভাষায় তৎসম্বন্ধীয় শব্দের সংখ্যাবাহুল্য দৃষ্ট হইবে; সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দুজাতি উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এরূপ ভাষা জগতে নাই। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী; দুহিতা অনেক বিষয়ে মাতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে। মাতার সকল অলঙ্কার, দুহিতার ক্ষীণাঙ্গে শোভা পাইবে না সত্য—তথাপি যে সকল অলঙ্কার তাহার অঙ্গ শ্রীবর্দ্ধন করিতেছে, তাহাতেই তাহার সৌন্দর্য্য সুন্দর ভাবে

প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার সুধী সেবকগণ বঙ্গভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করিতে যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষা যে কালে মাতা অপেক্ষা বিভবশালিনী হইবে এরূপ আশার মূলে নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখিতে পাই না। সংস্কৃত ভাষার যে অভাব তাহা আর পূর্ণ হইবে না—কিন্তু বঙ্গভাষার অভাব দিন দিন পূর্ণ হইতেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি শব্দ অমর, ভরত, জটাধর প্রভৃতি কোষকারগণের মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু বঙ্গভাষার শব্দকোষে এরূপ শব্দ নিতান্ত অল্প হইবে না।

জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ভাষারও উন্নতি হয়। জ্ঞান যখন নিকট সম্বন্ধীয়, নিত্য ব্যবহার্য্য, একান্ত প্রয়োজনীয়, কতিপয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে আবদ্ধ ছিল, তখন মনুষ্যের ভাষাও অতিশয় ক্ষীণ ছিল। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল মনুষ্যের ভাষাও ততই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; মনুষ্য যখন সন্নিকর্ষ অতিক্রম করিয়া দূরত্বে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে শিখিল; যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিকারের জন্য নূতন নূতন উপায়োদ্ঘাটনে যত্নবান্ হইল;—যখন বহির্জ্জগতে প্রবেশ করিল এবং সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অনাবিষ্কৃত রাজ্যের নিয়মাদি আবিষ্কৃত ও অধিগত করিতে সযত্ন হইল,—যখন প্রকৃতির বাহ্য গৌরবে স্তম্ভিত ও বিনমিত না হইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির রহস্যোদ্ভেদে সযত্ন হইল, তখন দিন দিন নূতন নূতন পদার্থ ও তাহার গুণ ধর্ম্ম মনুষ্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে লাগিল এবং মনুষ্যের ভাষা বিবিধ জ্ঞানে বিস্তারিত হইয়া বিশালায়তন হইল। ক্ষুদ্রতরু ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাপ, আলোক ও নির্ম্মল বায়ু আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সতেজ ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, ন্যায়, আন্বিক্ষিকী, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ের জ্ঞান ভাষার সহিত ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ—সকলেই ভাষার শাখা প্রশাখা প্ররোহ। ভাষার সর্ব্বদেশবর্ত্তিনী উন্নতি করিতে হইলে ভাষাকে সর্ব্বতোমুখ জ্ঞানের উপযোগিনী করিতে হইবে। ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্গভাষা বড় দরিদ্র। এ দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে বঙ্গভাষার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইবে না। সৌভাগ্যবশে সাহিত্য-পরিষদ্ এ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভূগোল সম্বন্ধেই পরিষদ্ প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। ভাষান্তর কার্য্য বড় কঠিন, কিন্তু যে সকল বিশাল মস্তিষ্ক এই দুরূহ ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাতে ভৌগোলিক পরিভাষাটি আশাতীত সুচারুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে তথাপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ গুরুব্যাপার যে প্রথম উদ্যমেই অনিন্দ্যসুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে, এরূপ আশা করাও সুচিন্তাসম্মত নহে। বোধ করি, অনবধানতা নিবন্ধন কয়েক স্থানে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সেই ত্রুটি গুলির প্রতি সুযোগ্য পারিভাষিক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে এই প্রবন্ধ প্রকাশে প্রণোদিত হইলাম।

বিজ্ঞান কিম্বা ভূগোলের ভাষায়, একাধিক অর্থে এক শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নহে। ইহাতে অর্থ সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না এবং সময়ে সময়ে অর্থের ব্যত্যয়ও ঘটিতে পারে। কিন্তু ভৌগোলিক পরিভাষার এরূপ দোষ অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইল। গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

Cyclone, Tornado	বাতাবর্ত্ত;	Condensation, Freezing	ঘনীভবন;
Gas, Vapour	বাষ্প;	Globe, Halo	মণ্ডল;
Valley, Moraine	উপত্যকা;		
Air, Winds	বায়ু;	Waves, Windwaves	তরঙ্গ;

উল্লিখিত যে দুই দুইটী ইংরাজি শব্দের একটী একটী বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজি শব্দদ্বয় একার্থবোধক নহে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ অর্থের প্রতিপাদক, অন্ততঃ তাহাদের সামান্য সম্বন্ধে এক জাতীয়ত্ব থাকিলেও এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে একশব্দ দ্বারা উভয়েরই অর্থ প্রতিপাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যে ঘূর্ণবায়ু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তাহাকে Cyclone বলে এবং যে ঘূর্ণবায়ু ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত সহকৃত হইয়া, অল্পপরিধি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া, প্রচণ্ড পরাক্রমের সহিত প্রবাহিত হয় তাহাকে Tornado বলে। বায়বীয়ত্বে এবং ঘূর্ণমানত্বে Cyclone এবং Tornado এতদুভয়েরই সমানাধিকরণবৃত্তিত্ব আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু 'Tornado'র বৃষ্টিবিদ্যুদ্‌বজ্রবত্ত্বরূপ যে বিশেষত্ব টুকু আছে সে টুকুর উপলব্ধি করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন। 'বাতাবর্ত্ত' বলিলে Cyclone এবং Tornado এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী যে অভিপ্রেত তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই পার্থক্য রক্ষার জন্য Tornadoর জন্য শব্দান্তর গ্রহণ করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। 'ঝঞ্ঝা' শব্দের অর্থ বৃষ্টি-বজ্রপাত-সমন্বিত বেগবান্ বায়ু সুতরাং "ঝঞ্ঝাবর্ত্ত" বা 'ঘূর্ণঝঞ্ঝা' 'Tornado'র প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিলেই বোধ হয় কোন দোষ ঘটিবে না এবং "বাতাবর্ত্ত" কেবলমাত্র Cyclone এর অর্থ প্রতিপাদন করিবে।

কোন বস্তুর সান্দ্রতাবৃদ্ধি করণের নাম Condensation। চাপের দ্বারা অনেক বস্তুই অপেক্ষাকৃত ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহাকে Freezing বলে না, সুতরাং "ঘনীভবন" Condensation এবং Freezing এতদুভয়ের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। শৈত্যপ্রভাবে দ্রব পদার্থ যেরূপে সংঘাতকঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই Freezing সুতরাং Freezingএর অর্থ প্রতিপত্তি সম্বন্ধে 'সংহনন'ই যথেষ্ট এবং "ঘণীভবন" কেবল মাত্র Condensationএর অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

'বাষ্প' শব্দ Gas এবং Vapor এতদুভয়ের অর্থেই ব্যবহৃত হইলে, Gas এবং Vaporএর পার্থক্য তিরোহিত হয়। 'জলীয়বাষ্প' Vaporএর প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত বৈদেশিক শব্দদ্বয়ের অর্থগত পার্থক্য সম্যক্ রক্ষিত হইবে বলিয়া বোধ হয়।

Globe এবং Halo এতদুভয়ের অর্থ প্রকাশ করিতে 'মণ্ডল' শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। একটি ইংরাজী শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সেই শব্দগুলি কেবলমাত্র সেই ইংরাজী শব্দটীর অর্থেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে ইহাই বাঞ্ছনীয়; অপর একটি ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দরূপে তাহাদের মধ্যে কোনটিকে পুনর্ব্বার ব্যবহার করিলে স্থানবিশেষে ব্যুৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। 'মণ্ডল'ই যদি Haloর প্রতিশব্দরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে, 'মণ্ডল'কে আর Globeএর অর্থে প্রয়োগ করা উচিত নয়। বায়ুমণ্ডল, নির্ব্বাত মণ্ডল প্রভৃতি স্থানে "মণ্ডল" যখন ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন 'Halo'র অর্থে 'মণ্ডল' গৃহীত না হইলেই ভাল হয়। 'Halo'র অর্থে "মণ্ডলের" পরিবর্ত্তে 'পরিবেশ' শব্দটী সুন্দর ও সুযোগ্য হইবে। "পরিবেশ" ঐরূপ অর্থেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

Valley এবং Moraine এতদুভয়ের মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য আছে। উপত্যকা অর্থে পর্ব্বতযুগ্মসংলগ্ন নিম্নতর ভূমিভাগ। ইহা ঠিক Valleyর অর্থ দ্যোতক হইতেছে, কিন্তু Moraineএর প্রকৃতার্থ এরূপ নহে, Moraine অর্থে হিমানীদ্বন্দ্বমধ্যবিস্তৃত উপলবর্ত্ম বুঝায়। সুতরাং তদ্ভাব-প্রতিপোষক কোন শব্দ Moraineএর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'হিমানীমধ্যবর্ত্ম', বা 'হিমোপকণ্ঠ' বা তৎসদৃশার্থক কোন শব্দের দ্বারা Moraineএর অভাব দূর করাই শ্রেয়ঃ।

Airএর প্রতিশব্দ 'বায়ু, Windsএর প্রতিশব্দ 'বায়ুপ্রবাহ', Wavesএর প্রতিশব্দ 'তরঙ্গ' এবং Wind-wavesএর প্রতিশব্দ 'বায়ুতরঙ্গ'—করিলে ঐ সকল শব্দের অর্থগত পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে বলিয়া বোধ হয়।

Prairie, Pampas, Llamos, প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিশব্দ গৃহীত হয় নাই। প্রত্যেককেই প্রান্তর বিশেষ বলা হইয়াছে, প্রান্তর বিশেষ অনির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে, সুতরাং ইহাতে পারিভাষিক সমিতির উদ্দেশ্য সফল হইল না। এ গুলির বিশেষার্থ প্রকাশক প্রতিশব্দ স্থির করা দুরূহ; তাহা হইলে এক একটি নামের পরিবর্ত্তে এক একটি সূত্র করিতে হয়। নামের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় না—আণ্ডিজ্, কালিফোর্ণিয়া ইত্যাদি যেরূপ তত্তন্নামেই প্রসিদ্ধ সেইরূপ ঐ সকল নামকে, প্রয়োজন হইলে সুখোচ্চারণের জন্য ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গভাষায় গ্রহণ করিলে কোন গোলযোগ হইবে না। প্রেরিপ্রান্তর বলিলে নিঃসন্দেহে ঐ সকল প্রান্তরকেই বুঝাইবে।

"বদ্ধজল" Lagoon এর প্রতিশব্দ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু Lagoon যেরূপ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাতে 'বদ্ধজল' তৎপক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। 'বদ্ধজল' Marsh

এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। যে বিস্তীর্ণ জলভাগের সমুদ্রের সহিত সংশ্রব আছে, তাহাই ভূগোলের অভিধানে Lagoon, সুতরাং 'সামুদ্রিক হ্রদ' বা তৎসদৃশ কোন একটী শব্দ Lagoonএর পরিবর্ত্তে গৃহীত হইলে ভাল হয়।

Sleet শব্দের অর্থ তুষারকণ সংমিশ্রিত বৃষ্টি; সুতরাং 'হিমকণ' Sleetএর অর্থে যথেষ্ট নহে। "তুষার বৃষ্টি" অথবা তৎসদৃশ কোন একটী শব্দ গৃহীত হওয়া উচিত।

Surface drift এর প্রতিশব্দ 'উপরিতন প্রবাহ' হইয়াছে। "অধিবাহ" করিলে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না অথচ দুইটী শব্দের স্থানে একটী শব্দই যথেষ্ট হয়, 'অধিত্যকা' প্রভৃতি শব্দে 'অধি' উপসর্গের অর্থই উপরিতন। 'পরি' উপসর্গযোগে 'বাহ' শব্দ এইরূপ অন্য এক অর্থ প্রকাশ করে। 'Theodolite' অপরিবর্ত্তিত ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। যখন Microscope, Telescope, Barometer প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা নামেই ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তখন Theodoliteকে ভাষান্তরিত না করিয়া গ্রহণ করিলে বাঙ্গালা ভাষার গৌরবহানি আছে। ধাতুমূলক ভাষা, বৈদেশিক শব্দ গ্রহণ করিতে হইলে, ধাতু শক্তির দ্বারা নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া লয়। বাঙ্গালা ভাষাও ধাতুমূলক, সেই জন্য অণুবীক্ষণ, দূর-বীক্ষণ প্রভৃতি শব্দে বৈদেশিকত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না। Theodolite সম্বন্ধেও ভাষার এই ধাতুমূলকত্বের সুযোগ গ্রহণ করিলে ভাল হয়। 'ক্ষিতিজকোণমান' বা তৎসদৃশ কোন শব্দ Theodolite এর অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

৩য় ভাগ ২য় সংখ্যার পত্রিকায় যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে যে কয়েকটী ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল, তাহা আমার বিনীত মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত করিলাম। পরিভাষার অপরাংশে যদি এরূপ ন্যূনতা অনবধানতাদোষ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলি সংশোধিত হইলে পরিভাষাটী নির্দ্দোষ এবং পরিষদের উপযোগী হইবে।—তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজনোচিত ভৌগোলিক পদার্থ জ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিসংবাদ বা ব্যতিক্রম ঘটিবে না এবং বঙ্গভাষার ভৌগোলিক শব্দভাণ্ডারও পরিপূর্ণ ও দোষসম্পর্কশূন্য হইবে।

শ্রীবলীন্দ্র সিংহ দেব।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাহিত্য পরিষদের এক উদ্দেশ্য অংশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। পরিষদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সমক্ষে এফ্, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদিগের জাতীয় ভাষায় রচনার নিয়ম করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছানুসারে সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ইতিহাসাদি তাহাদের জাতীয় ভাষায় পড়িয়া পরীক্ষা দিতে পারে, এইরূপ নিয়মের প্রবর্ত্তনা সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র প্রস্তাব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। এফ এ, ও বি এ, পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছানুসারে বাঙ্গালা বা অন্য কোন প্রচলিত ভাষায় রচনার পরীক্ষা দিতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের নম্বরের সহিত রচনার নম্বরের যোগ হইবে না। সুতরাং কেহ রচনার পরীক্ষা না দিলেও তাহার পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। পরিষদ্ বাঙ্গালার সম্মানরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে যে, পরিষদের উদ্যম কিয়দংশে সফল হইয়াছে, ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। চিরপ্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন নূতন নিয়ম চালাইতে গেলে সিদ্ধির পথ প্রায়ই দুর্গম হইয়া থাকে। নানারূপ প্রতিকূল তর্কের সংঘাতে অভিনব বিষয়ের পক্ষপাতিগণ বিব্রত হইয়া পড়েন। পরিষদের প্রস্তাব সম্বন্ধেও নানারূপ প্রতিকূল তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। প্রস্তাবের পরিপোষকগণ যে, প্রতিকূল স্রোত মন্দীভূত করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন; ইহাতে তাঁহাদের মাতৃভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগমূলক উদ্যমশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আশা আছে, এইরূপ উদ্যমশীলতার প্রভাবে পরিষদ্ কালক্রমে আপনার সাধনায় সর্ব্বাংশে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

* * * *

পরিষদের প্রস্তাবানুসারে বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হওয়াতে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিহ্ন-সংস্থাপক সমিতি একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, উহার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা রচনার পারিতোষিকের জন্য রাখা হইবে। প্রতিবৎসর এফ্ এ, ও বি এ, পরীক্ষায় যে দুইজনের বাঙ্গালা রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাদের প্রত্যেকে পারিতোষিক স্বরূপ (স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ চিহ্ন-স্বরূপ) এক একটি স্বর্ণপদক পাইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যরাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি আজীবন সাহিত্য সেবাব্রতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-সংস্থাপক সমিতি যে, তৎসেবিত ভাষার আলোচনায় উৎসাহ দিবার জন্য এইরূপ পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবে।

যাঁহারা সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত এতদ্দেশের তুলনা করিতে চাহেন, তাঁহারা সদ্‌যুক্তির সম্মান কতদূর রক্ষা করেন, বলিতে পারা যায় না। ইংলণ্ডের সাহিত্য পরকীয় শক্তিতে পরিচালিত না হইয়াও দ্রুতবেগে উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক সময়ে ইংরেজীর স্বাসন না থাকিলেও ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় কোন-রূপ ব্যাঘাত জন্মে নাই। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও সম্প্রসারিত করিবার জন্য পরকীয় শক্তির প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য স্বতঃসম্ভূত শক্তিতেই উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইবে। এই যুক্তি স্বাধীনদেশের পক্ষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরকীয় শাসনে পরিচালিত—পরকীয় ভাবে আত্মবিস্মৃত দেশের পক্ষে উহা চলিবে না। ইংলণ্ড নর্ম্মান্‌দিগের অধিকৃত হইলে নর্ম্মান্‌ ভাষা ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়। শেষে এই ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী চালাইবার জন্য রাজকীয় শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। পরাধীনতার সময়ে ইংলণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে, এই বঙ্গদেশেই বা তাহা ঘটিবে না এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে থাকা নিঃসন্দেহ জাড্য দোষের লক্ষণ, বাঙ্গালী যদি অপরের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গালার আলোচনা পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন বাঙ্গালার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। সুতরাং এখন প্রতিকূল শক্তিকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য অপর অনুকূল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

কর্ত্তৃপক্ষও এক সময়ে এইরূপ অনুকূল শক্তিতে বাঙ্গালীদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ইংরেজী সাহিত্যের ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করে, ইহা পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এ জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে মাতৃভাষার সেবা করাইতে সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীও সেইরূপ সুশৃঙ্খল ছিল। বাঙ্গালী পরীক্ষার্থী-দিগের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতেন, তাঁহার সেই রচনা পারিতোষিক বিতরণ সভায় পঠিত হইত এবং এজন্য তিনি বিশেষ পারিতোষিক পাইতেন। মহামতি বীডন সাহেব এই মহৎ কার্য্য সাধনে সর্ব্বদা যত্ন প্রকাশ করিতেন। বাঙ্গালী ইংরাজীতে পুস্তক লিখিলে তাঁহার নিরতিশয় বিরক্তি জন্মিত। তিনি কহিতেন, ইংরেজী সাহিত্যের কোন অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অভাব আছে। ইংরেজীতে পুস্তক লিখিলে বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবে না। কিন্তু মাতৃভাষার উন্নতি সাধন জন্য বাঙ্গালী যদি সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার হইতে পারে, এবং তিনিও সাহিত্য সংসারে সম্মান লাভ করিতে পারেন। শিক্ষাসমাজের এই উদার প্রকৃতি অধ্যক্ষ মহোদয়ের এইরূপ মহৎ উপদেশ নিষ্ফল হয় নাই। মাইকেল

মধুসূদনের 'ক্যাপটিব্ লেডি' পাইয়া অধ্যক্ষ মহোদয় নিতান্ত বিরক্তির সহিত ঐ উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই কথাতেই প্রতিভাশালী মহাকবিকে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। এই মহীয়সী পরিচর্য্যার মহৎ ফল এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অসীম গৌরবের পরিচয় দিতেছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

বঙ্গের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের ন্যায় বঙ্গের শাসনকর্ত্তাও এবিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেন। কলিকাতার ডেপুটি গবর্ণর মহোদয় এক সময়ে স্বয়ং উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনার জন্য পারিতোষিক স্বরূপ স্বর্ণপদক দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উর্দ্দু রচনার জন্যও ঐরূপ পারিতোষিকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তার উৎসাহ দর্শনে বাঙ্গালীও উৎসাহের সহিত বাঙ্গালাভাষার অনুশীলন করিতেন। এইরূপ অনুশীলন-প্রবৃত্তি হইতে বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহাদের প্রতিভায় সাহিত্যের সম্প্রসারণ হইয়াছে, তাঁহারা বিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার আলোচনা করিতেন। এই ভাষাও তখন নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় ছিল। এরূপ কেহ মনে না করেন যে বাঙ্গালার প্রচলন হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত উঠিয়া যাইবে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সংযোগ থাকা আবশ্যক। এখন এইরূপ সংযোগ সাধনেরই চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার ডেপুটী গবর্ণরের প্রদত্ত পারিতোষিকে যে উপকার হইয়াছিল, আশা আছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন-সংস্থাপক সমিতির প্রদত্ত পারিতোষিকেও সেইরূপ উপকার হইবে।

পরিষদের সভ্য

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
২। „ নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, (পার্শনাল অ্যাসিট্যাণ্ট কমিশনার) চট্টগ্রাম।
৩। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমিদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।
৪। „ মনোমোহন বসু, ২০৩/২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
৫। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, জমিদার, শোভাবাজার রাজবাটী।
৬। আর, সি, দত্ত, সি, আই, ই ; সি, এস্, কমিসনার, উড়িষ্যা (বিলাত)।
৭। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯নং ষষ্ঠীতলা রোড্, নারিকেলডাঙ্গা।
৮। „ „ চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩নং আলবার্ট রোড।

৯। সার রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্, ৭৩নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
১০। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, সলিসিটর, ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
১১। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, জমীদার, বরাহনগর।
১২। শ্রীযুক্ত রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর।
১৩। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমিদার, ৬নং কলেন প্লেস, হাওড়া।
১৪। ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।
১৫। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ১২নং রামধন মিত্রের লেন।
১৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪০নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১৭। „ শারদাপ্রসাদ দে, ৬১নং বাগবাজার।
১৮। „ মতিলাল হালদার, বি, এল, মুন্সেফ, আলিপুর, ৩১নং গ্রে ষ্ট্রীট্।
১৯। „ জগৎচন্দ্র সেন, বি, এ, ১৪নং বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা।
২০। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলি-সম্পাদক, নেউগিপুকুর ইষ্ট লেন।
২১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, ৮৬/২নং জানবাজার ষ্ট্রীট্।
২২। „ এন্, এন্, ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ইণ্ডিয়ান্ নেসন্-সম্পাদক, ৪৩নং বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন।
২৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
২৪। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ১০৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।
২৫। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, এম্, বি, ১৯নং বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেন।
২৬। শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস গুপ্ত, সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক, ১০১নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্।
২৭। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, ২৬নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার।
২৮। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭নং নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।
২৯। „ নন্দকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাজসাহী, ৬৩নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্।
৩০। „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, ১৭নং বাবুরাম শীলের লেন, বৌবাজার।
৩১। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ২৮/১৬নং অখিল মিস্ত্রির লেন, চাঁপাতলা।
৩২। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১/৪নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
৩৩। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, প্রফেসার, রিপন কলেজ ৬নং উইলিয়মস্ লেন।
৩৪। „ সারদারঞ্জন রায়, এম্, এ, প্রফেসার, মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন,
১৭নং মধুরায়ের লেন, সিমলা।
৩৫। „ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১/২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
৩৬। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, ১নং নিমকমহল ঘাট রোড, খিদিরপুর।
৩৭। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩২নং চন্দ্রচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, ভবানীপুর।
৩৮। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, হেড্‌মাষ্টার কির্ণাহার স্কুল, বীরভূম।
৩৯। „ সাতকড়ি হালদার, বি, এল, মুন্সেফ, রানাঘাট।

৪০। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্, এ, সি এস, কালেক্টর, বগুরা।
৪১। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলিয়াটোর, বাঁকুড়া।
৪২। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
৪৩। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল, প্রিন্সিপাল, রিপন কলেজ, ৪নং গিরীশ বাঁড়ুয্যের লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া।
৪৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বরিসাল।
৪৫। „ অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্, এ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
৪৬। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, উত্তরপাড়া।
৪৭। „ মথুরানাথ সিংহ, বি, এল, বাঁকীপুর, পাটনা।
৪৮। „ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্, এ ; বি, এল্ বাঁকীপুর পাটনা।
৪৯। „ নবীনচন্দ্র দাস, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, চট্টগ্রাম।
৫০। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ফরিদপুর।
৫১। „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কাঃ, কেরানীটোলা মেদিনীপুর।
৫২। „ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্স্পেক্টর, ঢাকা।
৫৩। „ দিনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, হেড্মাষ্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল কুমিল্লা।
৫৪। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্, এ ; সি, এস, সবডিভিসনাল অফিসার, খড়্দা, পুরী।
৫৫। „ বরদাচরণ মিত্র, এম্, এ ; সি, এস, জজ্ ফরিদপুর, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট্ কুমারটুলি।
৫৬। „ দাশরথি ঘোষ এম্, এ ; বি, এল, উকিল, হুগলি।
৫৭। „ চণ্ডীচরণ সেন, সবজজ, ত্রিহুত।
৫৮। „ রজনীনাথ রায়, এম্, এ, কণ্ট্রোলার, গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া, ২৪নং পিপুলপটী রোড, ভবানীপুর।
৫৯। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ট্রিবিউন-সম্পাদক, লাহোর।
৬০। „ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্, এ, ভাগলপুর।
৬১। „ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পার্সনাল আসিটাণ্ট কমিশনার, বর্দ্ধমান।
৬২। „ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ খুলনা।
৬৩। „ বঙ্কুবিহারী সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
৬৪। „ অক্ষয়কৃষ্ণ সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ঢাকা।
৬৫। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, সি, এস, একষ্ট্রা আসিস্টাণ্ট কমিশনার, হোসেঙ্গাবাদ।
৬৬। „ নন্দলাল বাগ্চী, বি, এ, ডেপুটী কালেক্টর, তমলুক।
৬৭। „ পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে, ৩২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৬৮। „ অমৃতলাল রায়, হোপ-সম্পাদক, ২১ নং জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট।

৬৯। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, ৭নং ব্রাহ্মসমাজ লেন, সাঁকারিটোলা।
৭০। „ গোবিন্দলাল দত্ত, ১৮ নং অক্রুর দত্তর লেন, বহুবাজার।
৭১। „ নৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্ এ, হেডমাষ্টার কোন্নগর এণ্ট্রান্স স্কুল।
৭২। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-সম্পাদক ১৩।৭নং বৃন্দাবনবসুর লেন, হোগলকুড়িয়া।
৭৩। „ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল, তেলিপাড়া শ্যামপুকুর।
৭৪। „ কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট।
৭৫। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম, এ, ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন, সিমলা শুঁড়িপাড়া।
৭৬। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল, উকীল, ২৩ পঞ্চানন তলা লেন, পটলডাঙ্গা।
৭৭। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নং পঞ্চানন তলা লেন বহুবাজার।
৭৮। „ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম, এ, প্রফেসার প্রেসিডন্সি কলেজ।
৩৯ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
৭৯। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪ নং কলেজ স্কয়ার।
৮০। „ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।
৮১। „ শ্যামাধব রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শিয়ালদহ।
৮২। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, হ্যারিসন রোড।
৮৩। „ এ, চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
৮৪। „ ন্যায়ালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ,
২২ নং নেউগিপুকুর ওয়েষ্ট লেন।
৮৫। „ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংলিশ ডিপার্টমেণ্ট, অ্যাপিলেট সাইড হাইকোর্ট,
৫নং ডাক্তারের লেন, তালতলা।
৮৬। „ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট,
১১ নং কৃষ্ণরাম বোসের লেন।
৮৭। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, অপার চিৎপুর রোড গরানহাটা।
৮৮। ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু, এম্, বি, ৪৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, ঝামাপুকুর।
৮৯। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, ৫০ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার।
৯০। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট পাথুরিয়াঘাটা।
৯১। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, লেট্ ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর ২২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
৯২। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট।
৯৩। „ সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল, ঐ ঐ ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট।
৯৪। „ অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ ১৪ নং বেণিয়াটোলা লেন।
৯৫। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, উকীল, মতীহারী, জেলা চম্পারণ,
টি, এস রেলওয়ে। ২১ নং ঝামাপুকুর।

৯৬। শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দে, এম্, এ, ৩৬ নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন, বহুবাজার।
৯৭। ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল, উকীল, ১২নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
৯৮। ,, মন্মথনাথ মল্লিক, ব্যারিষ্টার জমীদার, ১২নং ওয়েলিংটন স্কয়ার, বহুবাজার।
৯৯। ,, হেমচন্দ্র মল্লিক ঐ ঐ ঐ
১০০। ,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ ইনস্পেক্টর,
২৮৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ।
১০১। ,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১।১ নং শ্রীনাথদাসের লেন, বহুবাজার।
১০২। ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬নং রামহরি ঘোষের লেন, চাঁপাতলা।
১০৩। ,, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬২ নং বালিগঞ্জ সারকুলার রোড।
১০৪। ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, জমীদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
১০৫। ,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ঐ
১০৬। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ঐ
১০৭। ,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট।
১০৮। ,, শরচ্চন্দ্র সরকার ৭৭।১নং মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চোরবাগান।
১০৯। ,, শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ২১।২ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির সিমলা।
১১০। ,, প্যারীলাল হালদার, এম্, এ, ১নং গৌর লাহার ষ্ট্রীট্, নিমতলা।
১১১। ,, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪নং কৈলাস বানার্জ্জিস্ লেন, পঞ্চাননতলা হাবড়া।
১১২। ,, আনন্দচন্দ্র মিত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১১৩। ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার, ইণ্ডিয়ান ট্রেজারি,
১১নং কৃষ্ণরাম ঘোষের লেন।
১১৪। ,, কেদারনাথ বসু, বি, এ, ৭৩ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন।
১১৫। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম্, এস, ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
১১৬। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, ১৯নং ষষ্ঠীতলা, নারিকেলডাঙ্গা।
১১৭। ,, মন্মথনাথ মুস্তোফী, বি, এ, ৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
১১৮। ,, মতিলাল দত্ত, ইন্সপেক্টর পাঠশালা, ২৬।১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট,
জোড়াসাঁকো।
১১৯। কবিরাজ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত কবিভূষণ, ১নং নীলমাধব সেনের লেন, সান্‌কিভাঙ্গা।
১২০। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, ১২নং নবাবদি ওস্তাগারের লেন, টাকেপাড়া।
১২১। কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন, ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১২২। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৭ চোরবাগান ২য় গলি।
১২৩। রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি, আই, ই, ইত্যাদি জমীদার পাথুরিয়াঘাটা।
১২৪। ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, এল, এম্, এস, পঞ্চাননতলা লেন, হাবড়া।

১২৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক, ২৪নং মট্‌স লেন।
১২৬। „ শ্যামাচরণ মিত্র, ৭৩। ১। ১ নং মুক্তারাম বাবুর লেন।
১২৭। „ জে, সি, দত্ত, এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী, ১৭১নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।
১২৮। „ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, জমীদার, ১৪ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট বাগবাজার।
১২৯। „ রামেশ্বর মণ্ডল, বি, এল, ১৫৪ নং অপার সারকুলার রোড।
১৩০। পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, ১৩ নং ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট পাথুরিয়াঘাটা।
১৩১। শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র, বি, এল, উকীল, ১৯।১ নং মদন মিত্রের গলি সিমলা।
১৩২। „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম, এ বি, এল এটর্ণী, ১৩ নং জেলেপাড়া লেন, বহুবাজার।
১৩৩। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
১৩৪। ব্যোমকেশ মুস্তোফী, বঙ্গনিবাসী-সম্পাদক, ১৯নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট।
১৩৫। যশোদানন্দন প্রামাণিক, এম্, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ১২২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট।
১৩৬। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম্, ডি, ২০৩। ২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১৩৭। কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন, ১০৬নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১৩৮। শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ, জমীদার, পাথুরিয়াঘাটা।
১৩৯। কুমার মন্মথনাথ মিত্র, জমীদার, ১ নং ঝামাপুকুর লেন।
১৪০। শ্রীযুক্ত এস্ সি, বিশ্বাস, ব্যারিষ্টার, ৪৩ নং বিডন ষ্ট্রীট।
১৪১। „ পরেশচন্দ্র সোম, ৭৫ নং অপার সারকুলার রোড।
১৪২। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ সম্পাদক, ১৭। ১ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
১৪৩। „ চারুচন্দ্র সরকার, এম, এ, বি, এল, উকীল ৩০নং মিরজাফর লেন, পটলডাঙ্গা।
১৪৪। „ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৪৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
১৪৫। „ ললিতকৃষ্ণ বসু। সমর্থকোষ-সম্পাদক, ২। ১ নং মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।
১৪৬। „ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ১০ নং বাহির মিরজাপুর রোড।
১৪৭। „ কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর, জমীদার ৭৪ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
১৪৮। „ কানাইলাল দে, ২৪১ নং অপার সারকুলার রোড বাগ্‌বাজার।
১৪৯। „ কালীচরণ মিত্র, হিতৈষী-সম্পাদক, ৪৬ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
১৫০। কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জমীদার, শোভাবাজার রাজবাটী।
১৫১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, বি, এ প্রোফেসার, ডফটন কলেজ।
১৫২। „ অমরকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ২০নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
১৫৩। „ তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, ২৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
১৫৪। „ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্, ২০৩। ৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১৫৫। কবিরাজ মণিমোহন সেন, ১৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১৫৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্. এ, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন গোয়াবাগান।
১৫৭। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বি, এ, জমীদার ১৮০নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।
১৫৮। „ পণ্ডিত পরেশনাথ বিদ্যাভূষণ, ৯২ নং হারিসন রোড।
১৫৯। „ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন সানকিভাঙ্গা।
১৬০। „ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪। ৪৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।
১৬১। „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২।২ মদন বড়ালের লেন বহুবাজার।
১৬২। „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।
১৬৩। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় ১৭৩। ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।
১৬৪। „ অভয়চরণ পাল, ২০৩। ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।
১৬৫। „ নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১৯ নং মধুরায়ের লেন্ সিম্‌লা।
১৬৬। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট।
১৬৭। „ যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল, উকীল, ৩।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্।
১৬৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ নং রামকান্ত বসুর লেন, বাগবাজার।
১৬৯। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বঙ্গবাসী-সম্পাদক, ৭৯ নং হারিসন রোড।
১৭০। „ বিহারীলাল সরকার, বঙ্গবাসী-সহ-সম্পাদক, ১০ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন। দর্জ্জিপাড়া।
১৭১। „ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, ৯ নং বাবুরামঘোষের লেন্, নিমতলা।
১৭২। „ প্রমথনাথ কর, এম, এ, বি, এল, এটর্ণী, ৫ নং হেমচন্দ্র করের গলি, কম্বুলেটোলা।
১৭৩। „ হরিচরণ বসু। ৭১ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট্।
১৭৪। „ উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, প্রিন্সিপাল সিটিকলেজ, ৯ নং এণ্টনি বাগান লেন।
১৭৫। „ মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজার-সম্পাদক, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।
১৭৬। „ দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
১৭৭। „ বাণীনাথ নন্দী, ১৭ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট্।
১৭৮। „ অনঙ্গমোহন ঘোষাল, ৩০। ১ বলরাম দের ষ্ট্রীট্।
১৭৯। „ ক্ষেত্রমোহন বসু, বি, এ, ইঞ্জিনিয়ার ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
১৮০। পণ্ডিত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন সিম্‌লা।
১৮১। মাননীয়, এ, এম্, বসু, এম্, এ, ব্যারিষ্টার, ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।
১৮২। ডাক্তার বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।
১৮৩। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, ৫৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার।
১৮৪। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন, বৌবাজার।

১৮৫। শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, শোভাবাজার।
১৮৬। „ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। ৬ নং মদন মোহন চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো।
১৮৭। „ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট।
১৮৮। „ শরচ্চন্দ্র দাস, ২৪ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট আহিরীটোলা।
১৮৯। পণ্ডিত গদাধর কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ ১৯ নং ইণ্টালি রোড।
১৯০। ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল্, এম্, এস, ৫১ নং সাঁখারিটোলা লেন।
১৯১। পি, এন্ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ২০৯ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
১৯২। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম, এ, প্রিন্সিপাল বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
১৯৩। „ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রফেসার বঙ্গবাসী কলেজ, হিন্দু-হোটেল। সান্কিভাঙ্গা।
১৯৪। „ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ৬০ নং বিডন ষ্ট্রীট।
১৯৫। „ যতীন্দ্রনাথ সেন, ৯ নং ঘোষের লেন, শুঁড়িপাড়া সিমলা।
১৯৬। „ হেমচন্দ্র সরকার, এম, এ, প্রফেসার বঙ্গবাসী কলেজ ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
১৯৭। „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য, ৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
১৯৮। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ১৫ নং রামকান্তবসুর ১ম গলি।
১৯৯। „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮।৩ কাশীঘোষের লেন সিমলা।
২০০। „ মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
২০১। „ সত্যচরণ মিত্র ; ১০ নং ঈশ্বর মিলের লেন।
২০২। „ মোহনচাঁদ মিত্র, বি, এল্, উকীল ১৬ নং ভীমঘোষের লেন, হোগলকুড়িয়া।
২০৩। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ; ৪৬ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট।
২০৪। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ২৫। ৯ নং মট্‌স লেন।
২০৫। „ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া জমীদার সিয়ারশোল, রাণীগঞ্জ।
২০৬। „ ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম, এ, প্রিন্সিপাল জেন্‌কিন্‌স কলেজ কুচবেহার।
২০৭। „ অবিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বর্দ্ধমান।
২০৮। „ কালিদাস, মল্লিক এম, এ, প্রফেসার বর্দ্ধমান কলেজ।
২০৯। „ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাস মুখার্জির লেন, হাবড়া।
২১০। „ সুরেশচন্দ্র সেন, পোঃ কট্‌সিলা, সিংভূম।
২১১। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, হেড মাষ্টার হুগলি কলেজ।
২১২। „ বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেড পণ্ডিত ; বেহার স্কুল ঢাকা।
২১৩। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফেসার রাজসাহী কলেজ।
২১৪। „ হৃদয়রঞ্জন খাঁ, এম, এ, ৫৪ নং কৈলাস বসুর লেন, হাবড়া।
২১৫। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হেডপণ্ডিত গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ বিদ্যালয়, মালদহ।

২১৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, এল, এম. এস্ পঞ্চাননতলা লেন, ক্ষীরেলারগলি, হাবড়া।

২১৭। „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, উকীল ৭৭ নং রসারোড, ভবানীপুর।

২১৮। „ প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, কুচবেহার রাজবাটী।

২১৯। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, প্রফেসার, কটক কলেজ।

২২০। „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, হুগলী

২২১। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫২ নং বকুলবাগান রোড ভবানীপুর।

২২২। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল ভগলপুর, পাণ্ডুয়াকুলি।

২২৩। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমীদার, সিয়ারশোল রাণীগঞ্জ।

২২৪। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়, জমীদার, কাশীপুর।

২২৫। „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলি।

২২৬। „ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, প্রফেসার হুগলি কলেজ।

২২৭। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এ, এম ডেপুটী ইন্স্পেক্টর সিলেট।

২২৮। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উলুবেড়িয়া।

২২৯। „ নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার শ্রীরামপুর।

২৩০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা।

২৩১। „ কালীপদ বসু, উকীল মিরাট।

২৩২। „ বলেন্দ্রনাথ সিংহ, ইন্দার, বাকুড়া।

২৩৩। „ মধুসূদন রাও, হেড্মাষ্টার ট্রেনিং স্কুল কটক।

২৩৪। „ উপেন্দ্রগোপাল মিত্র, বি, এল, উকীল ৩০ নং তেলিপাড়া লেন, ভবানীপুর।

২৩৫। „ শরচ্চন্দ্র মিত্র, নিম্তা, বেলঘরিয়া, ই, বি, এস রেলওয়ে।

২৩৬। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, উকীল বর্দ্ধমান।

২৩৭। „ রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কালেক্টর ভদ্রক।

২৩৮। „ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত, ডেপুটী কলেক্টর মৈমনসিং।

২৩৯। „ বিপিন বিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ বরিশাল।

২৪০। „ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিন্সি, সিউড়ি।

২৪১। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস, কলেক্টর, দিনাজপুর।

২৪২। „ মিঃ, চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার; ২৫৫ নং রসারোড ভবানীপুর।

২৪৩। „ শ্যামকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর রামপুর বোয়ালিয়া।

২৪৪। „ শশধর রায়, বি, এল, উকীল, রাজসাহী।

২৪৫। „ শরচ্চন্দ্র রায় ঐ ঐ ঐ

২৪৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, বি, এল, কলেক্টর বালেশ্বর।
২৪৭। " বি, এল, গুপ্ত, সি, এস, জজ, বরিশাল।
২৪৮। " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ নং ডাক্তার্স লেন তালতলা।
২৪৯। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ, মৌহাটা, বর্দ্ধমান।
২৫০। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ওয়াজাদিয়া কাছারী। কিশোরগঞ্জ।
২৫১। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার উত্তরপাড়া।
২৫২। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, সবজজ, বাঁকীপুর।
২৫৩। " মতিলাল মল্লিক এম্, এ, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর স্কুল মেদিনীপুর।
২৫৪। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গপুর।
২৫৫। " অঘোরনাথ ঘোষ, সবজজ, বাঁকুড়া।
২৫৬। " তারাচরণ সেন, মুন্সেফ, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
২৫৭। " নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁকুড়া।
২৫৮। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উকীল বাঁকুড়া।
২৫৯। " উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিভিল সার্জ্জন বাঁকুড়া।
২৬০। " কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমাদার ৬ নং কলেনপ্লেস্, হাবড়া।
২৬১। " মাখনলাল সিংহ, ১ নং গোপাল বাঁড়ুয্যের ষ্ট্রীট, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া।
২৬২। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র, মুন্‌সেফ সিউড়ী, বীরভূম।
২৬৩। " রায় রোহিনীকুমার রায় চৌধুরী, জমীদার, কৃত্তিবাসা, বরিশাল।
২৬৪। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, জজ, সাতারা বোম্বাই।
২৬৫। " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনুলিয়া রাণাঘাট।
২৬৬। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, মুন্‌সেফ, বোলিপুর।
২৬৭। " রাসবিহারীদাস, লোনসিংহ ফরিদপুর।
২৬৮। " বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেডমাষ্টার হিন্দুস্কুল নদীয়া।
২৬৯। " কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিদ্যারঞ্জন রঙ্গপুর বড়বাড়ী।
২৭০। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটি আঁড়িয়াদহ।
২৭১। " রাধানাথ রায়, স্কুল ইন্সপেক্টর, উড়িষ্যা।
২৭২। " সুদামচন্দ্র নায়েক, এসিসটাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ট্রিবিউটারি মহল, কটক।
২৭৩। " বনমালি সিংহ, গার্জেন, রাজষ্টেট কটক্।
২৭৪। " হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, বদনগঞ্জ হুগলি।
২৭৫। " তারকনাথ বিশ্বাস, সব-রেজিষ্ট্রার, জাহানাবাদ হুগলি।
২৭৬। " হরিপদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, এনালিষ্ট, কাশিপুর গন্‌ফাউণ্ডারি।
২৭৭। " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি এল, উকীল দিনাজপুর।

২৭৮। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
২৭৯। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, (বিশিষ্ট) উকীল হাইকোর্ট।
২৮০। Sir William W. Hunter, K. C. S. I. (বিশিষ্ট)
২৮১। Sir Monier Williams, K. C. I. E. (ঐ)
২৮২। Sir George Bardwood, K. C. I. E. (ঐ)
২৮৩। John Beames, Esqr,
২৮৪। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, (বিশিষ্ট) ঢাকা।
২৮৫। ,, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বসু, ৬ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্।
২৮৬। ,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, তারক চাটুর্য্যের লেন।
২৮৭। ,, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
২৮৮। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (বিশিষ্ট) ৫২ নং পার্কষ্ট্রীট্।
২৮৯। ,, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।
২৯০। ,, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।১ নং চাসাধোপাপাড়া (জোড়াসাঁকো)
২৯১। ,, রাধানাথ মিত্র, ১ নং বেচারাম চাটুয্যের ষ্ট্রীট।
২৯২। ,, ঈশানচন্দ্র বসু, এম এ, ২৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, ঝামাপুকুর।
২৯৩। ,, চুনীলাল সেন ৬ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট চোরবাগান।
২৯৪। ,, বিপিনবিহারী রায়, ২১০। ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২৯৫। ,, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ৩৪।১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট (বঙ্গবাসী প্রেস
২৯৬। ,, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২৯৭। ,, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১৫ নং মারহাট্টা ডিচ লেন (বাগবাজার)
২৯৮। ,, উমাপদ রায় (ব্যারিষ্টার), ৭ নং অক্রূর দত্তের লেন (বহুবাজার
২৯৯। ,, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এ, বি, এল,
৪২।২ নং মদন বড়ালের লেন (বহুবাজার
৩০০। ,, দ্বিজেন্দ্রলাল সিংহ, এম, এন্ পি, এস্, (লণ্ডন) ১১৯।২.নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রী
৩০১। ,, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, ৪২ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, (আহিরীটোলা)
৩০২। ,, অমৃতলাল বসু, ১১ নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
৩০৩। ,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, নৈহাটী।
৩০৪। ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এফ, এইচ, সি, এস্,
৮৯ নং বারানসীঘোষের ষ্ট্রীট।
৩০৫। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ নং আহিরিটোলা ষ্ট্রীট।
৩০৬। ,, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি, এল, ৪ নং কলেজ স্কয়ার কলি
৩০৭। ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচড়া হুগলী।

কৃষ্ণভাবিনী বসু মল্লিক

পারিতোষিকের নিয়মাবলী।

আর্য্য হিন্দু-জাতির সমাজ বন্ধন বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন তাঁহাকে উক্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে। পারিতোষিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা; নিম্নোক্ত নিয়মে প্রদত্ত হইবে।

১। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আর্য্য হিন্দুদিগের সমাজ বন্ধনের প্রণালী ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে প্রমাণ সহ আলোচনা করিতে হইবে।

২। দেশকালপাত্রানুসারে সমাজ বন্ধনের নিয়ম যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত করিতে হইবে।

৩। সামাজিক নিয়ম সমূহের মধ্যে কোন গুলি সার্ব্বজনীন ও কোনগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থাসাপেক্ষ, তাহা প্রদর্শিত করিতে হইবে। এবং ঐ সকল নিয়মের কতদূর পর্য্যন্ত একদেশ হইতে অন্যদেশে গ্রহণীয় তাহাও দেখাইতে হইবে।

৪। নানা কারণে বর্ত্তমান আর্য্য হিন্দু সমাজের নিয়ামকের অভাব হইয়াছে। সেই অভাব কিরূপে পূরণ হইতে পারে তাহারও বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

৫। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থকারই পারিতোষিক পাইবেন। তবে যদি কেহ ইংরাজিতে গ্রন্থরচনা করেন এবং সেই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ইংরাজি গ্রন্থকারও উক্ত পরিতোষিকের তুল্য অন্য পারিতোষিক পাইবেন।

৬। পারিতোষিক প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে গ্রন্থকারকে নিজব্যয়ে পরিষদের অভিমতানুসারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইবে। তবে যদি নিম্নোল্লিখিত পরীক্ষকগণ গ্রন্থের উৎকর্ষ বিবেচনায় অনুরোধ করেন, তবে গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয় হিসাবে পারিতোষিকদাতা গ্রন্থকারকে আর একশত পঞ্চাশ টাকা দিবেন।

গ্রন্থের সত্বাধিকার ও গ্রন্থ বিক্রয়ের লাভ গ্রন্থকারই পাইবেন। কেবল পারিতোষিক দাতাকে ১২ খানি পুস্তক এবং পরিষদকে ৫ খানি পুস্তক উপহার দিতে হইবে।

৭। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অন্যূন ২০০ পৃষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রন্থ সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলে কোন লেখককে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে না। তবে কোন গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী বিবেচিত হইলে গ্রন্থকারকে পারিতোষিক না দিয়া মুদ্রণের ব্যয় মাত্র দেওয়া হইবে।

৯। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তাহার একখানা নকল পরিষদের সম্পাদকের নিকট ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যে প্রেরণ করা আবশ্যক, পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পিত হইবে, কিন্তু নকল প্রত্যর্পিত হইবে না।

অন্যান্য বিবরণ পরিষদের সম্পাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট ১০৬।১নং গ্রে-ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পারিতোষিক দাতার প্রতিনিধি স্বরূপ নিম্নলিখিত মহাশয়গণকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।

১। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল।
২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল,
৩। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই,
৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৬। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ।
৭। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাহিত্য পরিষদের
অবৈতনিক সম্পাদক।